মাসুদ রানা

মহাপ্রলয়

যুদ্ধবাজ

দুটি বই একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

[দুটি বই একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেনের

মহাপ্রলয়

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ছবি তৈরি হচ্ছে ইটালিতে, বাজেট একশো মিলিয়ন ডলার, ছবির নাম ডি-ডে। তা হোক, ছবি নিয়ে বিসিআইয়ের মাথাব্যথা ছিল না, কিন্তু যখন ওটাকে কেন্দ্র করেই খুন হয়ে গেল সংস্থার রোমচীফ, ছুটে গেল মাসুদ রানা। ছবি তৈরির সাজ-সরঞ্জাম দেখে চমকে উঠল। সত্যিকারের নিউক্লিয়ার মিসাইল, টর্পেডো, ট্যাঙ্ক, অত্যাধুনিক সব বিমান—ছবি তৈরিতে এসব কেন?

যুদ্ধবাজ

ইরাক ও জাতিসংঘের ম[illegible] সংকট যখন তুঙ্গে, যুদ্ধংদেহি মনোভাব নিয়ে আমেরিকা ও ব্রিটেন যখন ইরাক আক্রমণ করার সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে, এই সময় কাকতালীয় ভাবে ফাঁস হয়ে গেল ইসরায়েলিদের ষড়যন্ত্র। সাগরের নিচে ওদের সাবমেরিন ঘাঁটিতে বন্দী হয়েছে মাসুদ রানা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ২৭২ + ২৭৩

মহাপ্রলয় + যুদ্ধবাজ

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)
facebook.com/groups/Banglapdf.net

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books)
facebook.com/groups/we.are.bookworms

মাসুদ রানা

মহাপ্রলয়

যুদ্ধবাজ

[দুটি বই একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16 7622 2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপুব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

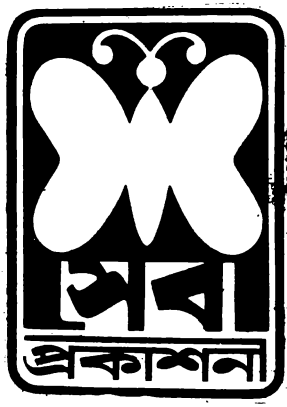

ছত্রিশ টাকা

Masud Rana
MOHAPROLAY

JUDDHOBAJ
Two Thriller Novels
By Qazi Anwar Husain

মহাপ্রলয় : ৫–১১৮
যুদ্ধবাজ ১১৯–২৪০

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক* মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত *এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ*লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক * আই লাভ ইউ, ম্যান * সাগর কন্যা পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন * বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য উদ্ধার *হামলা* প্রতিশোধ*মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত*স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন *বুমেরাং *কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী *কালো টাকা কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর *শ্বাপদ সংকুল* দংশন*প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ *ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরুষ *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট *অমানিশা*সবাই চলে গেছে *অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল* বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ *মহাপ্রলয় *যুদ্ধবাজ* প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

মহাপ্রলয়

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮

এক

জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার ভেদ করে দেখার চেষ্টা করছে মাসুদ রানা। পুরু কাঁচে কেবল নিজের ছায়াই দেখতে পাচ্ছে। চোখ কুঁচকে ভেতরের যুবককে দেখছে ছায়াটা।

গভীর রাত। মেঘের বুক চিরে সগর্জনে ছুটে চলেছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের লন্ডন-রোম সরাসরি ফ্লাইট—জাম্বো জেট। বিশাল উদরের দুই তৃতীয়াংশই ফাঁকা তার। ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী রানাকে নিয়ে মাত্র ছয়জন। মাঠ ফাঁকা দেখে যে যার ইচ্ছেমত আসনে বসেছে। ও বেছে নিয়েছে একেবারে পিছনের সারির জানালাঘেঁষা সীট। মাথা ঘামানোর উপযুক্ত জায়গা।

অন্য যাত্রীরা প্লেন লন্ডন ছাড়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম ওরও প্রয়োজন, কিন্তু আসছে না। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে রানা। মাথার মধ্যে গিজ গিজ করছে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার পোকা।

জানালায় ওর পাশে আরেকটা ছায়া দেখে সচকিত হলো, ঘুরে তাকাল। এয়ার হোস্টেস। রেনেসাঁ যুগের কোন নামকরা পেইন্টিং থেকে নেমে আসা অপ্সরীর মত লাগছে মেয়েটিকে। চোখাচোখি হতে মোনালিসা-কিসিম হাসি দিল সে। তার ভেতরে অন্য রকম ইঙ্গিতও ছিল, দেখেও না দেখার ভান করল রানা। ওসব দেখার মূডে নেই ও এখন।

'এনি ড্রিঙ্ক, মিস্টার গ্যারি কার?' কথা নয়, যেন জলতরঙ্গ বেজে উঠল মেয়েটির কণ্ঠে।

'নো, থ্যাঙ্ক ইউ।'

ওর গায়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে ওপরের হোল্ড থেকে পাতলা একটা কম্বল বের করল মেয়েটি। 'ঘুমাবেন নিশ্চই! গায়ে দিয়ে দিই?'

'তার দরকার নেই। ঘুম পেলে আমিই জড়িয়ে নেব, ধন্যবাদ।'

ওকে গম্ভীর হয়ে উঠতে দেখে আঁতে বোধহয় ঘা লাগল অপসরীর। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে কম্বলটা পাশের সীটে রেখে দিল। নীরবে ফ্লাইট ডেকের দিকে চলে গেল ধীর পায়ে। মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে যেতে নিজের চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল রানা। সবাই বিভোর। একজন নাকও ডাকাচ্ছে।

নিশ্চিন্তে মাথার ওপরের রীডিং লাইট জ্বেলে দিল ও। কোটের ভেতরের পকেট থেকে বের করল কয়েক ভাঁজ করা আড়াই গজ দীর্ঘ এক ফ্যাক্স মেসেজ। আজই রোম থেকে লন্ডনে রানা এজেন্সিতে পাঠিয়েছে এটা বিসিআই-এর রোম এজেন্ট, সাদেকুর রহমান। কয়েকজন আন্তর্জাতিক

খ্যাতিসম্পন্ন মহারথীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। আরেকবার ভাল করে, সময় নিয়ে পড়তে শুরু করল ও বার্তাটা। ওটা এরকম:

হেদায়েতুল ইসলাম: বাংলাদেশী। '৭১-এ আল বদর বাহিনীর অন্যতম মাথা ছিল। এর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকজন নামকরা বুদ্ধিজীবীকে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। ১৬ ডিসেম্বরের পর আত্মগোপন করে লন্ডন চলে যায়। মোহাম্মদপুর থানায় এর নামে চাপা পড়ে থাকা কয়েকটা খুন ও ডাকাতির কেস ছিল, দীর্ঘ আড়াই দশক পর নতুন করে সে সবের তদন্ত শুরু হয়েছে। দুটো খুনের সাথে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় হেদায়েতুল ইসলামের নামে সম্প্রতি গ্রেফতারী পরওয়ানাও জারী করেছে পুলিস। আশির দশকের শেষ দিকে নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হওয়ায় কিছুদিন এক নার্সিং হোমে থাকতে হয় তাকে।

বর্তমান বয়স পঞ্চাশ (আনুমানিক)। ইউরোপ-আমেরিকার চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত। কম্পিউটর জাদুকর নামেও পরিচিত। কাজ করছে অল স্টার আন্তর্জাতিক ছবি ডি-ডে'তে।

লরেনযো কন্টি: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইটালিয়ান চলচ্চিত্র প্রযোজক। প্রথম জীবনে ব্লু ফিল্‌ম্ তৈরি করে প্রচুর অর্থ কামিয়েছে। বর্তমানে ইটালির সবচেয়ে ধনীদের একজন। নতুন এক চলচ্চিত্র তৈরির কাজে হাত দিয়েছে সম্প্রতি। ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, মিশর, ভারত, ফ্রান্স ও ইটালির সেরা তারকাদের সমন্বয়ে তৈরি হতে যাচ্ছে সে ছবি। বিষয়বস্তু: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ছবির নাম: ডি-ডে।

চলচ্চিত্র জগতে খুবই সফল ও খ্যাতিমান। কন্টির প্রযোজিত প্রত্যেকটি ছবি সুপার-ডুপার হিট। রোমে রাজকীয় *প্যালাযযো* (প্যালেস) আছে তার। ক্যাপরিতে আছে শানদার ভিলা ও দক্ষিণ ফ্রান্সে বিলাসবহুল শ্যাতো। সেসবের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে রয়েছে শতাধিক ম্যানসার্ভেন্ট কয়েক ডজন অল্পবয়সী মেয়ে পরিচারিকা।

কিছুদিন পর পর এসব পরিচারিকাদের কারও না কারও 'আকস্মিক মৃত্যুর' ব্যাপারটা প্রায় নিয়মিত ঘটনা ছিল কয়েক বছর আগে পর্যন্ত। প্রতিটি ঘটনার সময় কন্টি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। শেষবার এমনটি ঘটে আশির দশকের শেষদিকে। এক তরুণী অস্ট্রিয়ান পরিচারিকার 'আকস্মিক মৃত্যুর' পরপরই নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হয় লরেনযো কন্টি। চিকিৎসার জন্যে দু'মাস কাটায় এই নার্সিং হোমে।

বর্তমানে সুস্থ (!)। রোমে নিজের নতুন ছবি ডি-ডে নিয়ে ব্যস্ত। ছবির বাজেট একশো মিলিয়ন ডলার। খুব বড় বাজেট, তাই কয়েকজন খুচরো প্রযোজককেও সাথে নিয়েছে সে। বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন (আনুমানিক)।

স্যার হিউ মারসল্যান্ড: প্রাক্তন এক ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রী। বিশালদেহী এক

দানব। বিলিয়নেয়ার (পাউন্ডের হিসেবে)। ডি-ডে পরিবেশনার দায়িত্বে রয়েছে মারসল্যান্ডের মারসল্যান্ড এন্টারপ্রাইজ। লরেনযো কন্টির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আশির দশকের শেষদিকে অজ্ঞাত কারণে দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল। অনেক চেষ্টা করেও এ ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি।

ব্রিটেনের শো-বিজনেস ফিনান্সিঙের ক্ষেত্রে এক নম্বর ব্যক্তি।

পিয়েরো সিমকা: ইটালিয়ান রাজনীতির জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ব্যাঙ্কার ও প্লেবয়। বেঁটে বামুন। টাকা ও প্রভাব অন্তহীন। ডি-ডে'র সাথে জড়িত। টাকা অন্যের হলেও সবকিছু সিমকার নির্দেশেই চলে।

বয়স পঞ্চান্ন (আনুমানিক)। আশির দশকের শেষ দিকে দীর্ঘদিন জনসমক্ষে দেখা যায়নি তাকে। কোথায় ছিল, জানা যায়নি।

স্টাডস ম্যালোরি: আমেরিকান প্রযোজক-পরিচালক। আশির দশকের শেষভাগে দু'বার অস্কারের জন্যে মনোনীত হলেও শেষ পর্যন্ত পুরস্কার পায়নি ম্যালোরি। এরপর মাথা ব্যথার কারণে লম্বা সময় স্বেচ্ছা নির্বাসনে ছিল। কোথায় ছিল, জানা সম্ভব হয়নি।

বয়স ষাট (আনুমানিক)। আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি এর ব্যাপারে।

আনমনে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল মাসুদ রানা। শেষটুকু আর পড়ল না। কপালের কুঞ্চন কিছুটা গভীর হয়েছে আগের চেয়ে। কিছু একটা অনুমান করার চেষ্টা করছে ও। পাঁচটা নাম, পাঁচজন মানুষ, প্রত্যেকেই বিশেষ একটা সময়ে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছিল কিছুকালের জন্যে। এরমধ্যে কি কোন যোগাযোগ আছে? কোন বিশেষ সূত্র?

রীডিং লাইট নিভিয়ে দিল ও। চোখ বুজে হেলান দিয়ে বসল। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর, অথচ ঘুম আসছে না। আসবেও না। অন্তত রোম না পৌঁছা পর্যন্ত।

ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটছে ওখানে। সত্যি কি তাই? ব্যাপারটা নতুন করে আরেকবার খতিয়ে দেখার জন্যে অতীতে তলিয়ে গেল মাসুদ রানা।

আজই দুপুরের ঘটনা। লন্ডন, রানা এজেন্সিতে নিজের অফিসরুমে বসে আছে ও। লাঞ্চ কোথায় করবে ভাবছে, হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোন। ঘুরে তাকাল রানা। কয়েকটা টেলিফোন আছে টেবিলে, তার মধ্যে লালটা বাজছে। ওর মনে হলো বাজছে না, যেন আর্তস্বরে চিৎকার করছে। ওটা বিশেষ ফোন। হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া কেউ জানে না ওটার নম্বর। স্ক্র্যাম্বলার সংযুক্ত, আনট্রেসেব্‌ল্। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার। রিসিভার আলতো করে তুলে কানে লাগাল।

'ইয়েস!'

'মাসুদ ভাই?'

'কে?'

'আমি, মাসুদ ভাই। সাদেক। রোম থেকে।'

লোকটার কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে আভাস পেয়ে রিসিভার কানের সাথে ঠেসে ধরল ও। গলা চড়ে গেল আপনাআপনি। 'সাদেক! কি হয়েছে?'

'মাসুদ ভাই, আমি খুব বিপদে পড়ে গিয়েছি। খুব বড়রকম এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি।'

'কি হয়েছে, খুলে বলো।'

'আমি···' গলা ভেঙে গেল বিসিআই-এর রোম এজেন্ট সাদেকুর রহমানের। 'আমি বোধহয় আর বাঁচব না। ওরা আমাকে···ওরা···'

ধমকে উঠল রানা, 'কি হয়েছে খুলে বলছ না কেন?' উত্তেজনায় গলা আরও চড়ে গেল। 'তাড়াতাড়ি বলো!'

'পারছি না, মাসুদ ভাই।' একটু বিরতি। 'ও-ওরা বোধহয় এদিকেই আসছে! আমাকে যদি দেখে ফেলে, নির্ঘাৎ মেরে ফেলবে। আমি···আমি খুব বিপদে আছি, মাসুদ ভাই! আমাকে বাঁচান!'

শক্ত হয়ে গেল ও। 'সাদেক, শোনো! ফোন রেখে সরে পড়ো। পালাও! আমি আজই রোমে আসছি। এসে শুনব কি হয়েছে, কেমন?'

'জ্বি, জ্বি! এখন রাখছি। সুযোগ পেলে পরে আবার ফোন করব। নয়তো ফ্যাক্স। ঢাকার সাথে কথা বলেছি। দুই জায়গায় কথা বলতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে,' গলা কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল সাদেকের। 'ওরা ট্রেস করে ফেলেছে আমার ফোন। মনে হয়। মাসুদ ভাই, যদি আমি না থাকি···ওই বোধহয়···'

ফোনে খুব সম্ভব একটা হাঁক শুনল রানা, খুব দ্রুত কাছে চলে আসছে একাধিক কণ্ঠ। উত্তেজিত কণ্ঠে কি যেন বলছে। 'পালাও সাদেক!' চেঁচিয়ে বলল ও। 'পালাও! গা ঢাকা দাও! আমি···' থেমে গেল লাইন কেটে গেছে টের পেয়ে। রিসিভার চোখের সামনে ধরে আহাম্মকের মত তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে।

এক সময় সচকিত হলো ও। রেখে দিল রিসিভার। চোখের সামনে হাসিখুশি, টগবগে সাদেকের চেহারা ভাসছে। কি হয়েছে? কি বিপদে পড়েছে ও? সাদেক ওর নিজের হাতে গড়া এজেন্ট, দু'বছর আগে পোস্টিং হয়েছে তার রোমে। এর মধ্যে কি এমন···? লাঞ্চের কথা বেমালুম ভুলে গেল রানা, অস্থিরচিত্তে সময় পার করতে থাকল। সিগারেট টেনে চলল একটার পর একটা। এরমধ্যে নিজের জন্যে রোমগামী প্রথম ডিরেক্ট ফ্লাইটের টিকেট বুক করার কথা ট্রাভেল এজেন্সিকে জানিয়ে দিয়েছে।

পনেরো মিনিট পর ঢাকা থেকে এল বিসিআই প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের ফোন। 'রানা!'

'জ্বি, স্যার।'

'একটু আগে রোম থেকে···'

'জানি, স্যার। এখানেও ফোন করেছিল ও।'

একটু বিরতি। 'সব শুনেছ তাহলে?'

'সাদেক বিপদে পড়েছে, এইটুকু শুনেছি কেবল, আর কিছু বলার সময় পায়নি ও।'

'তুমি বরং রোম রওনা হয়ে যাও।'

'যাচ্ছি, স্যার। টিকেট বুক করে ফেলেছি অলরেডি।'

'গুড। ফোন করার আগে সাদেক বড় একটা ফ্যাক্স মেসেজ পাঠিয়েছে এখানে, তুমি ঢাকায় আছ মনে করে। ওটা পাঠাচ্ছি আমি।'

'কি ঘটেছে ওখানে, স্যার?' বলল রানা।

'কথা বলে নষ্ট করার মত সময় নেই, রানা,' ভরাট গলায় বললেন বৃদ্ধ। বলার সুরে অস্থিরতা। 'খুব জটিল পরিস্থিতি। তুমি মেসেজটা পড়তে থাকো, এই সুযোগে আমি খুব জরুরী একটা ফোন কল সেরে নিই। তারপর আবার যোগাযোগ করব।'

'আচ্ছা। পাঠিয়ে দিন···' বাঁ কনুইয়ের কাছে মৃদু গুঞ্জন শুনে ঘুরে তাকাল রানা। 'এক মিনিট, স্যার!'

'কি হলো?'

'আমার ফ্যাক্স মেশিনে একটা মেসেজ আসতে শুরু করেছে। মনে হয় সাদেকের মেসেজ···' থেমে গেল ও। আপনমনে বলল, 'নাকি?' ঝুঁকল বাঁ দিকের ফাইল র‍্যাকের ওপর রাখা মেশিনটার ওপর। 'হ্যাঁ মনে হয়, স্যার। মেসেজের শুরুতে হেদায়েতুল ইসলাম···'

'হ্যাঁ, ওটাই। ভালই হলো। তুমি পড়ো, আমি পড়েছি। পড়ে এ ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপও নিয়েছি। তোমার ফ্লাইট ক'টায়?'

'মাঝরাতে, স্যার।'

'ঠিক আছে। অফিসে থেকো, কাজ সেরে আবার ফোন করব আমি।'

রিসিভার রেখে জ্যান্ত হয়ে ওঠা ফ্যাক্স মেশিনটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। লম্বা সময় নিয়ে শেষ হলো সাদেকের মেসেজ। পরপর কয়েকবার পড়ল ও। পাঁচজন মানুষের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। তার সাথে ডি-ডে নামের এক নির্মীয়মান ছায়াছবি সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য। লোকগুলোর ব্যাপারে দুটো তথ্য কমন ও সন্দেহজনক মনে হলো রানার। একটা হচ্ছে, অতীতে এরা প্রত্যেকে বিশেষ একটা সময়ে লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল কিছুদিনের জন্যে। অন্যটা হলো, বর্তমানে এরা সবাই রোমে জড়ো হয়েছে এবং পাঁচজন একই কাজে জড়িত।

বর্তমানে ফিরে এল মাসুদ রানা। সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকল। মেসেজের শেষের তথ্যগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। শেষদিকে সাদেক লিখেছে, ডি-ডে নির্মাণের জন্যে এরা প্রচুর অত্যাধুনিক মিলিটারি ইকুইপমেন্ট জোগাড় করেছে নানান দেশ থেকে। ট্যাঙ্ক, বিমান, মিসাইল ইত্যাদি। এরমধ্যে অস্বাভাবিক কিছু আছে বলে মনে হলো না ওর।

আধুনিক যুদ্ধের ছবিতে যুদ্ধাস্ত্র থাকেই। ডি-ডে তো অনেক বড় মানের ছবি, তাতেও এসব থাকবে। থাকবে বলেই না এত বিশাল অঙ্কের বাজেট। তাছাড়া সাদেক নিজেই লিখেছে, অস্ত্রশস্ত্র যেসব দেশ থেকে আনা হয়েছে;

ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, সব ক'টা দেশের এবং ন্যাটোর লিয়াজোঁ অফিসাররা এ ব্যাপারে লিখিত অনুমতি দিয়েছে ছবির প্রযোজককে। অতীতেও অনেক ছবিকেই দেয়া হয়েছে তা। তাহলে এর মধ্যে অস্বাভাবিক কোনটা?

আবার মেসেজটা বের করল ও। আলো জ্বেলে আগাগোড়া পড়ল আরেকবার। সন্দেহটা তখনই জাগল মনে। সাদেকের মেসেজটা কি শেষ হয়েছিল, না মাঝপথে থেমে গিয়েছিল? ফ্যাক্স মেসেজ শেষ হলে নিচে দিন-তারিখ, ক'টায় শুরু হলো মেসেজ, ক'টায় শেষ হলো, প্রতিটি সেকেন্ড পর্যন্ত প্রিন্ট হয়। তার দু'পাশে থাকে বৈশিষ্ট্যসূচক তারকা চিহ্ন বা অ্যাস্টারিস্ক (***)।

এটায় তার কিছুই নেই। কেন? এর সম্ভাব্য উত্তর একটাই—মেসেজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। কপাল চুলকাতে লাগল অন্যমনস্ক রানা। এমন জরুরী একটা ব্যাপার কি করে নজর এড়িয়ে গেল? কেন তখন ব্যাপারটা খেয়াল করল না ও? এতবড় এক ভুল কি করে হলো ওকে দিয়ে? তখন যদি লক্ষ করত ব্যাপারটা, ঢাকা থেকে সাদেকের প্রথম পাঠানো মেসেজটা রাহাত খানকে লন্ডন পাঠাতে বলতে পারত রানা। জেনে নিতে পারত মেসেজের শেষটা। আফসোস! এখন আর সে সুযোগ নেই।

ওর ফ্যাক্সেও একই মেসেজ আসছে শুনে রাহাত খান ধরেই নিয়েছেন সম্পূর্ণ মেসেজই পেয়ে গেছে রানা। ইস্, ভুল শোধরানোর আরেকটা সুযোগ যদি পাওয়া যেত!

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। আলো নিভিয়ে চোখ বুজল আবার। সাদেকের কথা ভাবতে লাগল। হলো না, গোল পাকিয়ে যাচ্ছে সব মাথার মধ্যে। হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো ও, চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিল। নিজের বর্তমান পরিচয় নিয়ে ভাবতে বসে গেল। ওর নাম গ্যারি কার। টেক্সাসের ধনী তেল ব্যবসায়ী। রোম চলেছে লরেনযো কন্টি ও স্যার হিউ মারসল্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করতে। বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে।

এটা রাহাত খানের কীর্তি। ওর এই পরিচয় খাড়া করার জন্যেই বৃদ্ধ 'খুব জরুরী একটা ফোন কল' করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। রানা এখন হলপ করে বলতে পারে, ও সত্যিই গ্যারি কার। পাসপোর্টে তাই আছে। তাছাড়া লিউ কেলভিন নামে এক আমেরিকান টাইকুন, গ্যারি কারের হয়ে ওকালতি করে চিঠি দিয়েছেন রোমে অবস্থানরত তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু স্যার হিউ ও লরেনযো কন্টিকে। অনুরোধ করেছেন ও যে জন্যে রোম যাচ্ছে, তা সফল করতে তারা যেন সহযোগিতা করে। সে চিঠিও এখন রানার পকেটে।

ব্রীফকেসের ফলস্ কম্পার্টমেন্টে আছে আরও এক সেট কাগজপত্র। বেন কার্পেন্টার নামে। নিতান্ত ঠেকায় পড়লে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে আছে ওটা।

লিউ কেলভিন রাহাত খানের অনেক পুরানো বন্ধু। বন্ধুর অনুরোধ পেয়ে এক মুহূর্তও দেরি করেননি ভদ্রলোক, চিঠি লিখে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে দিয়ে গেছেন লন্ডনে। মাসুদ রানার হাতে। যদিও তা ডাহা মিথ্যে। কিন্তু প্রমাণ করার উপায় নেই। মারসল্যান্ড বা কন্টি যদি সত্যতা যাচাই করতে চায়,

চিঠির ব্যাপারটা স্বীকার করবেন তিনি। সে ব্যাপারে আসলেই কথা হয়েছে দুই বৃদ্ধের।

গ্যারি কারের পাসপোর্টের ব্যাপারটা অবশ্য মাসুদ রানার কীর্তি। লন্ডনে ওর অফিসের গোপন সেফে অসংখ্য পাসপোর্ট মজুত আছে। ওগুলোর নাম-ঠিকানা, জাতীয়তা ইত্যাদি আগড়ম-বাগড়ম হলেও ছবিগুলো রানারই। সীল-ছাপ্পরও খাঁটি। আসলে শতকরা একশো ভাগ ভেজাল। রাহাত খানের সাথে দ্বিতীয় দফা আলোচনা সেরে গ্যারি কারকে জ্যান্ত করেছে ও।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আচমকা জেগে উঠল ক্যাপ্টেনের খ্যানখেনে ধাতব কণ্ঠস্বরে। আধ ঘণ্টার মধ্যে বিমান রোমে ল্যান্ড করবে—ঘোষণা করছে লোকটা। পুব দিগন্তে আলোর আভাস দেখল রানা। হাই তুলল লম্বা করে। আশ্চর্য! আলোর আভাস দেখামাত্র মনের গুমোট ভাবটা কেটে যেতে শুরু করল। দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গেল দ্রুত। এই-ই হয়, ভাবল ও, আঁধারের সাথে ভয় ও দুশ্চিন্তার কি যেন এক সম্পর্ক আছে।

আঁধার নামলে ছেঁকে ধরে ওরা, আবার আলো ফুটলে পালায়। রেনেসাঁ যুগের পেইন্টিংটিকে সামনে দেখে মধুর হাসি দিল ও। 'এক কাপ কালো কফি, প্লীজ!'

'শুধু কফি, স্যার?' খানিক দ্বিধার পর মেয়েটিও হাসল। রাতের গম্ভীর যাত্রীটির সাথে ওকে মেলানো যাচ্ছে না দেখে ভারি অবাক হলো সে। 'নো ব্রেকফাস্ট?'

'না, ধন্যবাদ। তোমার মত সুন্দরীর হাতে শুধু কফিই যথেষ্ট,' আরেক পশলা ভুবনভোলানো হাসি বর্ষণ করল রানা। 'আর কোন ব্রেকের প্রয়োজন নেই।'

মহা ফাঁপরে পড়ে গেল মেয়েটি। যুবকের হাসি অন্তরঙ্গই মনে হচ্ছে, কিন্তু তার জবাবে পাল্টা হাসি দিতে বাধছে কেন যেন। 'রাইট, স্যার,' বলে দ্রুত কেটে পড়ল সে।

রোমের উপকণ্ঠে ফিউমিসিনোর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে যখন অবতরণ করল রানার ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের জাম্বো, সূর্য তখন দূরের পাহাড় চুড়োয় তার প্রথম সোনালী পরশ বোলাচ্ছে।

এর মধ্যে আড়ং বসে গেছে যেন এয়ারপোর্টে। মানুষের গুঁতোয় পা ফেলা দায়। কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন ব্যারিয়ার অতিক্রম করতে ঘাম ছুটে গেল ওর। টার্মিনাল ভবনের বাইরে এসে ট্যাক্সির আশায় এদিক ওদিক তাকাল। চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা চারদিকে। অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর চারটে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ছেড়ে যাবে, কাজেই মহাব্যস্ত সবাই। ব্যস্ততার মধ্যেও যে শৃঙ্খলা রেখে চলা যায়, মানুষ কবে শিখবে তা? চরম বিরক্ত হয়ে ভাবল মাসুদ রানা।

ইউরোপে ইটালিয়ানরাই সবচেয়ে অসভ্য, বিশৃঙ্খল জাতি, ব্যাপারটা খেয়াল হতে রাগ একটু কমল। খানিকটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ানোর উদ্দেশে

একমাত্র লাগেজ, ছোট একটা সুটকেস ও ব্রীফকেসটা নিয়ে পা বাড়াল। আসার আগে ইচ্ছে করেই এখানকার বিসিআই বা রানা এজেন্সি, কারও সাথেই যোগাযোগ করেনি ও। সম্পূর্ণ গোপন রাখতে চেয়েছে সফরের বিষয়টা, অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে। তাই কোন গাড়ি আসেনি ওর জন্যে। এদিকে এয়ারপোর্টের বাস চালকদের স্ট্রাইক চলছে, কাজেই ট্যাক্সি এ মুহূর্তে সোনার হরিণ।

ঝাড়া চল্লিশ মিনিট পর জুটল একটা। ডাকাতের মত চেহারা বিশালদেহী ড্রাইভারের। 'কোথায় যাবেন, সেনিয়র?'

লাগেজ দুটো পেছনের সীটে ছুঁড়ে দিল মাসুদ রানা। 'হোটেল আলবার্গো লে সুপারব।'

নামটা পছন্দ হলো ড্রাইভারের, ওখানে কারা ওঠে ভালই জানে সে। অতএব ভাড়াও নির্দ্বিধায় ডাকাতের মতই হেঁকে বসল চারগুণ বেশি। মহাবিরক্ত হয়ে হাত নাড়ল রানা, খাস বাংলায় খ্যাক খ্যাক করে উঠল, 'চালা, ব্যাটা!'

'কি বললেন, সেনিয়র?'

'বলছি চলো, গাড়ি ছাড়ো। প্রনটো!'

রোমের প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদোপম আলবার্গো লে সুপারব। দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল হোটেল। লন্ডন থেকে ওখানে নিজের স্যুইট বুক করিয়ে এসেছে রানা। ওটাতেই আছে ডি-ডে'র রথী-মহারথীরা। রেজিস্টারে সই করে ক্লার্কের উদ্দেশে মৃদু হাসি দিল ও। 'স্যার হিউ মারসল্যান্ড আর সেনিয়র লরেনযো কন্টি শুনেছি আপনাদের এখানে আছেন, সত্যি নাকি?'

'রাইট, সেনিয়র কার!' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল লোকটার। 'ওঁরা ছাড়াও আরও অনেকে আছেন।'

কলমের জন্যে পকেটে হাত ভরল রানা। 'ওঁদের আমার পৌঁছার খবরটা তাহলে জানাতে হয়,' বলল আনমনে।

'শিওর, শিওর!' হোটেলের এম্বস করা দামী প্যাড এগিয়ে দিল ক্লার্ক। 'এতে লিখুন, সেনিয়র। একটু আগে বাইরে গেছেন ওঁরা, ফিরে আসামাত্র আপনার নোট পৌঁছে দেব আমি।'

'গ্র্যাযি।' একটাই সংক্ষিপ্ত নোট লিখল রানা দু'জনের উদ্দেশে। তারপর প্যাড ঠেলে দিল ক্লার্কের দিকে। পকেট থেকে দুটো কড়কড়ে পাঁচ হাজার লিরা নোট বের করে গুঁজে দিল তার হাতে। বিনয়ে মনে হলো বুঝি শুয়ে পড়তে যাচ্ছে লোকটা। তাকাল না ও আর, বেলবয়ের পিছন পিছন লিফটের দিকে চলল।

স্যুইটটা তিনরুমের—প্রকাণ্ড। খুব বেশিরকম জাঁকাল। গোড়ালি পর্যন্ত মোলায়েম কার্পেটে ডুবিয়ে বেডরুমে চলে এল রানা। এক হাজার লিরার দুটো নোট টিপস্ দিয়ে বিদায় করল বয়কে। রুম সার্ভিসকে নাস্তা পাঠাতে বলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। পনেরো মিনিট পর শাওয়ার-শেভ সেরে তরতাজা হয়ে বিশাল এক তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এল ও।

নতুন এক সেট পোশাক পরে নাস্তা করল। পেটের জ্বালা কমতে পূর্ণবেগে কাজ শুরু করে দিল মাথা। ধূমায়িত কড়া কালো কফিতে মৃদু চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। করণীয় সম্পর্কে ভাবতে লাগল। প্রথম কাজ বিসিআইয়ের বিশেষ নম্বরে ফোন করে সাদেকুর রহমান সম্পর্কে খোঁজ নেয়া। কফি শেষ করে উঠল ও। বের হওয়ার জন্যে তৈরি হলো। তখনই বেজে উঠল টেলিফোন।

'সেনিয়র গ্যারি কার?' প্রশ্ন করল এক মেয়ে।

'হিয়ার।'

'সেনিয়র লরেনযো কন্টি কথা বলবেন আপনার সাথে। এক মিনিট ধরুন, সেনিয়র।'

'ওকে।'

কয়েক সেকেন্ড পর একটা গমগমে পুরুষ কণ্ঠ কথা বলে উঠল। কড়া ইটালিয়ান অ্যাকসেন্টের ইংরেজিতে বলল, 'লরেনযো কন্টি বলছি, সেনিয়র কার। আপনার নোট পেয়েছি। লিউ কেলভিন আপনাকে পাঠিয়েছে জেনে খুশি হয়েছি। কেমন আছে বুড়ো শকুন?'

'ভালই আছেন, সেনিয়র। তিনি এবং পাঁচ নম্বর মিসেস কেলভিন শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আপনাকে।'

'শুনে ভাল লাগল। কিন্তু সেনিয়র, আমি খুব দুঃখিত। ছবির প্রয়োজনীয় তহবিল এরমধ্যে প্রায় পুরোটাই জোগাড় হয়ে গেছে। তবু···আপনি যখন এতদূর এসেই পড়েছেন, উঁমম! এক কাজ করুন না, আজ সন্ধের পর এক ককটেল পার্টি দিচ্ছি আমরা এখানকার মনযা রূমে। আমরা সবাই থাকব। আপনিও আসুন না। খুব খুশি হব তাহলে। সে, সাড়ে সাতটায়?'

গলায় খানিকটা হতাশার সুর ফোটাল রানা। 'বেশ।'

'না না, হতাশ হবেন না, সেনিয়র। আমি দেখছি আপনার ব্যাপারে কি করা যায়। হাজার হোক, লিউ আমার অনেক পুরনো বন্ধু। ওর অনুরোধ এক কথায় নাকচ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তো, আসছেন তো?'

'নিশ্চই!'

'গুড। আমি এরমধ্যে আমার পার্টনারদের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা সেরে ফেলব। ওকে?'

'ওকে। গ্র্যাযি।'

'সাড়ে সাতটায়, বেলা রোমার মনযা রূমে।'

'রাইট।'

ফোন রেখে বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। তার আগে ডোর নবে কয়েক ভাষায় লেখা 'ডু নট ডিসটার্ব' বোর্ড ঝুলিয়ে দিতে ভুলল না। ফুটপাথের ভিড়ে খানিক এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াল ও সম্ভাব্য ফেউ খসাবার জন্যে। তারপর সড়াৎ করে ঢুকে পড়ল এক রোড সাইড পাবে। কাঁচের দরজা বন্ধ করে শেষবারের মত চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল। কেউ পিছু নিয়েছে বলে মনে হলো না। ফোনের রিসিভার তুলে বিশেষ এক নম্বর টিপল রানা। প্রায় সঙ্গে

সঙ্গে সাড়া দিল একটা পুরুষ কণ্ঠ। 'ইয়েস!'

'দুইয়ে দুইয়ে চার হয় জানি,' থেমে থেমে খাস বাংলায় বলল ও। 'কিন্তু দুই আর তিন মিলে কত হয়, জানি না। কত হয়?'

ওপ্রান্তের লোকটির নিঃশ্বাস আটকে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল স্পষ্ট। 'পাঁচ হয়।'

'এম আর নাইন।'

'হায় খোদা!' কাঁপা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লোকটা।

'কি হয়েছে?'

'উনি তো নেই।'

'কোথায় গেছে?' বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল রানার।

'যেখান থেকে ফেরা যায় না কোনদিন।'

মাথা ঘুরে উঠল রানার। মুহূর্তের জন্যে চোখের সামনের সবকিছু আউট অভ ফোকাস হয়ে গেল। দ্রুত এক হাত তুলে বুদের দেয়াল ধরে নিজেকে সামলাল। 'কি বললে? কখন?'

'কাল। আপনাকে ফ্যাক্স করার সময়।'

এই জন্যেই, সামলে নিয়ে ভাবল রানা, এই জন্যেই অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল সাদেকুর রহমানের ফ্যাক্স মেসেজ। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকল ও আহাম্মকের মত। মাথায় খেলছে না কিছু। 'কোত্থেকে ফ্যাক্স করেছিল?'

'জেনারেল পোস্ট অফিস থেকে। ওখানেই খুন করা হয়েছে ওনাকে।' একটু বিরতি দিল কণ্ঠটা। 'আপনি আসছেন?'

জবাব দিল না রানা। ভাবছে কি যেন।

'আপনি আছেন লাইনে?'

'হ্যাঁ। মৃতদেহ কোথায়?'

'মর্গে।'

'দুই নম্বর সেফ হাউসে এসো। আমি যাচ্ছি ওখানে।'

'জ্বি।'

ফোন রেখে কপালে জমে ওঠা স্বেদবিন্দু মুছল ও। ধীরপায়ে বেরিয়ে এল বুদ থেকে। দূরে হোটেলটার একাংশ দেখা যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকল আনমনে। চেহারা বিষণ্ন। খালি খালি লাগছে বুকের ভেতরটা।

অনেকক্ষণ পর সচকিত হলো। পায়ে পায়ে ফিরে চলল। মনে মনে বারবার একই কথা বলছে, আমি এর প্রতিশোধ নেব, সাদেক। প্রতিজ্ঞা করছি আমি এর প্রতিশোধ নেব। ওরা কেউ বাঁচতে পারবে না। কেউ না। ওরা আমার বুকের পাঁজর ভেঙেছে, আমিও ওদেরগুলো ভাঙব, সাদেক। প্রতিজ্ঞা করছি।

ট্যাক্সি ডাকল রানা, পিয়াযযা নাভোনা যেতে নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে। জায়গাটা রোমের অন্যতম টুরিস্ট আকর্ষণ। প্রচুর টুরিস্ট ঘুর-ঘুর করছে স্কয়ারে। তাদের ভিড়ে মিশে এগোল ও। ট্রি স্ক্যালিনি অতিক্রম করে ঘুরে

আগের জায়গায় ফিরে এল। সম্ভাব্য অনুসরণকারীকে বিভ্রান্ত করার জন্যে এটা পুরানো, তবে কার্যকর এক ট্রিক। দু'বার একই কাজ করল মাসুদ রানা, তারপর সোজা হাঁটা ধরল স্কয়্যারের উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে।

মানুষের ভিড়ে ভারাক্রান্ত করসো ভিত্তোরিও এমানুয়েলে এসে পড়ল। একই মুহূর্তে বাঁক ঘুরে ট্রাসটিভেয়ারমুখী একটা বাস এদিকেই আসছে দেখে ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল রানা। গিজগিজে ভিড় ভেতরে। ঠেলে-গুঁতিয়ে যতটা সম্ভব নিজেকে ভেতরে সেঁধিয়ে দিল। সন্তুষ্ট। জানে, খসিয়ে দেয়া গেছে পিছনের সম্ভাব্য অনুসরণকারীকে। পনেরো মিনিট পর ট্রাসটিভেয়ার পৌঁছল বাস।

সেফ হাউসটা এক সরু কানাগলির মুখে। দোতলায়। নিচে কয়েকটা দোকান। *তাবাচ্চি* সিগারেট, লবণ আর লটারির টিকেটের বিজ্ঞাপন ঝুলছে সামনে। বিল্ডিঙের এক সাইডে সিঁড়ি। প্রথম দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কেনার ফাঁকে পিছনদিকে ভাল করে নজর বুলিয়ে নিল রানা। নেই তেমন কেউ।

দোতলায় উঠে এল ও। সাঙ্কেতিক নক করল নির্দিষ্ট দরজায়। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সী এক যুবক দরজা খুলল। হিরণ নাম। সাদেকুর রহমানের সুযোগ্য সহকারী। রানা ভেতরে ঢুকতে দরজা বন্ধ করে দিল যুবক।

তার শুকনো মুখের দিকে চেয়ে থাকল ও কয়েক সেকেন্ড। ভেবে পাচ্ছে না কি বলে আলাপ শুরু করবে। নিজের আবেগ কঠোর হাতে দমন করল রানা। 'ভেঙে পড়েছ মনে হচ্ছে?'

পলকের জন্যে চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল হিরণ। দু'চোখ মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল তার। 'জ্বি, সাদেক ভাই···' থেমে পড়ল যুবক। দু'গাল কুঁচকে উঠল। মনে হলো এখনই কেঁদে উঠবে।

'এখন আবেগ প্রকাশের সময় নয়, হিরণ,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। 'সামনে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, সামাল দাও নিজেকে।'

আস্তিনে চোখের কোণ মুছল যুবক। দাঁড়িয়ে থাকল মাথা নিচু করে। 'জ্বি।' নাক টানল।

'খুলে বলো কি ঘটেছে।'

'কি সন্দেহ হওয়ায় গত কিছুদিন থেকে ডি-ডে নামে এক ছবির নির্মাতাদের কয়েকজনের অতীত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজে লেগেছিলেন সাদেক ভাই। গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানতেও পেরেছিলেন।'

'তারপর?'

'পরশুদিন খুব চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন মনে হয়েছে তাঁকে। একবার বলেছিলেন, "আমি বোধহয় ধরা পড়ে গেলাম"।'

কপাল কুঁচকে উঠল রানার। বড়সড় রুমের মাঝখানে রাখা দুটো চেয়ারের একটায় বসে পড়ল, হাত ইশারায় অন্যটায় বসতে বলল হিরণকে। 'কার কাছে?'

বসল হিরণ। 'তা বলেননি। শুধু বললেন, যে কোন মুহূর্তে মারাত্মক

বিপদ ঘটে যেতে পারে তাঁর। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।'

'আচ্ছা।'

'আমি বলেছিলাম কয়েকদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে। শুনলেন না।'

মুখ নিচু করে কিছুক্ষণ জুতোর ডগা দেখল রানা। 'কি সন্দেহ জেগেছিল ওর মনে? কেন?'

'ঠিক জানি না, মাসুদ ভাই,' অপরাধীর মুখ করে বলল যুবক। 'তবে ওই দলে পিয়েরো সিমকা নামে একজন আছে, তার ব্যাপারে সাদেক ভাইয়ের বান্ধবী কি যেন বলেছিল তাঁকে।'

'সাদেকের বান্ধবী?'

'জ্বি, রোজানা মোরান্ডি। আলিটালিয়ার হোস্টেস।'

'আই সী। কোথায় এখন সে?'

'রোমেই আছে।'

'ঠিকানা?'

পকেট থেকে একটা খুদে নোটবুক বের করল হিরণ। 'এর মধ্যে লেখা আছে। সাদেক ভাইয়ের ব্যক্তিগত নোটবই এটা, ভেতরে হিজিবিজি অনেক কিছু লেখা আছে। চেষ্টা করেও কিছু বুঝতে পারিনি।'

ওটার ভেতরে খানিক চোখ বোলাল রানা। সত্যিই বলেছে হিরণ, অনেক আঁকিবুকি রয়েছে ভেতরে, দেখে বোঝার কোন উপায় নেই ওসবের মধ্যে কোন বার্তা লুকিয়ে আছে। সত্যি আছে? না আসলেই আঁকিবুকি? হিজিবিজি, অর্থহীন? ওটা পকেটে রাখল রানা। 'রোজানার সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। কথা বলব আমি।'

'করা যাবে। কখন যেতে চান, এখনই?'

'না। রাতে কোন এক সময়, যদি অন্য ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়ি,' ঘড়ি দেখল ও। তাড়াতাড়ি হোটেলে ফেরা উচিত। তিন ঘণ্টা হয়ে গেছে বেরিয়েছে। কেউ যদি স্যুইটে ওর অনুপস্থিতির বিষয়টা জেনে যায়, অন্য রকম হয়ে যেতে পারে।

'আমি এখানে অপেক্ষা করব?'

'না, কাজে যাও। সাদেকের মৃতদেহ ছাড়াবার ব্যবস্থা করো। এ মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা রাখা প্রয়োজন। আমাদের পেশায় আবেগ বড় বিপজ্জনক, হিরণ। কথাটা মনে রেখো। প্রস্তুত থেকো। যে কোন সময়ে তোমাকে প্রয়োজন পড়তে পারে।'

'জ্বি। থাকব।'

'আমার আধঘণ্টা পর বের হবে তুমি।'

'আচ্ছা।'

বেরিয়ে পড়ল রানা। ধীর পায়ে হেঁটে পিয়াযযা সান্টা মারিয়ায় চলে এল। মাথার মধ্যে চিন্তার ঝড়। ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে চলল ও। বিশ মিনিট পর হোটেলের সার্ভিস এন্ট্রান্সের খানিক দূরে ছেড়ে দিল ট্যাক্সি। চারদিকে নজর বুলিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। স্যুইটে ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। ভাবল,

কেউ কি টের পেয়েছে ব্যাপারটা? না বোধহয়।

কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠে পড়ল ও সাদেকের নোটবুক নিয়ে। কফির জন্যে ফোন করে ডুবে গেল ওটায়। একেবারে শেষদিকের কয়েকটা পাতায় ডি-ডে'র পাঁচ রথী সম্পর্কে আলাদা আলাদা নোটস রয়েছে দেখে আগ্রহী হয়ে উঠল রানা। কিন্তু দেখা গেল ওগুলো নতুন কিছু নয়। সাদেক এসব তথ্য ফ্যাক্সে জানিয়েছে ওকে।

যে সব আঁকিবুকির মধ্যে কিছু বার্তা আছে বলে মনে হলো, সেগুলো বড় দুর্বোধ্য ঠেকছে। তবু লেগে থাকল রানা। খানিকপর দরজায় মৃদু নকের আওয়াজ উঠতে নোটবুকটা সাঁৎ করে বালিশের তলায় গুঁজে ফেলল। 'কাম ইন!'

কফি নিয়ে এসেছে রুম সার্ভিস। রানাকে বিছানায় দেখে ট্রে বেডসাইড টেবিলের ওপর রেখে নীরবে চলে গেল সে। লোকটা বেরিয়ে যেতে সামনের দরজা ভেতর থেকে লক্ করে দিল ও। ফিরে এসে আবার লেগে পড়ল কাজে। এক পাতায় একটা ত্রিভুজ আঁকা দেখল ও। ত্রিভুজের তিন বাহুর বাইরের দিকে লেখা রয়েছে তিনটে নাম— লরেনযো কন্টি, হিউ মারস্ল্যান্ড এবং স্টাডস ম্যালোরি। ত্রিভুজের কেন্দ্রে বড় হাতের অক্ষরে লেখা 'L'। তার পাশে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

নিচে একটা অস্পষ্ট নোটেশন। দেখে মনে হয় CH হবে হয়তো। কি হতে পারে? ভাবল রানা, সুইটজারল্যান্ডের গাড়ির লাইসেন্স প্লেটে অক্ষর দুটো কমন। কিন্তু শব্দ দুটো সেই অর্থে লেখা হয়নি নিশ্চই এখানে। তাহলে কি? সুইস ওবেরল্যান্ডের আলপাইন পর্বতের চূড়া জুংফ্রাউ? সংক্ষেপে ওটাকে CH বলে উল্লেখ করা হয়।

ওটার পিছনে অনেকক্ষণ মাথা ঘামিয়েও কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল না দেখে পাশের পাতায় নজর দিল রানা। ওটায় আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা আছে বড় হাতের 'R'। তারপরই লেখা 'স্পাই?' আরেকখানে দুটো 'AA' লেখা। পাশে বড় এক বিস্ময়চিহ্ন। তার অন্য পাশে লেখা রয়েছে 'DL'।

বোঝা গেল না কিছুই। ওটা রেখে সিলিঙের দিকে অপলক তাকিয়ে শুয়ে থাকল মাসুদ রানা। এক সময় আপনাআপনি বুজে এল দু'চোখ। ঘুমিয়ে পড়ল ও।

দুই

সাতটায় দ্বিতীয় দফা শাওয়ার-শেভ করে কন্টির পার্টিতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে নিল রানা। নিজের টেক্সান পরিচয় ফুটিয়ে তোলার জন্যে পরল ব্লু জিনস্ ও জাঁকাল শার্ট। পায়ে দিল এলিগেটরের চামড়ার তৈরি হাফ বুট। রওনা

হওয়ার আগে কিনেছে এসব লন্ডন থেকে।

ঠিক সময়ে নিচতলার বিশাল মনযা রুমে এসে ঢুকল ও। চেহারায় কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা ড্যাম কেয়ার ভাব। প্রথমটা গ্যারি কার এ পরিবেশে সম্পূর্ণ নতুন বলে, দ্বিতীয়টা ও একজন তেল ব্যবসায়ী, প্রচুর টাকার মালিক বলে। যখন-তখন ডলারে আট অঙ্কের চেক যে ইস্যু করার ক্ষমতা রাখে, তার মধ্যে খানিকটা ড্যাম কেয়ার ভাব না থাকলে মানায় নাকি?

ভেতরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জটলা করছে কন্টির এক্‌জিকিউটিভরা, তাদের সহকারীরা। আর আছে প্রজাপতির মত রঙচঙে সাজে সেজে আসা একদল ডানা কাটা পরী। তাদের কলগুঞ্জনে গম গম করছে মনযা রুম। এক মেইটার ডি এগিয়ে এল রানার দিকে, সসম্ভ্রমে নড করে ব্যাঙ্কোয়েট টেবিলে বসার অনুরোধ জানাল। পাত্তা দিল না ও। প্রবেশপথের অনেকটা আগলে দাঁড়িয়ে থাকল। চেহারায় বিরক্তির আভাস।

দীর্ঘদেহী লালমুখো এক লোক এসে দাঁড়াল সামনে। লম্বায় যেমন, পাশেও তেমনি মানুষটা। ওজন চার মনের এক ছটাকও কম হবে না। মাথায় বড়সড় চকচকে টাক, নাকের নিচে দুই প্রান্ত খানিকটা করে ঝোলানো লাল গোঁফ। দেখতে ঠিক একজোড়া বাঁকানো হ্যান্ডেলবারের মত।

'গ্যারি কার?' রানাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়াল লোকটা। যোগ করল, 'আমি হিউ মারসল্যান্ড। আপনি আসায় সত্যি খুব খুশি হয়েছি। আমরা হলের ওই প্রান্তে বসেছি,' ভীমের গদার মত মোটা, মাংসল একটা হাত নাড়ল লোকটা অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশে। 'আসুন, বসি গিয়ে।'

হিউর হাত ছেড়ে দিল রানা। হাত নয়, যেন বাতাস ভরা চ্যাপ্টা বেলুন ধরে ছিল ও এতক্ষণ। ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল গায়ের মধ্যে। তবু মুখে জোর করে হাসির ভঙ্গি ফোটাল। 'শিওর। লেটস গো।'

হলের শেষ মাথায় বড় এক টেবিল ঘিরে বসে আছে লরেনযো কন্টি ও তার পার্টি। রানার সাথে তাদের একে একে পরিচয় করিয়ে দিল মারসল্যান্ড। পিয়েরো সিমকা বাদে ডি-ডে'র চার রথীই আছে এখানে। আর আছে ছবির মূল নায়ক, ব্রিটিশ অভিনেতা জন ট্রাভোল্টা ও ইটালিয়ান নায়িকা, তরুণ জেনারেশনের হার্ট থ্রব, লাস্যময়ী ক্যামিলা ক্যাভোর। মেয়েটিকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপ মনে হলো রানার।

সবার সাথে হাত মিলিয়ে কন্টির পাশের আসনে বসল ও। স্কচের অর্ডার দিয়ে সদ্য পরিচিতদের ওপর নজর বোলাতে লাগল। হেদায়েতুল ইসলাম বসেছে মুখোমুখি। তাকেই প্রথম মাপল ও। লোকটা খাটো। মাথা-মুখ প্রায় গোল। ঘাড় আছে বলে মনে হলো না। কাঁধের ওপর চেপে বসিয়ে দেয়া হয়েছে যেন মাঝারি আকারের ফুটবলের মত গোল মাথাটা। খুব সম্ভব '৭২ সালে দৈনিক বাংলায় শেষবার এর ছবি দেখেছে রানা। ক্যাপশন ছিল: একে ধরিয়ে দিন। বয়সের সাথে মাথার চুল কমেছে হেদায়েতুল ইসলামের, দুই গালে চর্বিও জমেছে বেশ। এছাড়া বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি।

স্কচে মৃদু সিপ করল ও, আরেকবার নজর বোলাল স্যার হিউ মারসল্যান্ডের ওপর। এর মুখও প্রায় গোল। হাসিখুশি, নিরীহ গোছের চেহারা সব মিলিয়ে। তবে চোখ দুটো অন্যরকম। একেবারে ঠাণ্ডা, অভিব্যক্তিহীন। স্টেইনলেস স্টীল-গ্রে রঙের একজোড়া মার্বেল। মুখের-গালের পেশীর সাথে যেন কোন সংশ্রব নেই ও দুটোর, যত প্রশস্তই হোক, ওই পর্যন্ত পৌঁছায় না হাসি। দেহের কাঠামো দানবীয়।

লরেনযো কন্টি ঠিক তার উল্টো। খাটো, বজড়োর পাঁচ ফুট চার হবে। হালকা-পাতলা গড়ন। চেহারা অভিজাত টাইপের। মাথায় ঘন, কুচকুচে কালো চুল। ক্লীন শেভড্। তামাটে মুখের ওপর খাড়া নাক। অভিজাত ইটালিয়ান ধাঁচে ছাঁটা গ্রে ল্যাভেন্ডার মোহায়ের স্যুট পরে আছে কন্টি। গায়ে ফ্যাকাসে সবুজ সিল্ক নিট টার্টেলনেক। বাঁ কব্জিতে সোনার রোলেক্স অয়েস্টার।

আমেরিকান প্রযোজক-পরিচালক স্টাডস ম্যালোরি হিউ মারসল্যান্ডের মত প্রকাণ্ডদেহী মানুষ। পরে আছে দামী পশমী টুইডের কমপ্লিট। কিন্তু তাতে বরং বাজে লাগছে তাকে দেখতে। ময়ূরের পেখমধারী দাঁড়কাকের মত দেখাচ্ছে। চেহারা ভীষণরকম আনইম্প্রেসিভ। মুখটা লম্বাটে, বাঁ গালে লম্বা একটা কাটা দাগ। হাসলে বাংলা পাঁচের মত হয়ে যায় চেহারা। চাউনি নিষ্প্রভ, হালকা নীল। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মালিক হয়েও ব্যাটা গালের বিচ্ছিরি দাগটা কেন প্লাস্টিক সার্জারি করে শুধরে নেয়নি, ভেবে পেল না মাসুদ রানা।

পিয়েরো সিমকা কোথায় জিজ্ঞেস করবে কি না ভাবল একবার, পরক্ষণে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। জন ট্রাভোল্টার দিকে তাকাল। সত্তর দশকের শেষদিকে যেমন এক লাফে খ্যাতির শিখরে উঠে বসেছিল, দুই হাজার সালের দোরগোড়ায় পৌঁছেও প্রায় সেখানেই বসে আছে মানুষটা। চওড়া কাঠামোর গাট্টাগোট্টা গড়ন। চৌকো মুখ। কথায়-আচরণে নিতান্ত ভদ্রলোক।

সবশেষে ক্যামিলা ক্যাভোরের ওপর চোখ বোলাল রানা। আকারে ছোটখাট। অপরূপা। তীক্ষ্ণ নাক, নীল আর সবুজের মাঝামাঝি চোখের রঙ। ঘন বাদামী চুল ঘাড়ের কাছে হলুদ ভেলভেট রিবন দিয়ে পনি টেইল করে বেঁধেছে। পরনের হালকা নীল জার্সি ড্রেসে অদ্ভুতরকম কমনীয় লাগছে দেখতে। চোখাচোখি হলো ওর ক্যামিলার সাথে। মৃদু হাসি দিল হার্ট থ্রব, জবাবে রানাও হাসল ঠোঁট টিপে।

ও ভেবেছিল অল্প সময়ের মধ্যে হল ভরে যাবে, কিন্তু তা হলো না। অতিথিদের সংখ্যা একই থাকল। হঠাৎ সন্দেহ জাগল রানার মনে, পার্টির আয়োজন কি কন্টি সত্যিই আগে করেছিল, না হঠাৎ? পরিকল্পনা আগের হলে আর অতিথি কই? উপস্থিত মাথার সংখ্যা অনুমান করার চেষ্টা করল রানা। চল্লিশ কি বড়জোর পঁয়তাল্লিশ, এর বেশি কিছুতেই হবে না। মানাচ্ছে না।

পালা করে ডি-ডে'র চার রথীকে দেখল ক্যামিলা। চাউনিতে ধৈর্যচ্যুতির আভাস। 'ব্যাপার কি, কন্টি? সিমকা কখন আসবে?'

'এই তো, এসে পড়বে এখনই,' জবাব দিল লোকটা।

'সে না হয় নেই, তোমরাও কি নেই নাকি?'

'মানে?'

'নতুন এক ভদ্রলোককে পাশে বসিয়ে সবাই মুখে তালা মেরে আছ, এ কেমন কথা?' ঝাঁঝ ফুটল মেয়েটির বলার ঢঙে।

'না, মানে···'

'মানে আবার কি? সেনিয়র কারের টাকা না হয় না-ই নিলে, তার সাথে দুটো কথা অন্তত বলো!'

কন্টি আর হিউ মনে হলো সত্যি সত্যি লজ্জা পেয়েছে। 'সত্যি,' বলে উঠল হিউ মারসল্যান্ড। 'বড় অন্যায় হয়ে গেছে, মিস্টার কার। মানে···'

'আমি কিছু মনে করিনি,' বলল রানা। 'আসলে এখানকার পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে ব্যাপারটা খেয়ালই করিনি।'

প্রথমে রানা, পরে মারসল্যান্ডের দিকে তাকাল স্টাডস ম্যালোরি। কয়েকবার পিটপিট্ করে উঠল তার চোখ। 'টাকার বিষয়টা কি?'

টাক মাথা দোলাল স্যার হিউ। 'মিস্টার গ্যারি আমাদের ছবিতে পুঁজি খাটাতে চাইছেন। আমাদের দু'জনের,' মাথা দুলিয়ে কন্টিকে দেখাল সে। 'খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু পাঠিয়েছেন একে আমাদের কাছে।'

'আই সী!' আনমনে গালের কাটা দাগটা চুলকাল প্রযোজক-পরিচালক। 'কিন্তু আমাদের ফান্ড তো বোধহয় অ্যারেঞ্জ হয়ে গেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল লরেনযো কন্টি। 'বাজেটের চেয়ে এক মিলিয়ন বেশিই হয়ে গেছে বরং। দেরি আর মানি ইনফ্লেশনের কথা ভেবে এই বাড়তি টাকাটা জোগাড় করা হয়েছে।'

'আমার দুর্ভাগ্য,' বলল রানা। 'এত নামকরা এক ছবিতে সুযোগ পেলে আমার শেষ ডলারটিও বিনিয়োগ করতাম আমি খুশি মনে। কিন্তু কি আর করা! ভাগ্যে নেই।'

নড়েচড়ে বসল ক্যামিলা। 'ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে গেল, কন্টি,' মাথা দোলাল দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গিতে। 'সেনিয়র কার আমাদের সাথে থাকার সুযোগ পেলে খুশি হতাম আমি। এইমাত্র ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় হলো আমার, তোমরাই করিয়ে দিলে, আবার এখন তোমরাই বেচারীকে ভাগিয়ে দিতে চাইছ, মনটা খারাপ হয়ে গেল। তোমরা জানো নিশ্চই আমার মন খারাপ থাকলে অভিনয়ের মূড ভাল আসে না। তা যদি আবার বেশি খারাপ হয়,' থেমে কাঁধ শ্রাগ করল সে, ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি। 'তাহলে তো বোঝোই। ডিলে, রিটেক, ডাক্তার, ইঞ্জেকশন, আরও কত কি!'

'ধন্যবাদ, মিস ক্যাভোর,' বলল রানা।

'শুধু ক্যামিলা, প্লীজ,' হাসি মুখে গ্রীবা দোলাল সে।

'কিন্তু, ক্যামিলা, মাই ডার্লিং,' প্রতিবাদের সুরে বলে উঠল স্টাডস ম্যালোরি। 'তুমি তো জানো বাড়তি···'

'বুঝেছি,' ফোঁস করে কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি। 'মন সত্যি খারাপ হয়ে যাবে এবার আমার। হয়তো দীর্ঘ সময়ের জন্যে, কে জানে!'

সশব্দে হেসে উঠল জন ট্রাভোল্টা। মাথা ঝাঁকাল রানার উদ্দেশে। 'আপনার সৌভাগ্যকে রীতিমত হিংসে হচ্ছে আমার, মিস্টার কার।'

ঠোঁট টিপে হাসল ও। 'এত সৌভাগ্য আমার, আমারই বিশ্বাস হয় না।'

'ক্যামিলা ডার্লিং,' বলল কন্টি। 'অপরিণতদের মত এখনই অসুস্থ হয়ে পোড়ো না যেন দয়া করে। আমি এখনও ফাইন্যাল মত জানাইনি এ ব্যাপারে। সেনিয়র কারকে অ্যাকোমোডেট করা কঠিন, কিন্তু একেবারে অসম্ভব এমন কথা তো বলিনি আমি। তাছাড়া টাকা সব জোগাড় হয়নি এখনও। যা হয়েছে, মুখে মুখে হয়েছে। সিমকা আসুক, আলাপ করি ওর সাথে, তারপর দেখা যাবে। তুমি জানো এ ছবির অর্ধেক ফান্ড ও জোগাচ্ছে। ওর সুইস ব্যাঙ্ক কবে নাগাদ···'

লোকটার বাকি কথা শোনা হলো না রানার। সুইস ব্যাঙ্ক কথাটা কানে যাওয়ামাত্র অন্য চিন্তা মাথায় ঢুকে অন্যমনস্ক করে তুলেছে ওকে। CH বলতে কি সুইস ব্যাঙ্কের কথা···তাহলে 'L' কি? কন্টির হাঁক শুনে সচকিত হলো ও।

'কে জানে কখন আসবে!' বলল সে কারও প্রশ্নের জবাবে। 'সিমকার কোন কাজের হাতামাথা পাই না আমি। দেখো গিয়ে হয়তো সিনেটে তাস পেটাচ্ছে মন্ত্রীদের সাথে। নয়ত নিজের সুবিধের জন্যে নতুন আইন তৈরির খসড়া প্রস্তাব গেলাচ্ছে তাদের।'

'অথবা আইন ভাঙার আইন তৈরির খসড়া,' মন্তব্য করল ক্যামিলা। 'দেশের মন্ত্রীরা তো সিমকার কথাতেই ওঠে-বসে। যে আইনের খসড়াই···'

'নাউ, নাউ,' পিতৃসুলভ ভঙ্গিতে তার পিঠ চাপড়ে দিল স্যার হিউ। 'এসব শুনলে আমাদের সম্পর্কে মিস্টার গ্যারির ভুল ধারণা জন্মাতে পারে, ডার্লিং।'

ক্রমে আরও এক ঘণ্টা কাটল, পাত্তা নেই পিয়েরো সিমকার। অবশেষে ধৈর্য হারাল কন্টি। ডিনারের জন্যে এয়ারপোর্টের কাছে এক কান্ট্রিসাইড রেস্টুরেন্ট বুক করেছে সে, তথ্যটা জানাল রানাকে। 'আর খিদে সহ্য করতে পারছি না। সিমকার দেখা নেই। আমরা যাই চলুন। রেস্টুরেন্টের কাছেই আমাদের ওয়্যারহাউস। খাওয়া শেষে ওখানে ঢুঁ মেরে আসা যাবে। ছবির জন্যে কি ধরনের যন্ত্রপাতি জোগাড় করেছি আমরা দেখে আসবেন।'

এক কথায় রাজি হয়ে গেল ও। পার্টির সমাপ্তি ঘোষণা করল লরেনযো কন্টি, অতিথিদের হোটেলের পোর্চে অপেক্ষমাণ গাড়িতে ওঠার অনুরোধ জানাল। ওখানে এক সারিতে ছয়টা দীর্ঘ লিমুজিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। হোটেলের সামনের স্পেস প্রায় পুরোটাই দখল করে রেখেছে ওগুলো। প্রথমটার পিছনের সীটে উঠল রানা, ক্যামিলা ও জন ট্রাভোল্টা। কন্টি ও স্যার হিউ ওদের মুখোমুখি জাম্প সীটে বসল। স্টাডস ম্যালোরি শোফারের পাশে।

ওদের পিছন পিছন অন্য পাঁচ লিমুজিনও বেরিয়ে এল অতিথিদের নিয়ে। ফিউমিসিনোর দিকে ছুটে চলল শোভাযাত্রা। ঝাড়া পঁচিশ মিনিট পর পৌঁছল

ওরা জায়গামত। রাজকীয় খানাপিনার শেষ পর্যায়ে রেস্টুরেন্টের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো ম্যানেজারকে তটস্থ হয়ে উঠতে দেখল রানা। কাকে যেন ঘন ঘন বাউ করছে লোকটা। পিছিয়ে আসছে এক পা এক পা করে।

'সিমকা,' ওকে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসল লরেনযো কন্টি। 'আমাদের লিটল মাস্টার।'

প্রায় সাথে সাথে ভেতরে এসে দাঁড়াল পিয়েরো সিমকা। তাকে দেখে এতই তাজ্জব হয়ে গেল রানা যে কয়েক মুহূর্তের জন্যে মুখ নাড়া বন্ধই হয়ে গেল। লোকটা বামুন, তা ও জানত। কিন্তু তাই বলে এই সাইজ? পায়ে চার আঙুল উঁচু হিলের জুতো পরা অবস্থায়ও খুব বেশি হলে চার ফুট হবে সে। হাতে হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা দামী ছড়ি, ষোলো ইঞ্চির এক চুল বড় হবে না সেটা। এত খাটো পূর্ণ বয়স্ক মানুষ সম্ভবত জীবনে এই প্রথম দেখল মাসুদ রানা।

পুতুলের মত হাত-পা তার। মাথায় ছোট করে ছাঁটা লালচে চুল। কমপ্লিট স্যুট পরে আছে। সসম্মানে ওদের টেবিলে নিয়ে এল তাকে ম্যানেজার। ততক্ষণে এক চেয়ারে দুটো পুরু কুশনের সাহায্যে আসন তৈরি করা হয়েছে তার জন্যে। অন্যদের দেখাদেখি রানাও খাওয়া ছেড়ে উঠল লোকটার সাথে হাত মেলাবার জন্যে।

'আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে খুশি হলাম, সেনিয়র গ্যারি,' পিচ্চি হাতে ওর হাত ঝাঁকিয়ে বলল সিমকা। 'বসুন, প্লীজ। সবাই বসুন, খাওয়া উপভোগ করুন।'

চমৎকার ইংরেজি বলে লোকটা, একদম সাবলীল। তবে শিক্ষিত ইটালিয়ানদের শতকরা নিরানব্বইজনের ইংরেজি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টেড হলেও এ লোকের অ্যাকসেন্ট আমেরিকান। আকার-গঠন যাই হোক, মানুষটার চারপাশের বলয়ে যে অত্যন্ত অশুভ কিছু একটা আছে, টের পেতে দেরি হলো না ওর।

তার খুদে দেহের ভেতরেও আছে অশুভ কিছু। অবাক হয়ে লক্ষ করল রানা, প্রায় ওদের সমানই খেল সে। হাসল ও মনে মনে। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি আর কাকে বলে? ওইটুকুন পেটের ভেতরে কোথায় যায় এত খাবার?

এক সময় খানাপিনা শেষ হলো। সাধারণ এটা-ওটা নিয়ে রানার সাথে আলাপ শুরু করল সিমকা। খানিক পর মোড় ঘুরিয়ে দিল, ওর টাকা-পয়সা কি পরিমাণ আছে, তা নিয়ে অনুসন্ধানী জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। অন্যরা নীরবে শুনছে।

'কিন্তু আপনাদের ব্যাঙ্কিং সিস্টেম আমার পছন্দ নয়, সেনিয়র কার,' রানার কথার পিঠে বলে উঠল কন্টি। 'বড়সড় অঙ্ক ট্র্যান্সফার করা ভীষণ কষ্টকর।'

'ঠিক,' মাথা দুলিয়ে সায় দিল ও। 'এই জন্যেই সবসময় এক্সট্রা বিশ-পঁচিশ মিলিয়ন ডলার অন্য দেশে মজুত রাখি আমি।'

'তাই?' ঝুঁকে এল পিয়েরো সিমকা। 'কোন দেশে?'

'নাসাউ।'

'হুঁম!' বলল স্যার হিউ মারসল্যান্ড। 'ওদের সিস্টেম সত্যি ভাল। অঙ্ক যত বড়ই হোক, কুইক উইথড্রলে কোন সমস্যা হয় না। ভেরি সেনসিবল অ্যারেঞ্জমেন্ট।'

'আমি কিন্তু স্লো উইথড্রল পছন্দ করি, গ্যারি,' ওর কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল ক্যামিলা ক্যাভোর। মুখে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি।

'আমিও ওখানে টাকা রাখি,' বলে উঠল স্টাডস ম্যালোরি। 'নিজের দেশে জমা রেখে অনেক ভুগেছি।'

'আমার দেশেও একই অবস্থা,' মন্তব্য করল হিউ।

আনমনে মাথা ঝাঁকাল সিমকা। 'আপনি তাহলে ইনভেস্ট করতে চান উ-ডে'তে?'

'হ্যাঁ,' ওর হয়ে জবাব দিল ক্যামিলা। 'দেখো, এঁকে টীমে না নিলে আমি কিন্তু মনে খুব কষ্ট পাব, পিয়েরো।'

হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'তোমাকে কষ্ট দেব আমি? পাগল নাকি? তোমার মত সুন্দরীর মন দখলে রাখতে যে কেউ পাহাড় সরাতেও পিছ পা হবে না। কিন্তু আমার যে সাইজ, ও কাজ তো সম্ভব হবে না আমাকে দিয়ে। তাই ভাবছি, উঁম! রাখো, আরেকটু ভাবতে দাও।'

সত্যি সত্যি চোখ বুজে ভাবতে বসল পিয়েরো সিমকা। নারকেল সাইজের মাথাটা ডানে-বাঁয়ে, ওপরে-নিচে করছে। দু'মিনিট পর চোখ মেলল সে। 'গোল্লায় যাক আর্জেন্টাইন শালা!'

'তার মানে?' জানতে চাইল মেয়েটি।

'শব্দ করে ভাবছিলাম। বুয়েনস আইরেসের এক পয়সাওয়ালা গর্দভকে পাঁচ মিলিয়ন বিনিয়োগের সুযোগ দেয়ার কথা ছিল না, কন্টি?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল সে।

'চুক্তিপত্রে সই হওয়া বাকি আছে, কেমন?'

'হ্যাঁ। দু'দিন পর সই হওয়ার কথা।'

'ও ব্যাটা বাদ। ওর জায়গায় সেনিয়র গ্যারিকে নেব আমরা।'

'নাউ, নাউ,' আহাম্মকের দৃষ্টিতে কন্টির দিকে তাকিয়ে থাকল স্যার হিউ। 'কথাটা একবারও আমাদের কারও মাথায় এল না কেন, কন্টি?' আর্তনাদ করে উঠল সে। 'ঠক্' করে গাঁট্টা মেরে বসল নিজের মাথায়। 'ইস্!'

চেহারায় সন্তুষ্টি ফোটাল রানা। 'আপনি বলছেন, কাজটা সম্ভব হবে? মানে···'

'হবে মানে?' ভুরু নাচাল বামুন। 'হয়ে গেছে অলরেডি।' ডানহাত বাড়াল সে। 'কামন, শেক অন ইট।'

হাত মেলাল ও। 'ধন্যবাদ।'

'খুশি?' ক্যামিলার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল সিমকা। 'ডিয়ার কন্টি, চুক্তি-টুক্তি কাল বা পরশু হবে, কি বলো? আজ আর ওসব নয়। আজকের

রাতটা আমরা শুধুই উপভোগ করব, রাইট?'

'রাইট।'

'রাইট হো!' বিস্ফোরিত হলো স্যার হিউ।

মুখ রানার কানের কাছে এগিয়ে আনল ক্যামিলা ক্যাভোর। 'তোমাকে দলে পেয়ে আমি খুব খুশি, বেবি ডল।'

হেদায়েতুল ইসলামকে দেখল রানা। চুপ করে বসে আছে টেবিলের এক মাথায়। কি যেন ভাবছে। অন্যদেরকেও দেখল এক এক করে। এদের মধ্যে কার নির্দেশে হত্যা করা হয়েছে সাদেককে, ভাবছে।

একটু পর উঠে পড়ল সবাই, রওনা হলো কন্টির ওয়্যারহাউসের উদ্দেশে। অন্ধকার গাড়িতে রানার গায়ের সাথে সেঁটে বসে থাকল ক্যামিলা। নাকে তার গায়ের মিষ্টি সুবাস পেল ও। 'এত করলাম তোমার জন্যে,' বলল ক্যামিলা চাপা গলায়। 'অথচ একটা ধন্যবাদও জানালে না তুমি, গ্যারি।'

তার হাতে মৃদু চাপ দিল ও। 'আমি শুকনো ধন্যবাদে বিশ্বাসী নই, ক্যামিলা, তাই জানাইনি। অপেক্ষা করো। সময়মত জানাব।'

'আচ্ছা,' আরও নিবিড় হয়ে এল মেয়েটি। এক হাত রাখল ওর উরুর ওপর।

মনটা অন্যদিকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করল রানা। রাত হয়ে গেছে বেশ। আজ আর দেখা করা সম্ভব নয় সাদেকের বান্ধবীর সাথে। ডিনার এড়ানো গেলে করা যেত, কিন্তু ইচ্ছে করেই ও তা করেনি। এদের সবার সাথে পরিচিত হওয়া জরুরী ছিল।

সাদেকের মৃতদেহ মর্গ থেকে ছাড় করা হয়েছে কি না ভাবল ও। দেশে পাঠাতে হবে ওটা। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। কান্ট্রিসাইড হাইওয়ে ধরে হাঁ-হাঁ করে ছুটে চলেছে লিমুজিন। বাইরে অন্ধকার। দূরে গাছপালার আউটলাইন দেখা যায় আবছাভাবে।

সেদিকে তাকিয়ে আছে ও আনমনে। সাদেকের কথা ভাবছে। তার নোটবুকটার কথা ভাবছে।

এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে আরও খানিকটা গিয়ে ডানে ঘুরল গাড়ির বহর। এক প্রাইভেট রোডে পড়ল। তিন মিনিট পর গতি কমে এল চলার। সামনে তাকিয়ে উঁচু তারকাঁটার ফেন্স ঘেরা বিশাল এক কমপ্লেক্স দেখতে পেল রানা।

প্রায় তিন মানুষ সমান উঁচু হবে ফেন্স। ভেতরদিকে বিশ-পঁচিশ গজ পরপর বৈদ্যুতিক পোল, আলো জ্বলছে প্রতিটিতে। আরও ভেতরে অনেকখানি জায়গা নিয়ে দৈত্যাকার তিনটে ওয়্যারহাউস। ওগুলোর প্রবেশ পথেও আলো জ্বলছে। প্রশস্ত এক গেটের সামনে থেমে পড়ল ওদের লিমো। গেটের দুই দিকে দুই গার্ড পোস্ট। ডানদিকেরটার পিছনে, গজ পঁচিশেক তফাতে বড়সড় প্রিন্সিপল গার্ড স্টেশন। ঝলমল করছে আলোয়।

ভেতরে এক আর্মি অফিসারকে দেখা গেল ফোনে কথা বলছে। গেটের দুই পাথরমুখো গার্ড এগিয়ে এল, হাতে কারবাইন প্রস্তুত। ঝুঁকে ভেতরে নজর

বোলাল তারা। পিয়েরো সিমকার ওপর নজর পড়তে মুখের পাথর সরে গেল লোক দুটোর, শ্রদ্ধা আর বিনয় ফুটল সেখানে।

ততক্ষণে অফিসারও বেরিয়ে এসেছে স্টেশন থেকে। জোর পায়ে ওদের গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল সে। ভেতরে দেখল। পরক্ষণে মহাব্যস্ত হয়ে উঠল, গেট খুলতে দেরি করে ফেলায় ধমকধামক মারতে শুরু করে দিল গার্ডদের। দৌড়ে গিয়ে একজন খুলে দিল গেট। অফিসারের উদ্দেশে ছোট্ট করে নড করল পিয়েরো সিমকা। কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়ল গাড়ির বহর। মাঝখানের ওয়্যারহাউসের সামনে মৃদু দোল খেয়ে থামল।

'আসুন,' বলে উঠল সিমকা। 'নামা যাক। লরেনযো কন্টির বিমান ভাণ্ডার দেখে আসি।'

কাছেই কোথাও কুকুরের পিলে চমকানো হাঁক শুনে ঘুরে তাকাল রানা। ফেন্সের কাছে হাঁটাহাঁটি করছে এক সশস্ত্র গার্ড, তার বাঁ হাতে ধরা শেকলে বাঁধা রয়েছে প্রকাণ্ড এক কুকুর। এতক্ষণ মুক্ত ছিল, অতিথিদের দেখে আটকে দিয়েছে গার্ড, পছন্দ হয়নি। আরও কয়েকটা হাঁক ছাড়ল ওটা। চাপা ধমক লাগাল গার্ড।

প্রায় নিঃশব্দে দু'দিকে সরে যেতে শুরু করল ওয়্যারহাউসের দুই পাল্লার গেট। দুই আর্মি গার্ড ঠেলে সরাচ্ছে। ভেতরে অনেক উঁচুতে তারের মাথায় ঝুলছে বেশ কিছু শক্তিশালী বাল্‌ব। সে আলোয় যা দেখল রানা, বিশ্বাস করতে চাইল না মন।

ভেতরের অর্ধেকেরও বেশি ফ্লোর জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে অজস্র ঝকঝকে ফাইটার, বম্বার। ডি-ন্ড্রে'র এয়ার ফোর্সের একাংশ। ডামি নয়, একদম আসল জিনিস। চারটে বি-ফিফটি টু-র ওপর চোখ পড়ল রানার, এক কোণে গ্রীবা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে একেবারে লেটেস্ট মডেলের ছয়টা হুক বিমান, ওগুলোর পিছনে দুটো টর্নেডো ও ছয়টা লিনক্স কপ্টার। সবগুলো ব্রিটিশ এবং একেবারে লেটেস্ট। কয়েকটা ফ্যান্টম জেট ফাইটার ও স্যাবর জেটও দেখা গেল পিছন দিকে।

মাথা ঝুঁকিয়ে নাটুকে ভঙ্গিতে সবাইকে ভেতরে যাওয়ার আহ্বান জানাল নাটকু সিমকা। 'আমাদের ফ্যান্টাসির রাজ্যে স্বাগতম।'

সামনের দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল অতিথিদের। চেহারা দেখে মনে হয় বুঝি নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে মানুষগুলো। হাঁ করে তাকিয়ে আছে সামনে। 'কেমন দেখছেন, সেনিয়র?' রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল লরেনযো কন্টি।

জবাব দিল না ও, হাসির ভঙ্গি করে মাথা ঝাঁকাল। আরেকদিকে সার দিয়ে রাখা বেশ কিছু আমেরিকান ফাইটার-বম্বারের দিকে তাকাল। রাশিয়ানও আছে কিছু। আজব ব্যাপার যে প্রায় সবগুলোই লেটেস্ট মডেলের। মার্কিন বিমানগুলোর মধ্যে দুটোকে এর আগে কখনও দেখেনি রানা। এমনকি ছবি পর্যন্ত না। কেউ না বললেও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ওগুলোর কোন কোনটা ক্লাসিফায়েড তালিকায় রয়েছে এখনও। অস্বস্তি লেগে উঠল ওর।

একে একে সিমকা, কন্টি, হিউ, ম্যালোরি ও হেদায়েতুল ইসলামকে দেখল রানা। প্রথম তিনজনের চেহারা ঝলমল করছে খুশিতে। অতিথিদের ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে তারা বিমান-কন্টার। ভেতরে টগবগ করে ফুটছে যেন। সবচেয়ে বেশি খুশি মনে হচ্ছে পিয়েরো সিমকাকে। হাঁটছে না লোকটা, ছাগলের বাচ্চার মত লাফাচ্ছে। ম্যালোরি ও হেদায়েত একটু তফাতে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে কিছু।

'কি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড!' রানার পাশ থেকে বলে উঠল ক্যামিলা ক্যাভোর। 'এত কিছু!'

রানা কিছু বলার আগেই ঘুরে দাঁড়াল সিমকা। মন্তব্যটা কানে গেছে তার। ছড়ি দোলাতে দোলাতে প্রায় ছুটে এল লোকটা। 'ইয়েস, ডার্লিং! সাঙ্ঘাতিক কাণ্ডই বলতে পারো। কেমন দেখছেন, সেনিয়র?' রানাকে প্রশ্ন করল।

'এক কথায় অবিশ্বাস্য!' বলল ও। 'আই অ্যাম ইমপ্রেস্ড্।'

সন্তুষ্টি ফুটল লোকটার মুখে। 'এসব জোগাড় করতে কাঠখড় কম পোড়াতে হয়নি আমাদের। প্রচুর খাটতে হয়েছে।'

'খুব স্বাভাবিক।'

'কল্পনা করুন, এর কোন একটা আচমকা উদয় হলো ওয়াশিংটন ডি.সি'র আকাশে, গায়ে রুশ মার্কিংসহ,' মাথা দোলাল মানুষটা। 'একই সময় আরেকটা মার্কিন সাইনওয়ালা প্লেন হাজির হলো গিয়ে মস্কো অথবা সেইন্ট পিটার্সবার্গের ওপর। কেমন হবে?'

'অথবা ব্রিটিশ মার্কিংসহ একটা বেইজিঙের আকাশে?' পাশ থেকে বলে উঠল স্যার হিউ মারসল্যান্ড। 'চিন্তা করুন, কি ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া ঘটাবে এই তিন ঘটনা। এরপর কত দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাবে সভ্যতা, ভাবুন একবার।'

'এটাই আমাদর ডি-ডে'র কাহিনী,' বলল সিমকা। 'আমরা দেখাব যুদ্ধের ছবি কাকে বলে। ডি-ডে'র কাছে আর সমস্ত যুদ্ধের ছবিকে মনে হবে বুঝি শার্লি টেম্পলের কমেডি।'

'মেসেজ পিকচার,' মন্তব্য করল ক্যামিলা। রানার দিকে তাকাল। 'কাহিনীটা হোটেলে ফিরে শোনাব তোমাকে।'

আচমকা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল স্যার হিউ। দুই কোমরে হাত রেখে মুখ ওপরমুখো হাসছে দানব, পিঠ বাঁকা হয়ে আছে। ভুঁড়ি দুলছে প্রবলবেগে। তার ভরাট, প্রাণখোলা হাসি বিশাল ওয়্যারহাউসে বিকট প্রতিধ্বনি তুলছে। এক সময় থামল সে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখের কোণে জমে ওঠা পানি মুছল। 'হ্যাঁ, মেসেজ পিকচার। সভ্যতার চিহ্নহীন মৃত বিশ্বের প্রতি।'

'ও আসলে বলতে চাইছে,' দ্রুত বলে উঠল সিমকা। 'মেসেজ মুভিই, তবে বিশেষ এক মেসেজ। নানান সমস্যায় জর্জরিত বর্তমান বিশ্ব যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা সামাল দিতে পারবে না, সেটাই ডি-ডে'র মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করব আমরা। আসল কথা ডিসআর্মামেন্টের কথা নতুন করে ভাবতে বাধ্য করব আমরা সব দেশকে। ইউ নো, ছোট ছোট দেশগুলোও আজ এমন

সব মারাত্মক অস্ত্র মজুত করেছে, যা দিয়ে যে কোন মুহূর্তে যা-তা ঘটিয়ে দেয়া সম্ভব।'

'ফিল্‌ম্ কোম্পানির হাতেও তো প্রচুর মজুত আছে দেখছি,' হেসে মন্তব্য করল রানা।

'তা বটে। কিন্তু মজুত না করে উপায় কি? ছবির কিছু কিছু দৃশ্যে যাতে বাস্তবতার ছোঁয়া থাকে, সে জন্যে এসব হার্ডওয়্যার জোগাড় করতে হয়েছে আমাদের, বুঝলেন? কিছু ক্লোজ শটের কাজে প্রয়োজন হবে এসব, যেমন টেক অফ, ল্যান্ডিঙ ইত্যাদি। বাকি দৃশ্য নেয়া হবে মিনিয়েচার, খেলনার সাহায্যে। খেলনা শহর, মানুষ, সমরাস্ত্র, এইসব আর কি! তবে ডি-ডে'র সবকিছুই যে একেবারে জীবন্ত হবে, সে ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি আমি, সেনিয়র কার। কম্পিউটরের সাহায্যে সম্ভব করে তোলা হবে সে সব।'

হাত তুলে হেদায়েতুল ইসলামকে দেখাল সিমকা। 'সে কাজে আমাদের সাহায্য করবে এই মানুষটি। আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু, ইজল্যাম (ইসলাম)। একে আপনি কম্পিউটরের জাদুকরও বলতে পারেন।'

'আই সী!'

'ধরুন নিউ ইয়র্ক, মস্কো বা লন্ডন, আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ করে এর যে কোন একটিকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া, অথবা কোন দেশের পারমাণবিক অস্ত্র ভাণ্ডার উড়িয়ে দেয়া, সবই করতে সক্ষম আমাদের এই বন্ধুটি। শুধু প্রোগ্রাম ফীড-ইন কন্ট্রোলে ইনসার্ট করতে হবে, ব্যস্।'

দু'পা এগিয়ে এল ম্যালোরি। 'অর্থাৎ পরিচালক না হলেও কাজ চলবে তোমাদের, তাই বলতে চাইছ, সিমকা?' কৃত্রিম হতাশা ফোটাল চেহারায়। 'তাহলে বোধহয় দেশে ফিরে যাওয়াই ভাল আমার।'

'না হে,' মাথা দোলাল স্যার হিউ। 'এ কাজে তোমাকেই সবচে' আগে প্রয়োজন আমাদের। ভুলে যেয়ো না, কম্পিউটরের ডাটা ফার্নিশ করার কাজটা তোমার। ওটা আগে, এবং সে জন্যে তোমার মত মাস্টারমাইন্ড প্রোগ্রামার প্রয়োজন।'

'যাক্,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ম্যালোরি। 'এখনই তাহলে প্লেন-ভাড়া জোগাড়ের কথা ভাবতে হবে না আমাকে। খুশি হলাম শুনে।'

খুক্ করে কেশে উঠল ক্যামিলা। 'এবার ফেরা উচিত আমাদের।' পরনের পাতলা ড্রেসটা দেখাল। 'শীত করছে আমার। রাতও হয়েছে অনেক।'

'ঠিক বলেছ, মাই ডিয়ার,' বলল সিমকা। 'আমার বুড়ো হাড়েও ঠাণ্ডা লাগছে। তুমি বরং সেনিয়র গ্যারির কাছাকাছি থাকো। আফটার অল ইয়াংম্যান, খানিকটা উষ্ণতা দিতে পারবেন তোমাকে।'

ফিরতি পথ ধরল ওরা। সিমকার পরামর্শ অনুযায়ীই হবে হয়তো, সারাপথ রানার গায়ের সাথে লেপ্‌টে থাকল ক্যামিলা। হোটেলে ফিরে পিছু নিয়েছিল ওর স্যুইটে যাওয়ার জন্যে, কিন্তু মাথা ব্যথার কথা বলে কাটিয়ে দিল রানা।

বেডরুমে চলে এল। সাড়ে বারোটা বাজে।

সাদেকের বান্ধবীর সাথে দেখা করতে যেতে হবে। রাত আরও গভীর হোক। ইউনিটের সবাই ঘুমাক, তারপর বের হবে। বালিশের তলায় রেখে যাওয়া ব্রীফকেসটা বের করল রানা। এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা ধরা পড়ল চোখে। ডালার বাঁ দিকে নেই জিনিসটা। একটা চুল গুঁজে রেখে গিয়েছিল ও, এখন নেই। তার মানে কেউ এসেছিল এ ঘরে!

দ্রুত স্যুইট চেক করল রানা। বাথরুম চেক করল। তারপর আবার বসল কেসটা নিয়ে। ভেতরের সব ঠিকই আছে দেখা গেল, খোয়া যায়নি কিছু। লোকটা যে-ই হয়ে থাকুক, এসব কাজে তেমন এক্সপার্ট নয়। কারণ নিচের ফলস্ বটম চোখ এড়িয়ে গেছে তার। ভেতরের কাগজপত্র ইত্যাদি চেক করে নিশ্চিত হলো ও, ঠিকই আছে। কারও হাত পড়েনি এখানে।

কিন্তু··· কে এসেছিল? কেন? ওর পরিচয় কি ফাঁস হয়ে গেছে? কি ভেবে সুটকেসটা খুলল রানা। হ্যাঁ, এটাও খোলা হয়েছে। হঠাৎ অন্য একটা কথা মনে হতে ফের উঠল ও, কাজে লেগে পড়ল। এবারও সত্যি হলো অনুমান। লিভিংরুমের সেন্টার টেবিলের তলায় এবং বেডরুমে খাটের গদিমোড়া হেডবোর্ডে গুঁজে রাখা দুটো খুবই শক্তিশালী স্পাইক-ট্রান্সমিটার পাওয়া গেল।

স্পর্শ করল না ও জিনিস দুটো। থাকুক যেখানে আছে। দেখা যাক, পানি কতদূর গড়ায়।

তিন

ঠিক দুটোয় করিডরে উঁকি দিল মাসুদ রানা। ফাঁকা। বেরিয়ে এল সন্তর্পণে, জোর পায়ে পিছনের ফায়ার এস্কেপের দিকে চলল। পাঁচ মিনিট পর হোটেলের পিছনের এক সেকেন্ডারি রোডে দেখা গেল ওকে, দ্রুত পা চালাচ্ছে। বড় রাস্তায় উঠে ট্যাক্সির আশায় ঝাড়া পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। ড্রাইভারকে নির্দিষ্ট ঠিকানার চার ব্লক দূরের ঠিকানায় যেতে বলে উঠল ও।

জায়গায় পৌঁছে ভাড়ার সাথে মোটা টিপস্ দিল। ঢুকে পড়ল একটা গলিতে। ভেতরে গুনে গুনে একশো কদম এগোল রানা, অ্যাবাউট টার্ন করল, ফিরে এল জায়গায়। বেশ দূরে চলে গেছে তখন ট্যাক্সি। সামনে-পিছনে তাকাল, তারপর নিশ্চিন্তে এগোল চার ব্লক পিছনের আসল গন্তব্যের উদ্দেশে। পথে দু'বার দাঁড়াল, সিগারেট ধরাবার ছলে মাথা কাৎ করে দেখে নিল পিছনদিক। নেই কেউ তেমন সন্দেহজনক।

পায়ে হাঁটা মানুষ প্রায় নেই-ই। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে চওড়া ফুটপাথের সাথের সিঁড়ি বেয়ে আট ধাপ উঠল মাসুদ রানা। বন্ধ দরজায় প্রথমে দ্রুত তিনবার, তারপর থেমে থেমে তিনবার নক করল। খুলে গেল দরজা।

পাঁচ মিনিট পর। বড়সড় এক অফিসরুমে বসে আছে রানা। হিরণ বসেছে ওর মুখোমুখি। বিসিআইয়ের রোম শাখা অফিস এটা। রানার হাতে দীর্ঘ এক ফ্যাক্স মেসেজ তুলে দিল যুবক। 'আজই এসেছে এটা ঢাকা থেকে।'

'কখন?' বলল ও।

'সন্ধের পর।'

ভাঁজ খুলে মসৃণ কাগজটা চোখের সামনে ধরল রানা। এক পলক নজর বুলিয়েই বুঝল, সাদেক মৃত্যুর আগে যেরকম বার্তা পাঠিয়েছিল ওকে লন্ডনে, এটাও অনেকটা সেরকমই। তবে আরও বিস্তারিত। ভাঁজ করে ওটা পকেটে ভরল রানা। 'ছোট একটা "বাগ" ডিটেক্টর চাই আমার, হিরণ।'

'আনছি,' বলে বেরিয়ে গেল সে। তিন মিনিট পর ফিরল ডানহিল সিগারেটের প্যাকেট সাইজের একটা জিনিস নিয়ে। দেখতে নিরীহ গোছের এক ব্যান্ড পকেট ট্রানজিস্টারের মত। তবে সময়মত একটা বাড়তি সুইচ টিপলে, টিউনিং ডায়াল খানিকটা বেশি ঘোরালেই হয়ে উঠবে ৯৯.৯ ভাগ কার্যকর ডিটেক্টর। কনসিল্ড্ ছারপোকা সনাক্ত করতে এর জুড়ি খুব কমই আছে।

ওটা কোটের সাইড পকেটে রাখল রানা। 'কাজে আটকে যাওয়ায় সময়মত আসতে পারিনি। সাদেকের বান্ধবীর সাথে দেখা করা জরুরী ছিল।'

'আপনি বললে এখনই সে ব্যবস্থা করতে পারি আমি,' বলল হিরণ।

'থাকে কোথায় সে?'

'কাছেই। গাড়িতে পাঁচ মিনিটের পথও না।'

'করো ব্যবস্থা।'

ফোনের রিসিভার তুলে নিল যুবক, সাতটা সংখ্যা পাঞ্চ করল। রিঙের পর রিঙ বেজে চলেছে, সাড়া নেই। বিশ কি আরও কিছু বেশি রিঙের পর ফোন ওঠানো হলো ও প্রান্তে। 'রোজানা?' মৃদু কণ্ঠে বলল সে। 'হিরণ। সরি, এতরাতে ডিসটার্ব করতে হলো।' কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে আবার মুখ খুলল। 'লন্ডন থেকে সাদেক সহেবের খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু এসেছেন। তোমার সাথে দেখা করতে চান। অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ, এর সাথে যোগাযোগ করতেই জি. পি. ও গিয়েছিল সেদিন…'

নীরবতা। বিষাদ ফুটল হিরণের চেহারায়। 'শোনো, শান্ত হও, রোজানা। যা হওয়ার…বুঝি। কিন্তু কি করার আছে বলো?…যাক্, আমরা আসছি। হ্যাঁ, এখনই। ঠিক আছে?'

হিরণের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। কাছের পিয়াযযা সান্টা মারিয়ায় থাকে রোজানা মোরান্ডি, একটা ফ্ল্যাট বিল্ডিঙের তিনতলায়। রোজানা দীর্ঘাঙ্গী। সুন্দরী। শিশুসুলভ চেহারা এ মুহূর্তে ফোলা ফোলা। ফর্সা নাকের ডগা লাল হয়ে আছে। মাথার লালচে-বাদামী চকচকে চুল এলোমেলো। বিশ-একুশ হবে বয়স। রানাকে দেখল মেয়েটি বেশ সময় নিয়ে। 'আপনার কথা অনেক শুনেছি সাদেকের মুখে,' সর্দি সর্দি গলায় বলল। 'প্রায়ই বলত।'

বিলাসবহুল লিভিংরুমে বসল ওরা। দু'চার কথায় সান্ত্বনা জানাল রানা

মেয়েটিকে, কাজের কথা পাড়ল। 'পিয়েরো সিমকা সম্পর্কে সাদেককে তুমি কিছু বলেছিলে শুনেছি আমি।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রোজানা।

'সিমকা তোমার পরিচিত?'

'হ্যাঁ। আমরা একই এলাকার। ভেনিটোয় গ্রামের বাড়ি। ভেনিসের কাছে। দূর সম্পর্কের আত্মীয় সে আমার।'

'আচ্ছা। বলে যাও, প্লীজ!'

'আমাদের কলেজের ছাত্রনেতা ছিল সিমকা। প্রথমদিকে ছিল মাওপন্থী। পরে নীতি থেকে সরে মনার্কিস্ট লিবারেশন গ্রুপ নামে নিজেই এক চরম বামপন্থী দল গড়ে। আমরা বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী তার গ্রুপের সদস্য ছিলাম। "লিটল জায়ান্ট" নামে ডাকতাম আমরা ওকে। ভীষণ উচ্চাভিলাষী মানুষ। জাতীয় নির্বাচনে সিমকার দল তেমন ভাল ফল করতে পারেনি, তবে সে নিজে সিনেটর নির্বাচিত হয় আমাদের এলাকা থেকে। একবার নয়, তিনবার। বর্তমানে থার্ড টার্ম চলছে তার। আমার এই চাকরি সিমকার দেয়া।' মুখ নিচু করে ফেলল রোজানা। 'সে জন্যে অবশ্য কম মূল্য দিতে হয়নি আমাকে।'

খানিক চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। 'এখনও সাক্ষাৎ হয় তোমাদের?'

'হ্যাঁ। ডন লুপো আলিটালিয়ার নিয়মিত ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার। প্রায়ই জার্নি করে।'

'ডন লুপো!'

চোখ তুলল রোজানা। 'সিমকার আরেক পরিচয়।'

'মাফিয়া?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?' নোটবইয়ের DL এর ব্যাখ্যা? ভাবল ও।

'সে আমাকে ডি-ডে'র একটা চরিত্র অফার করেছিল। কিন্তু ছবিটার ব্যাপারে প্রতিবার সাক্ষাতের সময় এমন সব অদ্ভুত কথা বলত লোকটা, শুনে ভয়ে এগোইনি আমি। সাহস পাইনি।'

'কিরকম অদ্ভুত কথা?'

'একবার আমার ফ্লাইটে লন্ডন যাচ্ছিল সিমকা, পথে কথায় কথায় বলল, টর্পেডো কিনতে চলেছে। ছবিতে নাকি এক জায়ান্ট অয়েল ট্যাঙ্কার উড়িয়ে দেয়ার দৃশ্য আছে, ওটা করতে দরকার হবে। আরেকবার গেল মস্কো, বলল, নিউক্লিয়ার মিসাইল কিনতে যাচ্ছে। কথাগুলো সপ্তাদুয়েক আগে সাদেককে জানিয়েছিলাম। তারপর…' সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি।

হাঁটুতে কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকে বসল রানা। 'আর কিছু?'

'সাইজের কারণে আড়ালে-আবডালে সবাই হাসাহাসি করে সিমকাকে নিয়ে। কেউ কেউ সামনাসামনিও করেছে, বিশেষ করে কলেজ জীবনে। খুব রেগে যেত সে, শাসাত। বলত, একদিন সবাইকে দেখিয়ে দেবে সে সিমকা কি চীজ। এই ছবির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সেই কথাটা দু'বার বলেছে ও আমাকে। বলেছে, এবার সময় হয়েছে, খুব শীঘ্রি পৃথিবীকে দেখিয়ে দেবে সে

পিয়েরো সিমকা কি জিনিস।'

'আর কিছু?'

কিছু সময় ভাবল রোজানা। 'কই···তেমন, না। এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না ঠিক।'

'যদি নতুন কোন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট মনে পড়ে, আমাকে জানাবে সঙ্গে সঙ্গে। আমি হোটেল লে সুপারবে আছি। ওখানে যোগাযোগ করার প্রয়োজন নেই। হিরণকে জানিয়ে দিলেই চলবে।'

'আচ্ছা! ডি-ডে ছবির ফুল ইউনিটও তো ওই হোটেলেই আছে।' বিস্ময় ফুটল তার চেহারায়।

'হ্যাঁ। আছে।'

সাড়ে চারটেয় হোটেলে ফিরল রানা। বাইরের পোশাক খুলে স্লীপিং গাউন ও ট্রাউজার পরে মেসেজে চোখ বোলাতে বসল।

স্যার হিউ, লরেনযো কন্টি, স্টাডস মূলার ও পিয়েরো সিমকা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য আছে এতে। হেদায়েত সম্পর্কে অবশ্য কিছু নেই। তথ্যগুলো যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি ভীতিকর। নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে এরা কে কতখানি নির্দয়, খানিকটা পড়লেই তা বেশ বোঝা যায়। স্যার হিউ ও ম্যালোরি, এরা দু'জন প্রবল আবেগপ্রবণ মানুষ। আবেগের কারণে মানসিক ভারসাম্য প্রায়ই টলোমলো হয়ে ওঠে এদের। স্টাডস ম্যালোরি সারাক্ষণ ডুবে থাকে মদে। প্রচুর পান করলেও নিজেকে খাড়া রাখতে পারে সে। তবে সমস্যা হয়। ছয় মাস, এক বছর বা দেড় বছর পর পর দেখা দেয় সমস্যা। প্রথম ধাক্কাতেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় পরিস্থিতি। তখন এক ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি রেস্ট ফার্মে ভর্তি করা হয় তাকে। জায়গাটা ইংল্যান্ডের সাসেক্সে। দু'মাস ছিল সে ওখানে।

আগে এ সমস্যা ছিল না তার। দু'বার অস্কারের জন্যে মনোনীত হয়েও পুরস্কার না পাওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে সে। তখনই এ রোগের শুরু।

আশির দশকের শেষ দিকে শুরু হয় এ সমস্যা, বর্তমানে কমেছে অনেকটা।

কন্টি কোকেনে আসক্ত। আগে প্রায়ই মেন্টাল ব্রেকডাউন ঘটত লোকটার। তবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে ড্রাগ সেবনের কারণে ঘটে না ব্যাপারটা। অতিরিক্ত খাটুনির জন্যে ঘটে। ছবির জগতে দীর্ঘদিন একনাগাড়ে জড়িত থাকলে এ সমস্যা দেখা দেয় কন্টির।

তখন কাজ ছেড়ে সরে পড়ে সে। ক্যাপরি দ্বীপে অথবা ফ্রান্সে অবসর কাটায়। যেখানেই যাক, প্রায় প্রতিবারই একজন করে পরিচারিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে সেখানে। সেক্সুয়ালি পারভার্টেড। এর মা খুব উঁচু বংশের, পয়সাওয়ালা লোকের মেয়ে ছিল। রোমের বাইরে কয়েক হাজার একরের বিশাল ফার্মল্যান্ডের মালিক ছিল কন্টি পরিবার। সারাদেশে আরও অনেক ফার্মল্যান্ড আছে। বিরাট ধনী।

শহরের বাইরে যে ওয়্যারহাউস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল সে ওদের গত রাতে, জানা গেল সেটা তার নিজের। ছবির জন্যে কেনা বা ভাড়ায় নেয়া সাজ-সরঞ্জাম রাখে সে ওগুলোতে। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, তাই কন্টির অনুরোধে পিয়েরো সিমকা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ওখানে ছোটখাট এক আর্মি বেস বসিয়েছে সম্প্রতি।

মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট ও যুদ্ধপরবর্তী ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট সরকার কন্টি পরিবারের প্রচুর জমিজমা হুকুম দখল করেছে। এই কারণে সুস্থ সমাজের প্রতি, আইনের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ নেই লরেনযো কন্টির।

এর মেন্টাল ব্রেকডাউনের ঘটনা প্রথম ঘটে আশির দশকের শেষদিকে। সে সময় তাকে ভর্তি করা হয় সাসেক্সের একই রেস্ট ফার্মে। খুব ব্যয়বহুল, অভিজাত রিট্রিট। প্রায় দু'মাস ছিল সে ওখানে।

স্যার হিউ মারসল্যান্ডের কাহিনী অন্যরকম। ছোটবেলায় অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল। ডাকা হত 'ব্রাইট বার্মিংহাম স্কলারশিপ বয়' নামে। অক্সফোর্ডের বাঘা ছাত্র। ব্রিটেনের শো বিজনেসে জড়িত ছিল (এখনও আছে)। তার মারসল্যান্ড এন্টারপ্রাইজ ও-দেশের এক নম্বর প্রতিষ্ঠান এ লাইনে। প্রচুর স্ক্যান্ডালের জন্ম হয়েছে তাকে ঘিরে। এক টার্মের জন্যে মন্ত্রীও মনোনীত হয়েছিল সে।

দেশ-বিদেশের অসংখ্য ব্যাঙ্কে টাকার পাহাড় জমিয়েছে স্যার হিউ। জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্যে '৭৩ সালে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হয় তাকে (অর্ডার অভ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার, নাইট কমান্ডার, ১৯৭১)। ইউনিসেফ সহ অন্য কয়েকটি আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থায় সেমি-অনারারি কূটনৈতিক হিসেবেও কাজ করেছে সে কয়েক দফা।

অবিবাহিত। মেয়েদের ব্যাপারে দুর্বলতা প্রচুর। তার এক রক্ষিতার 'দুর্ঘটনাজনিত' মৃত্যুর পর স্ক্যান্ডাল ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল লন্ডনে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা সেটা। এ সময়ে দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল স্যার হিউ—কোথায় ছিল জানা যায়নি (চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে)।

এরপর পিয়েরো সিমকা। এর কাহিনী সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং মনে হলো রানার।

অত্যন্ত প্রতিভাবান সিনেটর পিয়েরো সিমকা ওরফে 'লিটল জায়ান্ট' ওরফে ডন লুপো (স্যার উলফ) ওরফে প্রফেসর ওরফে স্মলেস্ট বাস্টার্ড অবিশ্বাস্য পরিমাণ ধন-সম্পদের মালিক। সাধারণ নির্বাচনে প্রথম দফা নির্বাচিত হওয়ার পরপরই নানান অবৈধ ব্যবসায় নাক ডোবায় লোকটা, পেট্রোকেমিক্যাল থেকে হেরোইন, সর্বত্র। তৈরি করে নিজস্ব সশস্ত্র গুণ্ডা বাহিনী (বর্তমানে বিলুপ্ত)। ক্রমে পড়ুয়ার মাফিয়া ডন নির্বাচিত হয় সিমকা।

ছাত্রজীবনে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্য হিসেবে রাজনীতিতে প্রবেশ করে, পরে মাওবাদী বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে যায়। কিছুকাল পর নিজেই এক দল গঠন করে মনার্কিস্ট লিবারেশন গ্রুপ নামে। নির্বাচনে ওই

দলটির একমাত্র সে-ই নির্বাচিত হয়। এর কিছুদিন পর নিজের পার্টি বিলুপ্ত করে সে, গঠন করে নতুন এক ডানপন্থী দল।

প্রতিভাবান এক ট্রাবলশূটার সিমকা। জাতিসংঘের হয়ে বেশকিছু আন্তর্জাতিক সমস্যার মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে সে। প্রতিটিতে সফল হয়। এরমধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার টুপামারো সমস্যা, মধ্য আফ্রিকার উপজাতি বিদ্রোহ ইত্যাদি খুবই মুন্সিয়ানার সাথে সমাধা করে লোকটা। সে সময় মিলানের এক জার্নাল তাকে আখ্যা দেয় 'দ্য ভেস্ট পকেট অভ হেনরি কিসিঞ্জার' নামে।

আশির দশকের শেষদিকে সিনেটে অধিবেশন চলার সময় তার আকার-আকৃতি নিয়ে পত্রিকায় ছাপা হওয়া এক কার্টুন নিয়ে হাসাহাসি হওয়ায় প্রচণ্ড অপমান বোধ করে সিমকা। এর অল্পদিনের মধ্যে মানসিক ভারসাম্য হারায় সে।

দীর্ঘদিনের জন্যে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়। আড়াই মাস পর আবার দেখা যায় তাকে প্রকাশ্যে। মাঝের সময়টা সে কোথায় ছিল জানা যায়নি (চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে)।

কাগজটা ভাঁজ করল মাসুদ রানা। চিৎ হয়ে শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল। ডুবে গেল গভীর চিন্তায়। ছবি তৈরি করতে এতসব কেন? টর্পেডো, নিউক্লিয়ার মিসাইল···এর মানে কি? খুব শীঘ্রি পৃথিবীকে কি দেখাতে যাচ্ছে সিমকা? লেটেস্ট মডেলের এত প্লেন কেন জড়ো করেছে এরা ফিউমিসিনোয়? ক্লাসিফায়েড প্লেনগুলো কোন্ রহস্যজনক উপায়ে হাত করল এরা—একদল মানসিক ভারসাম্যহীন? অন্য দুই ওয়্যারহাউসে কি ছিল? ও দুটোর ভেতরে যাওয়ার আমন্ত্রণ কেন জানাল না সিমকা?

আতঙ্কের হিম-শীতল একটা ধারা শিরশিরে অনুভূতি জাগিয়ে মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল নিচের দিকে।

চট্ করে উঠে বসল রানা। কপালে জমে ওঠা চিকন ঘাম মুছল হাতের তালু দিয়ে। কে এসেছিল রাতে ওর স্যুইটে? ভাবল ও, কেন লিসনিঙ ডিভাইস প্ল্যান্ট করে গেছে? এমন কি তথ্য জানতে পেরেছিল সাদেক এদের ব্যাপারে যে তাকে খুন হতে হলো? একটা ছবি নির্মাণের ব্যাপারে এমন কি গোপনীয় বিষয় আছে যা চেপে রাখার জন্যে খুন পর্যন্ত করতে বাধল না এদের?

মাসুদ রানার আসল পরিচয় কি ফাঁস হয়ে গেছে? নাহলে ওর স্যুইটে ছারপোকা কেন?

কেন!!!

উঠল ও। পায়ে পায়ে জানালার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। নতুন দিনের ফ্যাকাসে আলোর আভাস ফুটেছে সামান্য। রাস্তার আলোর তেজে ভাটা পড়তে শুরু করেছে। কেমন যেন ভৌতিক, অশুভ লাগছে চোখে মানুষ আর প্রকৃতির তৈরি এই দ্বৈত আলোর প্রতিযোগিতা।

মনে হচ্ছে কি যেন এক সর্বনাশের বার্তা বয়ে নিয়ে আসছে নতুন দিন।

হোটেলের সামনের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। পুলিসের একটা করে

পেট্রল কার দাঁড়িয়ে আছে ইন ও আউট গেটের সামনের বড় রাস্তায়। অন্য একটা ধীরগতিতে টহল দিচ্ছে হোটেলের চারদিকে। ফুটপাথেও তিন ইউনিফর্মড পুলিস দেখতে পেল ও। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গল্প করছে, সিগারেট টানছে। কাঁধে ঝুলছে অটোমেটিক কারবাইন।

হোটেল লে সুপারবে এখন যে-সমস্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বরা রয়েছে, এ আয়োজন তাদের নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্যে।

গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল রানা। ষোড়শ শতাব্দীর রোমান প্যালায্যোর গঠন প্রকৃতির অনুকরণে ১৮৯৭ সালে এক আর্কিটেক্ট তৈরি করে এই হোটেল বিল্ডিঙ। প্রতিটা সুইটের পিছনে সরু ব্যালকনি আছে প্যালায্যো ঐতিহ্য অনুযায়ী। তার দু'দিকে জেগে আছে দুটো করে পিলারের অর্ধেকটা। ওগুলোর আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত আট ইঞ্চি পর পর খাঁজ কাটা। প্রতিটি খাঁজ দু'ইঞ্চি গভীর। ইচ্ছে আর সাহস থাকলে যে কেউ ওই খাঁজে পা রেখে উঠে আসতে পারে যে কোন ফ্লোরে। এই পথেই এসেছিল অনুপ্রবেশকারী?

ফিরে এল রানা। মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানকে রিপোর্ট লিখতে বসে পড়ল।

চার

টেলিফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙল রানার। হাই তুলে ঘড়ি দেখল, প্রায় এগারোটা বাজে। 'ইয়েস!'

'মারসল্যান্ড হিয়ার, মিস্টার গ্যারি।'

সঙ্গে সঙ্গে পুরো সজাগ হয়ে উঠল ও। 'বলুন।'

'কাল রাতে আপনাকে আজকের খুব জরুরী একটা প্রোগ্রামের কথা জানাতে ভুলেই গিয়েছিলাম। সরি।'

'কি তা?'

'মানে আমাদের ছবির কাহিনীকার পল লেনের সাথে তো পরিচয় হয়নি আপনার। সে অবশ্য ছিলও না এখানে, স্টেটসে ছিল। আজই সকালে এসেছে।'

'আচ্ছা!'

'প্রোগ্রামটা ছিল আজ দুপুরে আমরা সবাই একসঙ্গে লাঞ্চ করব কালকের সেই রেস্টুরেন্টে। লাঞ্চের পর ওখানেই বসবে ডি-ডে'র স্টোরি কনফারেন্স। আনঅফিশিয়ালি অবশ্য। আপনিও যাচ্ছেন তো আমাদের সাথে?'

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই যাব।'

'আমি জানতাম,' হাসল স্যার হিউ। কেমন অদ্ভুত শোনাল যেন। 'একটায় রওনা হব আমরা এখান থেকে।'

'আমি তৈরি থাকব।'

ফোন রেখে বাথরুমে ঢুকল রানা। শাওয়ার-শেভ সেরে যখন বের হলো, তখন সাড়ে এগারোটা বাজে। বাইরের পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিল ও। টেলিফোনে হাল্কা কিছু নাস্তা ও কফির অর্ডার দিল। তারপর আবার ডি-ডে নিয়ে ভাবতে বসল। কিন্তু বেশিদূর এগোবার আগেই বাধা দিল ক্যামিলার ফোন। 'গ্যারি! ক্যারো মিও!'

'ক্যামিলা?'

'হ্যাঁ। কি করছ?'

'এখনও বিছানায়।'

বিস্ময় ফুটল মেয়েটির কণ্ঠে। 'মানে?'

'মাথা ব্যথার জন্যে রাতে ভাল ঘুম হয়নি।'

'ও। এখন কমেছে ব্যথা?'

'হ্যাঁ।'

'লাঞ্চে যাচ্ছ তো আমাদের সাথে?'

'যাচ্ছি।'

'ওকে, দেখা হবে তখন। রাখলাম।'

নাস্তা খেল মাসুদ রানা। দু'কাপ কড়া কালো কফি খেল পরপর। তারপর সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল চিন্তিত মনে।

একটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে বের হলো ও। নিচের হলে স্যার হিউ অভ্যর্থনা জানাল স্বভাবসুলভ স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে। জানাল, জরুরী কিছু কাজ সেরে যেতে হবে বলে সিমকা, কন্টি ও ম্যালোরি আগেই রওনা হয়ে গেছে। অন্যরাও এইমাত্র যাত্রা করল। সে থেকে গেছে গ্যারি ও ক্যামিলাকে নিয়ে যাবে বলে। শোফার চালিত রোলস রয়েসে চড়ে তখনই বেরিয়ে পড়ল ওরা তিনজন। সামনে-পিছনে চারটে মোটর সাইকেলে করে গার্ড দিয়ে নিয়ে চলেছে চার পুলিস-সার্জেন্ট।

রেস্টুরেন্টে গত রাতের সবাই আছে। প্রথমেই স্ক্রীন-রাইটার পল লেনের সঙ্গে রানাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। মাঝারি উচ্চতার মানুষ লেন। চেহারা দেখে মনে হলো কোনও ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। নীল ফ্লানেল ব্লেজার গায়ে তার, পরনে ডাক। পায়ে গুচ্চি লোফার। আমেরিকান।

কন্টি ও ক্যামিলার মাঝখানে বসল মাসুদ রানা। ছবির নায়ক, সিমকা, লেন, স্যার হিউ ও ম্যালোরি ওদের মুখোমুখি। হেদায়েতকে পাশের এক টেবিলে কয়েকজন এক্জিকিউটিভের সাথে বসা দেখা গেল।

ক্যামিলাকে কালকের থেকে অনেক প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে আজ। কারণে-অকারণে হাসছে। সেজেছেও তেমনি। রানার মনে হলো সকালের পুরোটাই হয়তো বিউটি পার্লারে কেটেছে তার। শানদার খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে কন্টি রানাকে জানাল পল লেনের যাবতীয় তথ্য। এক সময় নভেল লিখত সে। কয়েক বছর আগে হাত দিয়েছে এ কাজে। একজন সফল স্ক্রীন-রাইটার। তিনটে কাহিনী লিখেছে এর আগে, তিনটেই চলেছে দারুণ। ডি-ডে চার নম্বর। ইউনিটের সবাইকে কাহিনী শোনাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল,

তাই ছুটে এসেছে।

লাঞ্চ শেষ হলো। টেবিল পরিষ্কার হলো। এরপর শুরু হলো আসল কাজ।

'যদি এমনটা ঘটে,' নাটুকে ভঙ্গিতে শুরু করল লেন। 'তাহলে কি অবস্থা হবে পৃথিবীর? মানব সভ্যতার?' একটু বিরতি দিয়ে উপস্থিত অতিথিদের ওপর নজর বুলিয়ে নিল সে। তার দু'চোখ চক্ চক্ করছে, দেখল মাসুদ রানা। খুব সম্ভব অ্যাডিক্ট। এর ব্যাকগ্রাউন্ডও জানতে হবে, ভাবল ও। এ ব্যাটাও সাসেক্স থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসেছে কি না জানা প্রয়োজন।

সরাসরি রানার দিকে তাকাল সে। 'মনে করুন আমেরিকা, রাশিয়া বা চীন অথবা অন্য কোন সুপার পাওয়ার নয়, স্রেফ নীতিহীন কিছু মানুষের একটা গ্রুপ, যাদের টাকা আছে অঢেল, ক্ষমতাও আছে তেমনি, মজা দেখার জন্যে খোঁচা মেরে বাধিয়ে দিল এক সুপার পাওয়ারের সাথে আরেক সুপার পাওয়ারের যুদ্ধ, তাহলে কি অবস্থা হবে? এদের যে কোন একটার হাতে যে পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র আছে, তাতেই সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। মহাপ্রলয় ঘটে যাবে। এই হচ্ছে আমার কাহিনী।'

'ব্যাপারটা অতিকাল্পনিক হয়ে যাচ্ছে না?' বলে উঠল ক্যামিলা।

'আমি তা মনে করি না,' খুব জোরের সাথে বলল লেন। 'কারণটাও শুনুন। এবারও অবশ্য একটু কল্পনা করতে হবে আপনাদের। ধরুন, বিশ্বকাপ ক্রিকেট অথবা ফুটবল খেলা চলছে। মিউনিখ অলিম্পিকের সময় যেমন ইসরায়েলী অ্যাথলিটদের পাইকারী ভাবে হত্যা করেছিল শিরহান শিরহান নামের এক প্যালেস্টাইনী সন্ত্রাসী গ্রুপ, সেখানেও তেমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, কি হবে তার ফল? অথবা লন্ডনে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠির শীর্ষ সম্মেলন বসেছে, কমিশনের সব ক'টি দেশের মাথা বৈঠকে উপস্থিত, ওখানেও ঘটে গেল এক ম্যাস কিলিং, অথবা প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আকাশে উড়ল আমেরিকার এয়ারফোর্স ওয়ান, মাঝআকাশে বিস্ফোরিত হলো সেটা, কেমন হবে এ সব দেশের প্রতিক্রিয়া? মনে করুন খুব দ্রুত, দুই কি তিনদিনের মধ্যে ঘটে গেল এত সব। তার সাথে মস্কো আর বেইজিঙে কিছু বোমাবর্ষণও হলো, তখন?'

হাসল লেন। 'এরকম তো ঘটতেই পারে। পারে না?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল মেয়েটি। 'তাহলে সম্ভব।'

'দ্যাট'স দ্য পয়েন্ট

'তবু, এতকিছু এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটার ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয় না কি?' বলল রানা।

'প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছে,' উল্টোদিকে ডবল কুশনের ওপর বসা সিমকা বলে উঠল। 'কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় না। ভেবে দেখুন, নানান সন্ত্রাসী ঘটনা প্রায়ই ঘটে বিশ্বে, কিন্তু খুব বেশিরকম প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে না তা। কেন? কারণ সেসব দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ঘটে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটানোর জন্যেও ঘটে না সেগুলো। কিন্তু

এক্ষেত্রে তাই ঘটবে।'

'হ্যাঁ,' নড়েচড়ে বসল লরেনযো কন্টি। 'সেনিয়র লেন দুটো ভিন্নমুখী ঘটনার ওপর চমৎকার এক স্ক্রীনপ্লে রচনা করেছেন। আমাদের বন্ধু, স্টাডস ম্যালোরি ভেবে ঠিক করে ফেলেছেন কিভাবে চিত্রায়িত করা হবে ঘটনা দুটো। এ দুটো হবে সুপার পাওয়ারগুলোর জন্যে এক সতর্কবাণী। বাণী যাই হোক, দুটো সীন হবে এক কথায় ফ্যান্টাসটিক। সেগুলো কি, কোথায় ঘটবে, সেসব আগেভাগে ফাঁস করে দর্শকদের মজা নষ্ট করতে চাই না।'

সিমকার ওপর চোখ পড়তে থমকে গেল রানা। একদৃষ্টে ওকেই দেখছিল সে। অদ্ভুত চাউনি। শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে বাঘ এমন স্থির দৃষ্টিতেই তাকিয়ে থাকে। আকারের কারণে ব্যাটাকে পাত্তা দিতে মন চায় না, তবু ওই চাউনি অস্বস্তিতে ফেলে দিল ওকে।

হাসির ভঙ্গি করল সিমকা। 'একটা কথা ভাবছিলাম।'

'কি?' প্রশ্ন করল রানা।

'আমাদের হোটেলে এক্সট্রা গার্ড বসাব। আর সব স্টার তারকারা আগামীকাল থেকে পৌঁছতে শুরু করবে।' মুচকে হাসল লোকটা। 'ইইসি সামিট ভেনুর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ স্পট্ হয়ে উঠবে তখন লে সুপারব।'

'ঠিক।'

ওদিকে সংক্ষেপে কাহিনী বলে চলেছে কাহিনীকার। একদল অ্যানার্কিস্ট ম্যানিয়াক, দলের নাম ম্লুচ (MLUTCH= ম্যাডমেন লায়্যাবল আনএক্সপেক্টেডলি টু কংকোয়্যার হিউম্যানিটি), পরিকল্পনা করেছে পৃথিবী ধ্বংস করে দেয়ার। এ জন্যে বাছাই করা বড় বড় শহরে অন্তত দুটো করে বড় ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটাবে তারা। নামকরা কিছু ব্যক্তিত্বকে হত্যা করবে, তাদের টার্গেট হবে মূলত রাশিয়া, আমেরিকা ও চিনের বাঘা বাঘা ব্যক্তিত্ব। ঘটনাগুলো এমনভাবে সাজানো হবে যাতে এক দেশ অন্য দেশকে সন্দেহ করতে বাধ্য হয়, ভেতরের কারসাজি টের পাওয়ার আগেই যার যার নিউক্লিয়ার রিট্যালিয়েশন মেশিনারীর সুইচ টিপে বসে। কাজটা যে ভুল হয়ে গেছে, বুঝে ওঠার আগেই ঘটে যাবে যা ঘটার। ম্লুচের ঘাঁটি হবে রোমে।

ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, জন ট্রাভোল্টা ষড়যন্ত্র টের পেয়ে ছুটে আসবে রোমে, হানা দেবে অ্যানার্কিস্ট ম্যানিয়াকদের ঘাঁটিতে। একদল 'ব্যাড গাই' পরিবেষ্টিত ম্লুচের প্রধান, ক্যামিলা ক্যাভোর প্রেমে পড়বে দুঃসাহসী ট্রাভোল্টা, ক্যামিলা নিজের ভুল বুঝতে পেরে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু ততক্ষণে পানি বহুদূর গড়িয়ে গেছে। এর মাঝেও প্রেম আসবে ওদের জীবনে। প্রেমিকের বাহুবন্ধনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগে ক্যামিলার মনে হবে, এভাবে পৃথিবী নামের গ্রহটাকে ধ্বংস করা বোকামি হয়ে গেছে। জীবনটাকে ভালমত উপভোগ করার একটা সুযোগ পাওয়া গেলে বড় ভাল হত।

লেনের বক্তব্য শেষ হতে হাততালির শব্দে মুখর হয়ে উঠল রেস্টুরেন্ট। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ছবির নায়ক নায়িকা, ঘনঘন মাথা দুলিয়ে শ্রোতাদের

অভিনন্দনের জবাব দিতে লাগল।

এরপর এল কন্টির পালা। আর যে সমস্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতাকে কাস্ট করা হয়েছে, একে একে তাদের নাম ঘোষণা করল সে তুমুল উল্লাসের মধ্যে দিয়ে। ব্রিটেন, ইটালি ছাড়াও রাশিয়া, মিশর, ভারত, আমেরিকা, ফ্রান্সের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা থাকছে ডি-ডে'তে। তার ঘোষণা শেষ হতে স্যার হিউ মারসল্যান্ড আসন ছাড়ল। হাতে বড় একটা রোল করা চার্ট।

ছবির বাজেট, কোন খাতে কিছু কিছু বাড়তিসহ মোট কত খরচ বরাদ্দ করা হয়েছে ইত্যাদি আছে ওতে। এইবার সত্যিকার অর্থে উৎকর্ণ হয়ে উঠল পুরো অডিয়েন্স, কারণ এদের মধ্যে অনেকেই পুঁজি বিনিয়োগ করেছে ডি-ডে'তে। হাজারো খুঁটিনাটি হিসেব। বাদ পড়েনি তার কোনটা। প্রত্যেকটা ঘোষিত খাত থেকে যদি অল্প অল্প কিছু করে গাপ্ করে দেয় এরা চার বা পাঁচ মহারথী, আপনমনে ভাবল মাসুদ রানা, কত মিলিয়নে দাঁড়াবে তাহলে অঙ্কটা?

স্যার হিউকে দেখল। কথাবার্তায় ধীর, আচরণে অভিজাত, বিনয়ী। অতিমাত্রায় অমায়িক। ফিগারের সাথে চমৎকার মানিয়ে গেছে ব্যক্তিত্ব। খাতওয়ারী ঘোষণার ফাঁকে ফাঁকে এক-আধটা রসালো মন্তব্যও করছে মানুষটা।

'আমাদের ছবির মূল নায়ক,' মুচকে হেসে তাকে দেখল সে। 'ব্রোকেন অ্যারো খ্যাত হিজ একসেলেন্সি জন ট্রাভোল্টা একাই একশো, ইউ নো। ডি-ডে'তে তাঁর পারিশ্রমিক আট মিলিয়ন ইউএস ডলার।' মৃদু গুঞ্জন উঠল অতিথিদের মধ্যে। 'সেনিয়রিটা ক্যামিলার পাঁচ। অন্য আর্টিস্টরা কোয়ার্টার থেকে দেড় মিলিয়ন পর্যন্ত পাবেন। তাঁদের পর্দায় উপস্থিতি পাঁচ থেকে দশ মিনিটের বেশি হবে না, দু'চার দিনের কাজ। ছবির বিজ্ঞাপনী বিলবোর্ডে এতসব তারকার নাম আমাদের খরচ তুলে আনতে সাহায্য করবে।'

'এই সামান্য সময়ের জন্যে এত টাকা পারিশ্রমিক বেশি হয়ে যায় না?' বলে উঠল এক খুচরো প্রযোজক।

'তা হয়,' মাথা দোলাল স্যার হিউ। 'কিন্তু বিনিময়ে আমরা বহুগুণ ফেরত পাব, আপনার লাভটাও সেই সাথে বাড়বে।'

'কিন্তু ইনশিওরেন্স চার্জ খুব বেশি মনে হচ্ছে, স্যার হিউ,' বলল এক জার্মান ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। 'আমার সবগুলো ইন্ডাস্ট্রির বাৎসরিক চার্জও এত হয় না।'

'হের সিমিট, আপনি বোধহয় এতসব অত্যাধুনিক বিমান-কপ্টার ইত্যাদির কথা ভুলে গেছেন। ওগুলোর জন্যেই চার্জটা বেশি পড়ে যাচ্ছে। আমাদের রেপুটেশন ও পিয়েরো সিমকার রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে এইসব মিলিটারি ইকুইপমেন্ট প্রায় বিনা খরচে জোগাড় করেছি আমরা। নইলে ছবির বাজেট আর ইনশিওরেন্স চার্জ যে কোথায় গিয়ে পৌঁছত কে জানে!'

নিজের দায়িত্ব সেরে বসে পড়ল হিউ। বাকি ছিল পরিচালক ম্যালোরি। সে উঠল এবার। খেয়াল করেছে রানা, এতক্ষণ বসে বসে দেদার মদ গিলেছে

মানুষটা। ডি-ডে হবে বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র, আশি ভাগ কাজই যার চিত্রায়িত হবে কম্পিউটর কন্ট্রোলের সাহায্যে, ব্যাখ্যা করল সে। জানাল, মিনিয়েচার শহর, যুদ্ধক্ষেত্র, ফ্লীট, এয়ারফোর্স ব্যবহার করা হবে এসব ক্ষেত্রে।

'এসব নতুন নয়,' বলল ম্যালোরি। 'নতুন হচ্ছে আমাদের টেকনিক। প্রথমে ইন্সট্রাকশন তৈরি করা হবে, মাস্টার কম্পিউটরের কন্ট্রোল সার্কিটে ফীড করা হবে তা, এরপর সময়মত বাটন পাঞ্চ করা হবে। এবং ছবির মূল আকর্ষণ, আশিভাগ কাজ একটা মাত্র শটে টেক হয়ে যাবে।

'তবে এর ফলে খরচ কম হবে মনে করার কোন কারণ নেই। চিত্রায়ন বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে প্রচুর খরচ হবে। বাকি বিশ ভাগ কাজ করার জন্যে লরেনযো কন্টি তৈরি। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ অপারেটিঙ স্টুডিওর মালিক সে, আপনারা অনেকেই জানেন। সেখানে এরমধ্যে ট্রাফেলগার স্কোয়্যারের রেপ্লিকা তৈরি করা হয়েছে। টাইমস স্কোয়্যার, প্লেস ডি লা কংকর্ড, স্ট্যাচু অভ লিবার্টি, হোয়াইট হাউস ইত্যাদির রেপ্লিকাও। আর কয়েকটার কাজ চলছে। আমাদের ক্যামেরা ইউনিট আগামী সপ্তার শেষদিকে এসে পৌঁছবে। ওরা পৌঁছলেই শূটিং শুরু হবে।

'এখানে একটা কথা আপনাদের জানা প্রয়োজন,' হেঁচকি তুলল ম্যালোরি। 'ডি-ডে'তে কম্পিউটরের যে জাদুকরী কলা-কৌশল দেখানো হবে, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী হবেন আমাদের এই বন্ধুটি,' আঙুল তুলে হেদায়েতুল ইসলামকে দেখাল সে। 'সেনিয়র ইজল্যাম। এঁকে কম্পিউটর উইজার্ড বলা চলে বিনা দ্বিধায়। আমি শুধু মৌখিক ইন্সট্রাকশন দেব, বাকি সব করবেন ইনি। ভদ্রলোক আমাদের নতুন টীম-মেট। এঁকে আমাদের অভিনন্দন জানানো উচিত।'

আবার হাততালিতে মুখর হয়ে উঠল রেস্টুরেন্ট। উঠে দাঁড়াল হেদায়েত, লাজুক হাসির সাথে কয়েকবার মাথা দোলাল।

'আগামীকাল বিকেলে কন্টির স্টুডিও চত্বরে মিলিত হব আমরা আবার,' হাততালির তেজ কমতে ঘোষণা করল স্যার হিউ। 'আপনাদের ভেতর যাঁরা ডি-ডেতে পুঁজি বিনিয়োগের জন্যে তালিকাভুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দয়া করে আমাদের আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করবেন আগামীকাল। আপনাদের সুবিধার্থে লে সুপারবেই অবস্থান করছেন তিনি। এর পিছনে দু'চারদিন খরচ হবে, কাজেই ঝামেলা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা ভাল।'

'একটা দৃশ্য শূট করার কথা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি,' নিচু গলায় ম্যালোরিকে বলল কাহিনীকার। মীটিঙের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে তখন।

'কোনটা?'

'একটা অয়েল ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণের দৃশ্য। ওটা গুরুত্বপূর্ণ।'

ম্যালোরির দীর্ঘ মুখ বেঁকে গেল। 'কি করে বিস্ফোরণ ঘটাতে চাও?'

'সোজা,' বলে উঠল সিমকা। 'টর্পেডোর সাহায্যে। কি বলো, লেন?'

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছি।'

'ঠিক আছে,' ম্যালোরি বলল। 'তুমি আমাকে কিছু কালার ছবি জোগাড়

করে দাও ট্যাঙ্কারের, ওটা দেখে আমি মডেল তৈরি করে দেব।'

'কেন, মডেল কেন?' চাপা গলায় বলল সিমকা। 'আসল জিনিস হলে অসুবিধে কি?'

'আসল জিনিস?' তার চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল লেন। ঢোক গিলল। 'হ্যাঁ, তা মন্দ হয় না।'

'সীনটা কোথায় টেক করা হলে ভাল হয়?' ম্যালোরির চেহারায় সন্তুষ্টি ফুটতে দেখা গেল।

'সবচেয়ে ভাল হয় ডোভার উপকূলে হলে। কোন সরু চ্যানেলে।'

'ঠিক আছে, আগামী সোমবার···' রানাকে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হপ্ করে মুখ বুজে ফেলল সিমকা।

খেয়াল করল না ও। 'আমি হোটেলে ফিরে যাচ্ছি।'

'আমিও যাচ্ছি ওর সাথে,' পাশ থেকে ক্যামিলা।

'হ্যাঁ, নিশ্চই নিশ্চই!' ব্যস্ত হয়ে উঠল বামন। 'বিশ্রাম করুন গিয়ে। কন্টি, এঁদের হোটেলে ফেরার ব্যবস্থা করো, প্লীজ! আপনারা যান, আমরা আসছি একটু পর।'

মাথায় নতুন এক চিন্তার বোঝা নিয়ে হোটেলে ফিরল রানা।

ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে বেশ চাঙা বোধ করল ও। আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরতে ক্যামিলার ওপর চোখ পড়ল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে। বিছানায় নড়াচড়া টের পেয়ে ঘুরে তাকাল। হাসি ফুটল মুখে। পাশ ফিরে তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা নীরবে।

'কি দেখছ?' হাত থেমে গেল মেয়েটির।

'দেখছি না, ভাবছি,' বলল ও।

'কি?'

'শূটিঙের কাজ শুরু হতে তো শুনলাম আরও বেশ কয়েকদিন বাকি। সময়টা এখানে পড়ে পড়ে নষ্ট না করে ভাবছি তোমাকে নিয়ে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়।'

দ্বিধায় পড়ে গেল ক্যামিলা। 'তা মন্দ হয় না, গ্যারি। কিন্তু এমন মুহূর্তে সিমকা যাওয়ার অনুমতি দেবে কি না···'

'সিমকা?' চট্ করে উঠে বসল ও। কাজ খানিকটা এগিয়েছে ভেবে খুশি ভেতরে ভেতরে। 'একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারেও ওই লোকটার অনুমতি নিতে হয় তোমাকে!' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল। 'তোমার মত একজন নামীদামী তারকাকে···বলো কি?'

'মানুষটা যে আমার কাছে কি, তুমি বুঝবে না, গ্যারি। তিন বছর আগে আমার প্রতিবেশীও সম্ভবত চিনত না আমাকে। আর এখন? দেশ-বিদেশে কে না চেনে? সবই হয়েছে সিমকার জন্যে, গ্যারি। ও প্রায় রাস্তা থেকে তুলে এনেছে আমাকে এই পর্যায়ে।'

'তাই বলে···হেল্!'

'ব্যাপার কি, গ্যারি? জেলাস হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে?'

'যদি হই, সেটা কি অপরাধ হবে?' বলল রানা। 'তোমাকে যদি একান্ত আপন করে পেতে চাই, অন্যায় হবে?'

দীর্ঘক্ষণ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যামিলা। কি যেন খুঁজল ওর চোখের তারায়। দৃষ্টি নামিয়ে আনমনে একগোছা চুল পেঁচাতে লাগল আঙুলের মাথায়। অন্যমনস্ক।

'হয়তো না, গ্যারি। কিন্তু সিমকার কাছে আমি নিজেকে এতটাই বাঁধা মনে করি যে ওর অনুমতি না নিয়ে আর কারও ছবিতে অভিনয়ের কথাও ভাবতে পারি না। এ পর্যন্ত যত ছবি আমি করেছি, সবই সিমকা-কন্টির।'

'ও তোমার উপকার করেছে মানি। বিনিময়ে তুমিও তো কম করছ না। তোমার অভিনয় করা ছবি থেকে যে বিরাট লাভ আসছে, সে তো তাদের পকেটেই যাচ্ছে। না কি?'

'ব্যাপারটা তোমাকে হয়তো ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারব না। তোমাকে কষ্ট দিতে মন চায় না আমার। আবার সিমকাকে কষ্ট দেয়ার কথাও ভাবতে পারি না। ও খুব জটিল চরিত্রের মানুষ, জানো? অল্পতেই এমন বেসামাল হয়ে পড়ে। একবার তো আত্মহত্যাই করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় অবশ্য।'

'আত্মহত্যা!' চমকে উঠল যেন ও। 'ও মাই গড! বলো কি?'

'হ্যাঁ! কেন যে কাজটা করেছিল সিমকা!'

'তারপর কি হলো?'

'এক রেস্ট ফার্মে ভর্তি করা হলো ওকে। পুরো দু'মাস বিশ্রামে রাখা হলো।'

'রেস্ট ফার্ম?' অনুমানটা মিলে যেতে সন্তুষ্ট বোধ করল রানা। রসুনের গোড়ার মত এরা প্রত্যেকেই দেখা যাচ্ছে···

'তুমি কিছু মনে কোরো না, গ্যারি। আমি সিমকার সাথে কথা বলে দেখি ও কি বলে, কেমন?'

একটু ভাবল ও। 'তাহলে বরং থাক না হয়। আগে ছবির শূটিং শেষ হোক। তারপর একেবারে স্টেটসে নিয়ে যাব তোমাকে লম্বা সময়ের জন্যে, কি বলো? গিয়েছ কখনও টেক্সাসে?'

'নাহ! শূটিঙের কাজে দু'বার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে তোমাদের দেশে। তাও নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত।'

'গুড! দারুণ জমবে তাহলে!' একটু বিরতি দিল। 'এখন তাহলে থাক, যাব না কোথাও। এমনিতেও কাজের চাপের মধ্যে রয়েছে সিমকা, এসব প্রসঙ্গ এখন তার কানে তোলার দরকার নেই।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

ঘড়ি দেখল রানা। 'সন্ধে তো প্রায় হয়ে এল। চলো নিচে যাই। আড্ডা মেরে আসি খানিক।'

'তাই চলো।'

দশ মিনিট পর তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। করিডরে পা রেখে বিস্মিত হলো করিডরের দুই মাথায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা বি' দেহী দুই কারাবিনিয়েরিকে দেখে। রোম কনস্টেবুলারির জুডোকা। এখানে ওরা কেন ভেবে পেল না রানা। এলিভেটরের সামনে অপেক্ষমাণ কারাবিনিয়েরিকে পাশ কাটাবার সময় ক্যামিলার উদ্দেশে বিনয়ী হাসির সাথে নড করল লোকটা। রানাকেও, তবে হাসিটা ছিল না তখন।

'ব্যাপার কি?' এলিভেটরের দরজা বন্ধ হতে আনমনে বলল ও। 'এরা কি করছে এখানে?'

ঠোঁট ওল্টালো ক্যামিলা। 'কি জানি!'

চিন্তায় পড়ে গেল রানা। সিমকা অবশ্য বলেছিল সবার নিরাপত্তার জন্যে অতিরিক্ত গার্ড বসাবে সে হোটেলে। কিন্তু সে তো কাল থেকে বসাবার কথা ছিল। আজই এদের খাড়া করার কি এমন জরুরী প্রয়োজন দেখল ব্যাটা? রাতে যে ওকে বেরুতে হবে গোপনে, তার কি হবে এখন? এদের সামনে দিয়ে বের হওয়ার উপায় নেই, ভাবল ও, নিঃসন্দেহে খবর হয়ে যাবে।

মনযা রুমে স্যার হিউ ও স্টাডস ম্যালোরিকে পাওয়া গেল। এক কোণে আলাপে ব্যস্ত। কোনদিকে বিশেষ খেয়াল নেই। 'ওদের বিরক্ত করা ঠিক হবে না,' চাপা কণ্ঠে বলল রানা। 'চলো ওপাশে বসি।'

ওদের দুই টেবিল দূরে বসল দু'জন। রানা কান খাড়া রেখেছে। অয়েল ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণ ব্রিটিশ চ্যানেল নাকি গালফ অভ ফিনল্যান্ডে ঘটানো হবে, তাই নিয়ে দুজনকে আলোচনা করতে শুনল ও। খেলনা ট্যাঙ্কার নিয়েই কথা চলছে, কিন্তু তাদের বলার অতিউৎসাহী ভাবটা সন্দেহজনক মনে হলো। 'কিন্তু ওল্ড বয়,' স্টাডসের উদ্দেশে বলল হিউ, 'ব্রিটিশ চ্যানেলে ঘটালে সমস্যা আছে, বুঝতে পারছ না তুমি। ডোভার আর ক্যালাইস, দুই উপকূলেই ছড়িয়ে পড়বে তেল।'

'সেইন্ট পিটার্সবার্গে হলেও তো সমস্যা,' বলল ম্যালোরি। 'খুব দ্রুত রিঅ্যাক্ট করবে মস্কো। আর্টিলারি, মিজাইল, কোনটা ছুঁড়তে বাকি রাখবে না। সব ব্যবহার করবে আমাদের ওপর।'

'কাহিনীতে ওদের রিঅ্যাক্ট করার মত বহু মাল মশলার আয়োজন রেখেছে লেন,' ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসল চর্বির ডিপো। 'কাজেই ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।'

'বেশ,' হাল ছেড়ে দিল স্টাডস ম্যালোরি। বলেই তার দিকে ফিরে বসা ক্যামিলার ওপর চোখ পড়ল তার। 'আরে! তোমরা কখন এলে?'

'এইমাত্র।'

'তা ওখানে কেন?'

'আপনাদের আলোচনায় বাধা দিতে চাইনি, তাই সরে বসাই ভাল মনে হয়েছিল,' বলল রানা। 'তাছাড়া কি সব এক্সপ্লোশন নিয়ে কথা বলছেন শুনে ভয়ও লাগছিল।'

হা-হা করে হেসে উঠল হিউ মারসল্যান্ড। 'কাম হিয়ার, চার্মিং বয়! ভয়

পাওয়ার কিছু নেই। আমরা কম্পিউটরের কেরামতির ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করছি। প্লীজ জয়েন আস।'

উঠে গিয়ে ওদের সাথে যোগ দিল ওরা। 'শূটিং শেষ হতে কতদিন সময় লাগবে?' প্রশ্ন করল রানা।

'এমনিতে বিশেষ সময় লাগার কথা নয়। ফীড-ইনের কাজ হয়ে গেলে মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার। ম্যালোরি আর ইজল্যাম আছে বলেই এত জটিল আর বড় কাজ মাত্র কয়েকদিনে শেষ করতে পারছি। অন্য কেউ হলে কয়েক সপ্তা লেগে যেত।'

'কয়েক মাস,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলে উঠল ম্যালোরি।

ঘন ঘন মাথা দোলাল স্যার হিউ। 'তাই হবে। ভুল বলে ফেলেছি, সরি। সে যাক্, আপনারা কি খাবেন বলুন।'

'ধন্যবাদ। শুধু কফি,' বলল রানা। ক্যামিলা জানাল কিছুই খাবে না।

'যে হারে খাওয়া চলছে রোজ, তাতে শূটিং শুরু হওয়ার আগেই ভূঁড়ি গজিয়ে যেতে পারে আমার। কাজেই এখন থেকে অসময়ে খাওয়া-দাওয়া একদম বন্ধ।' ক্ষমা চেয়ে লেডিজরুমের দিকে চলে গেল সে।

'কবে শুরু হবে শূটিং?' কফিতে চুমুক দিল রানা।

'ক্যামেরা ইউনিট এসে পৌঁছলেই,' বলল পরিচালক। 'আগামী সপ্তার মাঝামাঝি নাগাদ।'

ব্যাপার কি! ভাবল ও, ব্যাটা লাঞ্চের সময় বলল আগামী সপ্তাব শেষদিকে এসে পৌঁছবে ক্যামেরা ইউনিট, এখন বলছে মাঝামাঝি নাগাদ। অথচ ওদিকে সিমকা অয়েল ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণের ব্যাপারে সোমবারের কথা কি যেন বলছিল দুপুরে। কি আয়োজন চলছে আসলে ভেতরে ভেতরে?

'আমি ভাবছি এখানে সময় নষ্ট না করে এই ফাঁকে সুইটজারল্যান্ডে ছোট একটা ট্যুর দিয়ে আসব কি না,' আনমনা ভঙ্গিতে বলল ও। 'সুইস জুঙফ্রাউ দেখার শখ অনেকদিনের। সুযোগই হয়ে ওঠে না।'

'এখন না যাওয়াই ভাল,' বলল ম্যালোরি। 'জুঙফ্রাউ দেখার সুযোগ পরে অনেক পাবেন। বর্তমানে ক্যামিলাকে দেখার যে সুযোগটা পাচ্ছেন, তাকে কাজে লাগান। আমার মতে সেটাই লাভজনক।'

চেহারায় যাই থাক, এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোক দুটোকে লক্ষ করছিল রানা। ভেবেছিল জুঙফ্রাউ হয়তো কোন অর্থ বহন করে এদের কাছে। কিন্তু হতাশ হতে হলো। কোন প্রতিক্রিয়া ঘটল না কারও মধ্যে। ফলাফল বিরাট এক শূন্য। তাহলে সাদেকের নোটবুকের C H অক্ষর দুটোর কি অর্থ? কেন লিখেছে সে ও-দুটো?

সুইস গাড়ির রেজিস্ট্রেশন বোঝাতে চেয়েছে? কিন্তু···কিছু একটা মিলছে না, ভাবল রানা। কোথায় যেন বড় এক ফাঁক রয়ে গেছে।

'কি ভাবছেন?' জানতে চাইল স্যার হিউ।

'ভাবছি থেকেই যাই বরং।'

'সেই ভাল।'

'তাছাড়া কাল আপনাকে ল'ইয়ারের সাথে বসতে হবে,' মনে করিয়ে দিল স্টাডস ম্যালোরি। 'আজ বৃহস্পতিবার। এইসব টুকটাক ঝামেলা সারতে দু'চারদিন এমনিতেই লাগবে। তারপর আর সময় কোথায়?'

'ঠিকই বলেছেন।'

ওর কফি শেষ হওয়ার আগে ক্যামিলা ফিরে এল। এ-গল্পে ও-গল্পে মেতে উঠল সে, হিউ আর ম্যালোরি। রানা যোগ দিল না। চিন্তায় ডুবে আছে। একটা ফাঁক খুঁজছে, যেখানে নাক ঢোকান যায়, নিশ্চিত বোঝা যায় এরা আসলে কি করছে।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে স্যার হিউর রহস্যময় অন্তর্ধানের ব্যাপারটা নিশ্চিত জানা গেলে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারত রানা। সময়টা কোথায় কাটিয়েছে সে? অন্য চারজনের সাথে তার অন্তর্ধানের সময় মেলে না, প্রায় তিন-চার বছরের ব্যবধান রয়েছে মাঝে।

তবু জানতে হবে কোথায় ছিল সে তখন। নিশ্চিত হতে হবে। তথ্যটা জানা জরুরী।

পাঁচ

ঠিক দুটোয় বিছানা ছাড়ল মাসুদ রানা। দ্রুত বাইরের পোশাক পরে তৈরি হলো। বিশেষ উদ্দেশে পায়ে দিল নরম সোলের মোকাসিন। ব্রীফকেসের ফল্‌স্ বটম থেকে প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার পি.পি.কে বের করে শোল্ডার হোলস্টারে রেখে তার ওপর কোট পরল। তারপর পায়ে পায়ে এগোল দরজার দিকে।

নিঃশব্দে পাল্লা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল করিডরে। আছে ব্যাটারা। এখন বরং একজন কারাবিনিয়েরি বেশি আছে। করিডরে টহল দিচ্ছে গদাইলস্করী চালে। কাঁধে ইসরাইলের তৈরি মিনি চপগান। অটোম্যাটিক। অস্ত্রটা ছোট, চমৎকার দেখতে। সাবধানে দরজা বন্ধ করল রানা, লক্ করে বেডরুমে চলে এল। আলো নিভিয়ে পিছনের ব্যালকনিতে এল।

সামনের রাস্তায় দুটো প্রাউল কার দেখতে পেল ও, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রন্ট সীটে আবছামত দুটো করে মানুষের কাঠামো যতটা না দেখা যায়, তারচেয়ে বেশি অনুমান করা যায়। টেনে ব্যালকনির দরজা লাগিয়ে দিল রানা। কোমর সমান উঁচু প্যারাপেটে ভর দিয়ে যতদূর সম্ভব সামনে ঝুঁকে উঁকি দিল, ডাইনে-বাঁয়ে দেখে নিল। সবগুলো ব্যালকনি ফাঁকা, আলোও জ্বলছে না কোন স্যুইটে। আরেকবার প্রাউল কার দুটোর ওপর নজর বোলাল।

একটা এগোতে শুরু করেছে। টহল গার্ডদের একজনকেও চোখে পড়ল না। নিচের দূরত্ব ভাল করে মেপে নিল রানা। তিনতলায় ওর স্যুইট, অথচ মাটি থেকে ওর ব্যালকনির দূরত্ব প্রায় ছয়তলার সমান। পুরানো ভবন বলে

প্রতিটা ফ্লোর প্রায় দ্বিগুণ উঁচু এটার।

আল্লার নাম নিয়ে ঝুলে পড়ল ও। নরম সোলের জুতো পরা পা রাখল পিলারের খাঁজে, সাবধানে নামতে শুরু করল। দুই মিনিট পর নিরাপদেই ল্যান্ড করল মাটিতে। আরেকবার দ্রুত ডানে-বাঁয়ে নজর বুলিয়ে নিশ্চিন্তে পা বাড়াল ছায়ায় ছায়ায়। বিনা বাধায় পিছনের সেকেন্ডারী রোডে এসে পড়ল। ফাঁকা রাস্তা। ট্যাক্সির জন্যে ঝাড়া ছয় মিনিট হাঁটতে হলো ওকে। ড্রাইভারকে পারিওলির একটা ঠিকানায় যেতে বলে উঠে পড়ল রানা। জায়গাটা বিসিআইয়ের ব্রাঞ্চ অফিস থেকে যথেষ্ট দূরে।

জায়গামত ট্যাক্সি বিদেয় করে আজও আগের রাতের কৌশল অনুসরণ করল রানা। তার যদিও প্রয়োজন ছিল না। আসার পথে কয়েকবারই পিছনে তাকিয়ে দেখে নিয়েছে আর কোন গাড়ি অনুসরণ করছে কি না। করেনি। সাঙ্কেতিক নকের শব্দে দরজা খুলে দিল সেদিনের সেই যুবক। বিনা বাক্য ব্যয়ে সাদেকুর রহমানের অফিসে এসে বসল ওরা। রানা কাজের কথা পাড়ল।

'ঢাকার কোন মেসেজ?'

'জি না,' মাথা দোলাল হিরণ।

'সাদেকের ডেড বডি?'

'আজই রওনা হয়ে গেল ঢাকা। তাঁর ব্যাপারে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি হেড অফিসে।'

কিছু সময় চুপ করে থাকল রানা। আনমনে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছিল, সেটাকে দমন করল সময়মত।

'কফি, মাসুদ ভাই?'

'দাও।' পকেট থেকে রাহাত খানকে লেখা সাঙ্কেতিক বার্তাটা বের করে এগিয়ে দিল যুবকের দিকে। 'এটা এখনই ঢাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করো। ওখানে এখন অফিস আওয়ার শুরু হয়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছানো সম্ভব, তত ভাল।'

উঠে পড়ল যুবক। 'জি।' খামটা নিয়ে দ্রুত পা বাড়াল কমিউনিকেশনস্ রুমের দিকে। সিগারেট ধরাল রানা, আনমনে টানতে লাগল। সামনের দেয়ালে সাদেকুর রহমানের বড় এক আবক্ষ ছবি ঝুলছে। টগবগে প্রাণবন্ত এক যুবকের ছবি। হাসি হাসি মুখে ওকেই দেখছে। মনে হলো নীরবে ওকে ব্যঙ্গ করছে সাদেক। যেন বলছে, পারলেন না আমাকে রক্ষা করতে, মাসুদ ভাই। পারলেন না। ওরা জিতে গেল। আপনার ওপর অনেক ভরসা ছিল আমার।

চোখ বুজে ফেলল ও। ছবির চোখে চোখ রাখতেও কষ্ট হচ্ছে। জানে এখন সমস্ত সান্ত্বনাই বৃথা, কোনদিন পৌঁছবে না সাদেকের কানে, তবু বিড়বিড় করে বলল, 'তোমাকে যারা এইভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে, তারাও কেউ বাঁচবে না, সাদেক। আমি ওদের ছাড়ব না। প্রতিজ্ঞা করছি আমি।'

পনেরো মিনিট পর ফিরল হিরণ। সাথে দু'কাপ কফি হাতে আরেকজন।

তাকে দরজা থেকে বিদেয় করে দিল যুবক, নিজে বয়ে নিয়ে এল ট্রে। 'ট্র্যান্সমিশন কমপ্লিট,' বলল সে।

কফিতে চুমুক দিল রানা। স্ক্র্যাম্বলার ফোনটা টেনে নিল কাছে। সুযোগ যখন আছেই একটা ফোন করা যাক ঢাকায়। 'আমি থাকব, না বাইরে অপেক্ষা করব?' বলল হিরণ।

'থাকো। এ মিশনে তোমাকে প্রয়োজন হতে পারে আমার।' টপাটপ্ নম্বর পাঞ্চ করতে লাগল রানা। পাওয়া গেল সংযোগ। কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে ভেসে এল রাহাত খানের জলদগম্ভীর 'হ্যালো!'

'এম আর নাইন।'

'মেসেজ পেয়েছি তোমার এইমাত্র। নতুন কিছু?'

মেসেজের পরবর্তী ঘটনা দ্রুত, সংক্ষেপে বলে গেল রানা, বিশেষ করে গতকালকের স্টোরি সেশনের কথা। হোটেলের এক্সট্রা গার্ড ও অয়েল ট্যাঙ্কার সম্পর্কে নিজের সন্দেহের কথা বলতেও ভুলল না। 'আমার সন্দেহ সত্যি হোক চাই মিথ্যে হোক,' বলল রানা, 'সোমবার চ্যানেলে যেন কোন সুপার ট্যাঙ্কার প্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যবস্থা করতে হবে, স্যার। সম্ভব?'

একটু ভেবে উত্তর দিলেন বৃদ্ধ, 'সম্ভব। চলতিগুলো থামিয়ে দেয়া হয়তো সম্ভব হবে না। তবে গতি দ্রুত অথবা ধীর করে চালানোর ব্যবস্থা করা যাবে যদি কোনটার চ্যানেল অতিক্রম করার কথা থাকে ওইদিন।'

'যেভাবে হোক চ্যানেলটা ট্যাঙ্কার-ফ্রী রাখতে হবে সোমবার।'

'রাখা যাবে। আর?'

'খুব সম্ভব সুইস লুগানোর কোন ব্যাঙ্কের সাথে লিট্‌ল প্রফেসরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, স্যার। চেক্ করা জরুরী।' সাদেকের নোটবুকের এক জায়গায় 'L' লেখা দেখে সন্দেহটা জেগেছে।

'ব্যবস্থা করছি।' একটু বিরতি। 'আর হ্যাঁ, "স্যার" বাদে টীমের বাকি চারজন একই জায়গায় বিশ্রাম নিয়েছে দীর্ঘদিন। এ নিয়ে আরও খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, নিশ্চিত হয়ে জানাব পরে।'

'"স্যারের" অবস্থানের খোঁজ পাওয়া যায়নি?'

'এখনও না। জোর চেষ্টা চলছে, জেনে যাব আশা করি।'

নড়েচড়ে বসল রানা। 'কাহিনীকার পল লেন সম্পর্কে জানা গেলে সুবিধে হয়।'

'তোমার কথা রেকর্ড করা হয়েছে। বাদ পড়েনি কোন পয়েন্ট। সব দেখা হবে।'

'এদিকে আরেক সমস্যা দেখা দিয়েছে, স্যার।'

'কি?' গলা সামান্য চড়ে গেল বৃদ্ধের।

'আজ ওদের ল'ইয়ারের সাথে বসতে হবে। কাল-পরশু হয়তো চেক ইস্যু করতে হবে আমাকে।'

'সমস্যা কোথায়? চেক বই তো আছেই, সই করে দেবে।'

'কিন্তু টাকা?'

'সে নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে, আমি দেখব।'

'বেশ। এখন তাহলে রাখছি।'

'সতর্ক থেকো। খুব সতর্ক থেকো। গুড লাক।'

কেটে গেল লাইন। ফোন রেখে খানিক ভাবল কিছু রানা। পকেট থেকে একটা নামের তালিকা বের করল। কাল লাঞ্চের সময় রেস্টুরেন্টে উপস্থিত অতিথিদের অনেকের নাম লিখে এনেছে ও, সেই তালিকা। 'এতে যাদের নাম রয়েছে, প্রত্যেকের ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে হবে তোমাকে,' বলল রানা। 'যতজনকে প্রয়োজন কাজে লাগিয়ে দাও। প্রয়োজনে আমাদের যে কোন ব্রাঞ্চের সাহায্য চাইতে পারো।'

'জি,' মাথা দোলাল হিরণ। দ্রুত এক নজর দেখে নিল তালিকাটা। 'এখন কি হোটেলে ফিরবেন? বলেন তো গাড়ি নিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসি কিছুদূর।'

কি যেন ভাবল রানা। মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে। 'পরে। আলো ফুটলে।'

'জি?' বিস্ময় ফুটল যুবকের চেহারায়। 'কিন্তু ওরা যদি দেখে ফেলে?'

'আমি চাই দেখুক ওরা।'

বোকার মত তাকিয়ে থাকল হিরণ। 'বুঝলাম না। দেখে ফেললে···'

'ট্র্যাক স্যুট আছে না তোমার?' যুবককে দেখল রানা। লম্বায় চওড়ায় প্রায় ওরই সমান সে।

'জি, আছে।'

'কেডস্?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'নিয়ে এসো ওগুলো। আর, আরেক কাপ কফি দিতে বলো। আমি একটু জিরিয়ে নিই।'

চেহারায় বিস্ময় নিয়ে আসন ছাড়ল হিরণ। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দেখল রানাকে। ও তখন সাদেকের গদিমোড়া চেয়ারে আয়েশ করে বসেছে গা ছেড়ে দিয়ে। চোখ বোজা।

বেশ আলো হয়ে গেছে। আধ মাইলটাক ধীর গতিতে দৌড়ে জায়গামত পৌঁছল রানা, ভাবখানা যেন জগিং করতে বেরিয়েছিল। ততক্ষণে ঘামে ভিজে উঠেছে পরনের ট্র্যাক টপ। দু'চারটে গাড়ি সবে বের হতে শুরু করেছে পথে। ওর মত স্বাস্থ্য সচেতন জগারও আছে কিছু।

পিয়াযযা ডেলা রিপাবলিকাকে অর্ধেকটা চক্কর দিয়ে হোটেল লে সুপারবের দিকে তাকাল। সামনের বড় রাস্তায় বেশ কিছু অলিভগ্রীন পুলিস কার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কয়েকটা রায়ট স্কোয়াড পার্সোনেল ক্যারিয়ার ও একটা অ্যাম্বুলেন্সও আছে। শেষেরটার মাথায় ধীরগতিতে, নিঃশব্দে ঘুরছে ব্লিংকার লাইট।

গেট দিয়ে ঢোকার মুখে বাধা দেয়া হলো রানাকে। দুই পুলিস সার্জেন্ট দ্রুত কাছে এসে দুই বাহু চেপে ধরল ওর। 'কোথায় যাচ্ছেন, সেনিয়র?'

ভারি বিস্মিত হয়েছে যেন, এমন চেহারা করে লোক দুটোকে দেখল ও। 'কেন, আমার স্যুইটে!'

'আপনার স্যুইট!' বলে উঠল এক অফিসার। বিস্ময় প্রকাশে সে-ও কম যায় না দেখা গেল। রানার আপাদমস্তক চোখ বোলাল লোকটা।

'কোন হোটেল!' বলল আরেকজন। 'কত নম্বর স্যুইট?'

'ডকুমেন্টি!' দাবি জানাল প্রথম অফিসার। 'ক্রেডেনশিয়ালস্! পাসপোর্ট! আইডেন্টিটি!'

'কি মুশকিল! জগিং করতে কেউ ওসব নিয়ে বের হয় নাকি? ওসব তো রুমে রেখে বেরিয়েছি।'

ভিড় একটু একটু করে বাড়ছে ওদেরকে ঘিরে। 'কখন বের হয়েছেন আপনি, সেনিয়র?'

'এই তো, ঘণ্টাখানেক।'

'কই, আমাদের কারও চোখে পড়ল না তো ব্যাপারটা!'

চোখমুখ কোঁচকাল ও। 'সে দোষ কি আমার?'

'কত নম্বর স্যুইট আপনার?'

এইবার খেপে উঠল মাসুদ রানা। 'মুসিবতের কথা! আপনারা এমনভাবে জেরা করছেন যেন আমি কোন মহা অন্যায় করে ফেলেছি বের হয়ে। রীতিমত ভিড় জমিয়ে ফেলেছেন রাস্তায়। একজন নিরীহ বিদেশীর সাথে এ কেমন আচরণ আপনাদের?'

'সরি, সোনিয়র!' ফ্রিজের পানি হয়ে গেল প্রথম অফিসার। 'রিয়েলি সরি। এই হোটেলে এ মুহূর্তে অনেক দেশী-বিদেশী ভিভিআইপি অবস্থান করছেন বলে বিশেষ গার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেশ চাপের মুখে আছি আমরা। মাফ করবেন, সেনিয়র, আপনার স্যুইট নাম্বারটা যদি বলেন···'

এদের কারও জানা নেই, এরমধ্যে সামনের জটলার কারণ ঘুম থেকে তুলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে পিয়েরো সিমকাকে। কন্টিকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে সে। সদ্য ঘুম ভাঙা চেহারায় দু'জনেরই বিভ্রান্তির ছাপ।

'সার্জেন্ট ব্লানডি!' ছোটখাট বিস্ফোরণের আওয়াজ বের হলো সিমকার গলা দিয়ে। 'সার্জেন্ট ইভারনো! ছেড়ে দিন ওঁকে। ভদ্রলোক আমাদের টীম মেম্বার।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঝাঁকি খেয়ে সোজা হয়ে গেল দুই অফিসার। খুব দ্রুত এক পা করে সরে দাঁড়াল রানার কাছ থেকে। 'সি, সি, সেনিয়র! সি!' বলল প্রথম অফিসার, ব্লানডি। সসম্মানে নড করল ওকে। 'সরি, সেনিয়র! এক্সট্রিমলি সরি।'

ছোট ছোট ব্যস্ত পায়ে রানার সামনে এসে দাঁড়াল সিমকা। 'কখন বের হলেন আপনি?'

'ঘণ্টাখানেক আগে। তখন কি আর জানতাম বের হলে এই পরিস্থিতিতে পড়তে হবে?'

'পরিস্থিতির জন্যে এদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, ঠিকই করেছে এরা,'

চিন্তিত কণ্ঠে বলল লোকটা। খবরটা সময়মত তাকে জানানো হয়নি কেন ভাবছে বোধহয়। 'আমাদের ইউনিটের প্রত্যেকের নিরাপত্তার জন্যেই এদের নিয়োগ করা হয়েছে এখানে। আপনি জানেন না কি করেছেন আপনি। ভাগ্য ভাল কোন ক্ষতি হয়নি আপনার।'

এতক্ষণ নীরবে রানাকে দেখছিল কন্টি অদ্ভুত চোখে। 'আপনি বের হলেন কি করে? কেউ বাধা দেয়নি?'

'নাহ্!' নির্বিকার চেহারা রানার। 'কেউ তো কিছু বলেনি।'

'সে পরে দেখব,' শীতল কণ্ঠে বলল সিমকা। 'এখন ভেতরে চলুন, সেনিয়র। আপনি জানেন না রোম কত ভয়ঙ্কর শহর। গার্ড ছাড়া একা এক আমেরিকান মিলিয়নেয়ারের পথে বের হওয়া, তাও অন্ধকারে··· ওহ্ গড!'

'এতসব ভেবে দেখিনি বের হওয়ার সময়। ভোরে এক্সারসাইজ করা বহুদিনের অভ্যেস। গত দু'দিন করতে পারিনি বলে গা ম্যাজ-ম্যাজ করছিল, তাই আজ বের হয়েছিলাম।' পালা করে ওদের দু'জনকে দেখল রানা। দু'জনেই ভীষণ গম্ভীর। 'কিন্তু আপনাদের উদ্বিগ্ন দেখে মনে হচ্ছে বোধহয় ভুলই করে ফেলেছি। সরি।'

'মারাত্মক ভুল করেছেন,' আগের চেয়েও শীতল গলায় বলল পিয়েরো সিমকা। 'আমি একজন সিনেটর। আমার এক বিদেশী অতিথির যদি আমারই দেশে মৃত্যু হত, কতবড় ফলস্ পজিশনে পড়ত ইটালি সরকার ভাবুন তো একবার!'

উত্তর দিল না রানা। 'যা হওয়ার হয়েছে,' বলল কন্টি। 'আর কখনও এমন কাজ করবেন না যেন, সেনিয়র।'

'পাগল নাকি?' সমঝদারের মত মাথা দোলাল ও। 'আবারও?'

একেবারে স্যুইট পর্যন্ত রানাকে পৌঁছে দিয়ে গেল সিমকা-কন্টি। তাদের সাথে এলিভেটর থেকে রানাকেও বের হতে দেখে যে বিস্ময় ফুটতে দেখা গেল কারাবিনিয়েরিদের চেহারায়, তা বর্ণনাতীত। শব্দ করে হেসে উঠতে ইচ্ছে হলো ওর।

'যান,' বলল কন্টি। 'রেস্ট করুন গিয়ে। আজকের প্রোগ্রাম মনে আছে তো সব?'

'শিওর।'

'গুড।'

দরজা খুলে যখন ভেতরে ঢুকছে রানা, পিঠের ওপর কয়েক জোড়া দৃষ্টি সেঁটে আছে বুঝতে পেরে কেমন এক শিরশিরে অনুভূতি জাগল বুকের ভেতরে। প্রথমেই ব্যালকনিতে যাওয়ার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল ও। আস্তে খুলল দরজা। ছোট্ট এক খণ্ড কাগজ শূন্যে পাক খেতে খেতে মেঝেতে পড়ল। দরজার ফাঁকে গোঁজা ছিল ওটা। নিশ্চিন্ত মনে দরজা লাগিয়ে বাথরুমের দিকে এগোল রানা। আজ তাহলে কেউ সফরে আসেনি।

অনেক সময় নিয়ে শাওয়ার সারল ও, শেভ করল। একদম ঝরঝরে, তরতাজা হয়ে বেরিয়ে এসে টেলিফোনে তিনজনের সমান নাস্তার অর্ডার দিল।

তারপর আপনমনে গুন্ গুন্ করে গান গাইতে বসল। গার্ড বসাবার আর যত কারণই থাক, ভাবছে রানা, একটা যে ওকে নজরবন্দী রাখা, তাতে আর কোন সন্দেহই রইল না। ও সবার অজান্তে বেরিয়েছিল জানতে পেরে চোখমুখের যে খেল্ দেখিয়েছে সিমকা ও কন্টি, তাতে পরিষ্কার লেখা ছিল সে কথা।

যেতে দেখলে বাধা ওরা দিত না নিশ্চয়ই। সময়মত খবরটা পৌঁছে দিত কেবল জায়গামত, এবং অনুসরণ করা হত রানাকে। ও কোথায় কোথায় যায়, কার সাথে দেখা করে, হয়তো জানতে আগ্রহী সিমকা। রুমে বসে কারও সাথে কথা বললে তা শোনার ব্যবস্থা তো করেই রেখেছে। কাজেই ঘর নিয়ে তার কোন চিন্তা ছিল না। ছিল 'বার' নিয়ে।

কিন্তু কেন? রানার বিরুদ্ধে ওদের এই গোয়েন্দাগিরি কেন? কিছু টের পেয়েছে ওরা? মনে হয় না। তাহলে? টীমে ও একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল বলে? মেলে না। নকের শব্দে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল ওর। রুম সার্ভিস। প্রকাণ্ড এব ট্রলি ট্রে উপ্‌চে পড়া ব্রেকফাস্ট নিয়ে হাজির হলো এক বয়।

সে বেরিয়ে যেতে খাবারের ওপর হামলে পড়ল ও। খাওয়া শেষ হতে ঢেকুর ছাড়ল তৃপ্তির। পট থেকে কফি ঢালছে, এই সময় আরেক বয় এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল। ক্যামিলা ক্যাভোর পাঠিয়েছে। পড়ল ওটা রানা। সম্বোধন নেই, নিচে সইও নেই।

তুমি একটা আস্ত বর্বর, অসভ্য। কাল বেশ ক্ষতি করেছ তুমি আমার মসৃণ ত্বকের (দেখা যায় না অবশ্য)। কিন্তু তাই বলে তোমাকে ছেড়ে দেব ভেব না যেন। এর প্রতিশোধ আমি নেব। আমার মেকআপে যে বাড়তি কয়েকশো হাজার লিরা খরচ হবে, তার দায় তোমাকেই নিতে হবে। হো!
পুনঃ রাতে এতবার ফোন করলাম, সাড়া দিলে না কেন? জরুরী কাজে বাইরে যাচ্ছি। দুপুরে স্টুডিওতে দেখা হবে। চিয়াও, ক্যারো।

শুয়ে খানিক আকাশ-পাতাল ভাবল রানা। হোটেলের সার্ভ করা গোটা তিনেক ইংরেজি দৈনিকে চোখ বোলাল। সবগুলোই স্থানীয় দৈনিক। প্রতিটিতে ডি-ডে'র ইউনিটের তৎপরতার বেশ কয়েকটা করে ছোট-বড় খবর ছাপা হয়েছে।

দশটায় উঠল ও। কাপড় বদলে তৈরি হয়ে নিল বের হওয়ার জন্যে। সোয়া দশটায় কন্টির ল'ইয়ারের সাথে প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট ওর। কাগজপত্রসহ অপেক্ষা করছিল লোকটা। প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময়ের পর কাজে লেগে গেল দু'জনে। অসংখ্য ধারা-উপধারায় ঠাসা ঢাউস দুই সেট ডকুমেন্ট পড়তে দেয়া হলো ওকে। এসব পড়া না পড়া সমান। পড়ে লাভ নেই, না পড়লেও লোকসান নেই। তবু ল'ইয়ারকে সন্তুষ্ট করার জন্যে পড়ল রানা। মাঝেমধ্যে এক-আধটা পয়েন্ট নির্দেশ করে তার ব্যাখ্যাও জানতে চাইল।

অবশেষে সন্তুষ্ট চেহারায় সই করল দলিলে। পাঁচ মিলিয়ন ডলারের চেক লিখে তুলে দিল ল'ইয়ারের হাতে। ওটা নেয়ার সময় লোকটাকে হাসতে দেখে রানাও হাসল, অবশ্য মনে মনে।

কাজ সেরে স্যুইটে ফিরল সাড়ে বারোটায়। আপাতত হাতে কাজ নেই। অতএব দেহ ও মনকে বিশ্রাম দেয়া যায় কিছুক্ষণ। প্রথমটা হলেও পরেরটা হলো না। আসা যাওয়ার পথে নতুন একদল গার্ড দেখেছে ও বাইরে। সেটা অবশ্য পালাবদলের কারণে হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সিমকা, কন্টি বা ওদের আর কাউকে দেখতে পায়নি রানা, কেন? কোথায় ওরা সবাই?

দুপুরের শিডিউল রক্ষার জন্যে একটায় আবার বের হলো মাসুদ রানা। এবারও তাদের কাউকে দেখা গেল না। মনযা রুমে ও একা লাঞ্চ খেল। তারপর বাইরে ওর জন্যে অপেক্ষমাণ লিমোতে উঠল। গাড়ি ছেড়ে দিল শোফার লরেনযো কন্টি এম্পায়ারের উদ্দেশে। সেদিনের সেই তার কাঁটার ফেন্স ঘেরা এলাকার মধ্যেই তার স্টুডিও। প্রথমবার রাতে এসেছিল বলে ধারণাই করতে পারেনি রানা কতবড় এলাকা ওটা।

তিন ওয়্যারহাউসের পিছনে তিনদিকেই দিগন্ত বিস্তৃত ধু-ধু তেপান্তরের মাঠ। তার প্রায় সর্বত্র মাকড়সার জালের মত বিছিয়ে আছে সরু সরু পাকা রাস্তা। ভেতরে গাছপালা আছে প্রচুর। আর বড় বড় অনেকগুলো স্থাপনা। এতদূরে যে খালি চোখে দেখে বুঝতে পারল না রানা ওগুলো কি। চলতি গাড়ি থেকে বড় এক খাঁচার মধ্যে কম করেও গোটা বিশেক দানবাকৃতির কুকুর দেখতে পেল ও। দিন বলে আটকে রাখা হয়েছে।

ওগুলো জার্মান। নীল গায়ের রঙ। ওবেরশোয়াবেন উলফহাউন্ড।

রানার চেনা সমস্ত কুকুরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, সবচেয়ে দ্রুত। একই বয়স ও ওজনের একটা অ্যালসেশিয়ানকে মাত্র দশ মিনিটে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলতে পারে উলফহাউন্ড। শিকারের দেহের একটাইমাত্র জায়গা পছন্দ ওদের, কণ্ঠনালী। স্বচক্ষে এদের নরহত্যা করতেও দেখেছে ও।

লিমো খাঁচা অতিক্রম করার সময় মনের আনন্দে হাঁক ছাড়ল ওদের কয়েকটা। জানালায় কাঁচ তোলা থাকায় ভেতরে তেমন এল না আওয়াজ, কিন্তু হাঁক ছাড়ার যে ভঙ্গি দেখল, তাতেই গায়ে কাঁটা দিল ওর।

মাঝারি গতিতে পাঁচ মিনিট একটানা চলার পর বড় কয়েকটা শহরের মডেলের কাছে পৌঁছে থামল লিমো। প্রথমেই লন্ডনের ট্রাফেলগার স্কোয়্যার চোখে পড়ল রানার। হুবহু এক। ওপাশে আমেরিকার স্ট্যাচু অভ লিবার্টি সগর্বে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। অনেক দূরে ক্রেমলিন প্রাসাদের একাংশ দেখল রানা। এখনও কাজ চলছে। তার সামনেই পাহাড় সমান উঁচু হয়ে আছে বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী। সাদা হেলমেট মাথায় দেয়া নির্মাণ শ্রমিকরা মহাব্যস্ত। ডি-ডে'তে ধ্বংস দেখানো হবে এ সবের।

ওকে দেখে এক হুডহীন জীপ নিয়ে এগিয়ে এল কন্টি ও তার এইডস-ডি-ক্যাম্প। আকার ও গঠনে আস্ত এক ষাঁড় যেন লোকটা। আন্দালুসিয়ান ষাঁড়।

'আসুন, সেনিয়র,' হাসিমুখে রানাকে অভ্যর্থনা জানাল কন্টি। সকালের গাম্ভীর্যের কোন আভাসই নেই চেহারায়। যেন কিছুই ঘটেনি অস্বাভাবিক, সব ঠিকঠাক। 'আপনাকে আমাদের সংগ্রহ করা কিছু গ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট দেখিয়ে আনি।'

জীপে উঠে পড়ল ও। আবার চলা। মিনিট পাঁচেক পর খোলামেলা ফার্মল্যান্ডে পৌঁছল ওরা। এখানেও সেই একই ব্যাপার লক্ষ করল রানা। সর্বাধুনিক মার্কিন ট্যাঙ্ক, মোবাইল ফ্লেমথ্রোয়ারসহ অনেক কিছু আছে এখানে যার কিছু কিছু নিঃসন্দেহে ক্লাসিফায়েড লিস্টের। ইউএস নেভির কয়েকটা কন্টার দেখল ও। গায়ে সপ্তম নৌবহরের সীল। এছাড়া ন্যাটোর কিউট ট্রিক্, ইজরাইলের তৈরি কিছু হিট্ অ্যান্ড রান আর্মার্ড স্পীডবোটও রয়েছে ওর মধ্যে।

আর কি আছে এদের হাতে? টোমাহক মিসাইলের ফর্মূলা? থাকতেও পারে, ভাবল ও। এদের অন্তত দু'জনের যে রাজনৈতিক প্রভাব, তাতে ও জিনিস জোগাড় করাও হয়তো কঠিন কিছু না কন্টির জন্যে। আধ ঘন্টার মত ওখানে কাটাল ওরা, সবকিছু ঘুরিয়ে দেখানো হলো রানাকে। তারপর ফিরে চলল জীপ। মেইনগেটের কাছের দৈত্যাকার তিন ওয়্যারহাউস পেরিয়ে স্টুডিওর বিশাল প্রশাসনিক ভবনের সামনে এসে থামল।

ভবনের পিছনের খোলা মাঠে দানবীয় আকৃতির অনেকগুলো চোদ্দ চাকার ফ্ল্যাট ক্যারিয়ার দেখতে পেল রানা। ওর একটা একইসঙ্গে অন্তত চারটে ট্যাঙ্ক বহন করতে পারে। 'ও দুটোর মধ্যে কি আছে?' দু'পাশের অদেখা দুই ওয়্যারহাউস ইঙ্গিত করল রানা।

'ওহ্, ওগুলোয়?' হাসল কন্টি। 'আগে যেসব ছবি তৈরি করেছি, সেগুলোর যাবতীয় মালপত্র। ভাবছি ভবিষ্যতে ও দুটোকে জাদুঘর বানাব।'

সে না হয় বানিয়ো, মনে মনে বলল রানা, কিন্তু আমি ততদিন অপেক্ষা করতে পারব না। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই ঢুকব বিনা টিকেটে। বিল্ডিঙের বিশাল হলরুমে অনেকের মাঝে আর সব মহারথীকে হাজির দেখল ও। 'আসুন, আসুন!' সাদর অভ্যর্থনা জানাল স্যার হিউ মারসল্যান্ড। সিমকা মিটিমিটি হাসছে। তার একপাশে রয়েছে ক্যামিলা, অন্যপাশের আসন শূন্য। 'কেমন দেখলেন আমাদের শূটিং গ্রাউন্ড?' জানতে চাইল হিউ।

'চমৎকার এবং অবিশ্বাস্য,' বলল রানা। 'আমি ভীষণ প্রভাবিত হয়েছি। একদম ন্যাচারাল।'

'ন্যাচারালি,' দারুণ সন্তুষ্ট চেহারায় বড়সড় মাথাটা দোলাল হিউ। 'সেট পরিকল্পনার ব্যাপারে স্টাডস ম্যালোরি এক সুপার জিনিয়াস, আই টেল ইউ, স্যার।'

মাথা দোলাল ও। 'তাই তো দেখলাম। সত্যি চমৎকার হয়েছে।'

'থ্যাঙ্কিউ,' নড করল পরিচালক।

নিজের পাশের শূন্য আসন দেখাল ওকে সিমকা 'আসুন, সেনিয়র বসুন ও কিছু দেখাবে আমাদের কম্পিউটরে।'

এ-ও একদম স্বাভাবিক, বিস্ময় চেপে রেখে ভাবল রানা। মনে হলো সকালের কথা ভুলেই গেছে বুঝি। হঠাৎ একটা সন্দেহ জাগল মনে। এরা সবাই এখানে, অথচ শোফার ব্যাটা একা ওকে নিয়ে গেল গ্রাউন্ড দেখাতে, কেন? সবার এক সাথে যাওয়াই কি স্বাভাবিক ছিল না প্রথম রাতের মত? নাকি এর মধ্যে কোন বার্তা আছে? এরা আসলেই জেনে গেছে রানার পরিচয়? জেনেশুনে তামাশা করছে? বোঝাতে চাইছে তোমাকে আমরা কেয়ার করি না? আমরা আমাদের পরিকল্পনামত এগোব, তুমি পারলে ঠেকাও?

রানা বসতে হাঁক ছাড়ল ম্যালোরি, 'ইজল্যাম! কামন!'

ওপাশের এক চেয়ারে বসে ছিল গর্দানহীন মানুষটা, উঠে এল। সবার নজর তার ওপর নিবদ্ধ বুঝতে পেরে যেন লজ্জা পেল, লাল হয়ে উঠল নাকমুখ। একটা টেপ ম্যালোরির হাতে তাড়াতাড়ি ধরিয়ে দিয়েই পালিয়ে বাঁচল যেন সে। সবার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে টেপ ধরা হাত শূন্যে দোলাল পরিচালক।

'আমার নির্দেশ অনুযায়ী বন্ধু ইজল্যাম এটা তৈরি করেছে। একটা যুদ্ধের দৃশ্য আছে এতে। ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি আর দুই দল সৈন্যের লড়াই। দেখুন আপনারা।' টেপটা বড় পর্দার এক কম্পিউটরে ফীড করল সে। পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এল রূমে। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে নির্দিষ্ট সুইচ পাঞ্চ করল। পরমুহূর্তে গোটা নরক যেন ভেঙে পড়ল হলরূমের মধ্যে।

পাহাড় ঘেরা ছোট এক গ্রাম। পাহাড়ের ওপরের প্রায় সবদিক থেকে ভারী কামানের সাহায্যে তার ওপর তুমুল গোলাবর্ষণ চলছে। এদিকে গ্রামের ফসলের খেতে প্রায় মুখোমুখি লড়াই চলছে দুই দল সৈন্যের মধ্যে; তার মধ্যে দিয়ে হুড়মুড় করে ছুটছে ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি। ধুলা আর ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন। বিকট গুম গুম শব্দে ফুটছে কামানের গোলা। ট্যাঙ্কের আর হেভি মেশিনগানের মুহুর্মুহু হুঙ্কারে কানে তালা লেগে যাওয়ার দশা।

নকল সৈন্যরা মরছে কাতারে কাতারে, গ্রামবাসীরা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক পালাচ্ছে। তারাও মরছে বেশুমার। একটু পর আকাশে উদয় হলো এক ঝাঁক বোমারু, শুরু হয়ে গেল ভারী বোমাবর্ষণ। মাত্র তিন মিনিটের দৃশ্য। শেষ মুহূর্তে স্টিল হলো দৃশ্য। সারাপর্দা জুড়ে ভাসছে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন। লাশের ছড়াছড়ি।

'একবার ভেবে দেখুন,' বলল ম্যালোরি। 'এই একটি ছোট্ট দৃশ্য বড় পর্দায় কেমন দেখাবে? থাক, আপনাদের কল্পনা করতে হবে না। আমি দেখাচ্ছি কেমন দেখাবে।'

এক মিনিট পর টিভি টেপ মনিটরের সাহায্যে দেয়ালে ঝোলানো স্থায়ী পর্দায় দৃশ্যটা নতুন করে দেখল সবাই। মনে মনে হেদায়েতের জাদুকরী বিদ্যার প্রশংসা না করে পারল না মাসুদ রানা। এত বাস্তব, এত জান্তব হয়েছে পুরো সীনটা, চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না। এরচেয়ে বাস্তব হতেই পারে না, ভাবছে ও। গুলি খেয়ে মানুষের পড়ে যাওয়া, তাদের যন্ত্রণাকাতর মুখে পেশীর

কুঞ্চন, সাহায্যের জন্যে অসহায় অক্ষতদের দিকে হাত বাড়ানোর দৃশ্যগুলো এক কথায় বাস্তবের চাইতেও বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে।

'মূল ছবির জন্যে এসবের মাঝে ক্লোজ শটে নেয়া আরও প্রচুর দৃশ্য জুড়ে নেয়া হবে,' বলল ম্যালোরি। 'সে সব দৃশ্য আমাদের নিজেদের তৈরি সেটে শূট করা হবে। তখন,' নাটকীয় বিরতি দিল সে। 'এই ছবি দেখার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠবে সারা পৃথিবীর দর্শক।'

একটু পর কফি অথবা ড্রিঙ্কের সাথে হাল্কা খাবার পরিবেশন করা হলো অতিথিদের। সিমকা, ক্যামিলা, স্যার হিউ, ম্যালোরি ও মাসুদ রানা বসল এক টেবিলে। নায়িকা এ মুহূর্তে একটু গম্ভীর। বরং পিয়েরো সিমকাকে হাসিখুশি দেখাচ্ছে। সকালে রানার পুলিসের হাতে পাকড়াও হওয়ার বিষয় নিয়ে ওকে খোঁচাল সে খানিক। ক্যামিলার সাথে হাসাহাসিও করল।

কফি অর্ধেক শেষ হয়েছে, এই সময় এক ফুটম্যান একটা টেলিফোন সেট নিয়ে এল। 'আপনার ফোন, সেনিয়র,' রানাকে বলল সে।

'আমার?' ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে গেল ও।

'সি, সেনিয়র।'

রিসিভার নিল রানা। না তাকিয়েও বুঝল সবাই ওকেই লক্ষ করছে। 'হ্যালো! কে বলছেন?'

'সেনিয়র রানা? আমি রোজানা মোরান্ডি।'

দম আটকে এল ওর। সাদেকের বান্ধবী এখানে ওকে খুঁজে পেল কি করে ভেবে পেল না কিছুতেই। অজানা এক অমঙ্গল আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল।

'ও আচ্ছা। হ্যালো, কেমন আছেন?' কণ্ঠে নিরাসক্ত ভাব ফোটাবার চেষ্টা করল রানা। যদিও খুব একটা কাজ হয়েছে বলে ভরসা হলো না।

'আপনাকে খুব জরুরী একটা কথা বলার ছিল। কথাটা বলার জন্যে সেনিয়র হিরণকে ধরার অনেক চেষ্টা করেছি, পেলাম না ওঁকে। এদিকে আজ রাতে আমার ফ্লাইট। খবরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, নইলে যোগাযোগ করার ঝুঁকি নিতাম না। ফোন করে হয়তো আপনাকে অসুবিধেয় ফেলে দিলাম। কিন্তু আর কোন...'

'বুঝেছি,' বাধা দিল রানা। 'তা কখন সই করতে হবে ডীডে?'

থমকে গেল রোজানা। 'জ্বি, কি বললেন?'

'মুশকিলে ফেলে দিলেন, সাহেব। আমি একটা পার্টিতে অ্যাটেন্ড করছি, এখন তো আসা সম্ভব নয়।'

বেশ কিছু সময় চুপ করে থাকল মেয়েটি। 'বুঝেছি, আশেপাশে অন্যরা রয়েছে বলে কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে আপনার।'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। এঁরা আমার নতুন ব্যবসায়িক পার্টনার, এঁদের ছেড়ে এই মুহূর্তে চলে আসাটা রীতিমত অভদ্রতা হয়ে যাবে।'

'তাহলে...খবরটা জানাই কি করে?' আনমনে নিজেকে প্রশ্ন করল সে। 'আমি ফিরতে...'

'কি বললেন যেন অয়েল ফিল্ডের নাম? কোথায়? ও, সৌদি আরবে? তা

ইয়ে, এক কাজ করুন না, কাগজপত্র যা যা আছে, সব নিয়ে আমার হোটেলে চলে আসুন ঠিক সাড়ে ছটায়। আমি চেক করে দেব। ডেস্কে গ্যারি কারের কথা বললে ওরা আপনাকে আমার স্যুইটে পৌঁছে দেবে। ওকে?'

'সাড়ে ছটায়?'

'হ্যাঁ। ওই সময়ে হলে ভাল হয়।'

'ঠিক আছে। আমি থাকব।'

ফোন রাখতে পেরে বাঁচল যেন রানা। সিমকা ও ক্যামিলার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আর বলবেন না, এক তেল ব্যবসায়ী। কোথাও গিয়ে যদি একটু শান্তিতে থাকা যায় এদের জ্বালায়,' শেষটুকু আপনমনে গজ গজ করে বলল।

একজনও কিছু বলল না। দেখে মনে হলো শোনেইনি। পনেরো মিনিট অস্থির চিত্তে অপেক্ষা করল ও, তারপর মেন'স রুমে যাওয়ার কথা বলে ক্ষমা চেয়ে আসন ছাড়ল। যাওয়ার পথে এক পে ফোন থেকে হোটেলে যোগাযোগ করল, ডেস্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জানিয়ে অনেকটা স্বস্তি বোধ করল। প্রয়োজন ছিল না, তবু মেন'স রুম ঘুরে এসে দলের সাথে যোগ দিল। একটু পর শেষ হলো পার্টি। ক্যামিলা যাবে তার ভয়েস কোচের কাছে চার ঘণ্টার সেশনে যোগ দিতে। তাকে নিয়ে চলে গেল সিমকা।

রওনা হওয়ার আগে সন্ধের পর মনযা রুমে তার থ্রো করা ডিনার পার্টিতে রানাকে যোগ দেয়ার অনুরোধ জানাতে ভুলল না লোকটা। তখন সবে পাঁচটা, তাই ফেরার জন্যে খুব একটা ব্যস্ত হলো না রানা। তাছাড়া কন্টি ওকে তার গাড়িতে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে, অতএব ধীরেসুস্থে আরেক কাপ কফি খেল ও।

কাজ সম্পর্কে একে-তাকে হাজারো নির্দেশ-পরামর্শ দিয়ে প্রযোজক যখন ফ্রী হলো, তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা। শহরে ফিরে চলল ওরা। পথে এটা-ওটা নিয়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল কন্টি, কিন্তু রানাকে অন্যমনস্ক দেখে ক্ষ্যান্ত দিল এক সময়। অফিস ছুটি পরবর্তী রাশ ঠেলে হোটেলে পৌঁছতে সোয়া ছয়টা বেজে গেল।

ডেস্কে খোঁজ নিল রানা ওর কোন গেস্ট এসেছে কি না। জানা গেল এসেছে। নির্দেশ অনুযায়ী তাকে ওর স্যুইটে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এলিভেটর থেকে বের হতে সিমকার মোতায়েন করা কারাবিনিয়েরি হাসি দিল ওকে দেখে। 'আপনার এক গেস্ট এসেছেন, সেনিয়র,' বলল সে। ইঙ্গিতে ওর বন্ধ দরজা দেখাল। 'ভেতরে আছেন।'

'ধন্যবাদ।'

ভেতরে ঢুকল রানা। সামনের দরজা লক করে দ্রুত পায়ে এগোল। মৃদু কণ্ঠে ডাকল মেয়েটির নাম ধরে। সাড়া এল না। আবার ডাকল ও, তবু সাড়া নেই। বেডরুমের দিকে এগোল। গেল কোথায়? বাথরুমে? দোরগোড়ায় পৌঁছতে গলা দিয়ে আপনাআপনি এক বিস্ময়ধ্বনি বেরিয়ে এল ওর। থেমে পড়ল চট্ করে।

বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে আছে মেয়েটি। অনড়। হুঁশ ফিরতে দ্রুত এগোল রানা। 'রোজানা!'

আবার থমকে দাঁড়াতে হলো। সুন্দর গলাটা এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত হাঁ হয়ে আছে মেয়েটির। জবাই করা হয়েছে ওকে। রক্তে ভেসে গেছে বিছানা। হাত দিয়ে দেখল ও এখনও গরম আছে দেহটা।

ছয়

ভীষণ আফসোস হলো। নিজেকে ধিক্কার দিল রানা। মেয়েটির মৃত্যুর জন্যে আর কেউ নয়, ও নিজে দায়ী। রানাই হত্যা করেছে ওকে। রোজানা পিয়েরো সিমকার খুব চেনা, কথাটা ভুলে গিয়ে চরম বোকামি করে ফেলেছে, আর ওর ভুলের মাসুল জীবন দিয়ে শোধ করে গেল হতভাগ্য মেয়েটি। হতবিহ্বল চোখে নিজের হাতের দিকে তাকাল ও, বেখেয়ালে ভাবল, যে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে রোজানাকে জবাই করা হয়েছে, সেটা বোধহয় ওরই হাতে রয়েছে এখনও।

কে করেছে কাজটা? কার হাতে খুন হলো রোজানা মোরান্ডি? কি জরুরী খবর দিতে এসেছিল সে ওকে? মস্তিষ্কের ধোঁয়াটে ভাবটা দ্রুত কেটে যেতে শুরু করল। ব্যস্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল রানা। কোন্ পথে এসেছে খুনী? আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল সে রুমে, না রোজানা পৌঁছার পরে এসেছে?

প্রথম প্রশ্নের জবাব অল্পক্ষণেই পেয়ে গেল ও। ব্যালকনির দুটো জানালার একটা খোলা। অথচ স্পষ্ট মনে আছে, বের হওয়ার সময় দরজা-জানালা বন্ধ আছে কি না ভালমত চেক করেই বের হয়েছিল রানা। কোন সন্দেহ নেই।

চরম ভুল হয়ে গেছে, মৃত রোজানার সুন্দর, কমনীয় মুখটার দিকে তাকিয়ে আপনমনে মাথা দোলাতে লাগল ও, মহা ভুল হয়ে গেছে। এমন কিছু ঘটতে পারে আগেই বোঝা উচিত ছিল।

পিয়েরো সিমকা!

একটাই নাম মনে জাগল মাসুদ রানার। এ কাজ ওই বামুন হারামজাদার না হয়েই যায় না। স্টুডিওতে রানা যখন মেন'স রুমে গেল, তখন নিশ্চয়ই সে ফুটম্যানকে ডেকে জেনে নিয়েছে কে করেছে ফোন। ওর আগের সন্দেহ যদি ঠিক হয়, যদি আগেই সিমকা ওর পরিচয় জেনে গিয়ে থাকে, এক মেয়ে করেছে শুনেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। কারণ রোজানা যে সাদেকের বান্ধবী ছিল, এ কথা সিমকার অজানা থাকার কথা নয়।

হয়তো এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যেই হঠাৎ ক্যামিলার ভয়েস কোচের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাকে নিয়ে কায়দা করে সরে পড়ে সে। কন্টির সাথে লোকটার কি কথা হয়েছে কে জানে, তখন খেয়াল না করলেও এখন রানা পরিষ্কার বুঝতে পারছে ওকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যেই

স্টুডিওতে কাজের নামে অহেতুক সময় নষ্ট করেছে সে। আর এদিকে হোটেলে চলে এসেছে সিমকা, হয়তো আড়াল থেকে দেখে নিশ্চিত হতে চেয়েছে কে দেখা করতে আসছে রানার সাথে।

এবং রোজানাকে দেখামাত্র করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। কাজও করেছে সেইমত।

মাথা দোলাল রানা। ঠিক তাই। কোন ভুল নেই। ওর ভাবনার লাইনে ধোঁয়া নেই একটুও, একদম দিনের আলোর মত পরিষ্কার। এ-ও পরিষ্কার, আগে থেকেই ওর সম্পর্কে জানত এরা। এ ক'দিন আসলে তামাশা দেখেছে, কি ভাবে ওকে ফাঁসানো যায় সেই ফন্দী এঁটেছে।

এখন ফেঁসে গেছে মাসুদ রানা। নরহত্যার দায়ে! অজান্তেই আপাদমস্তক শিউরে উঠল ওর। খুব দ্রুত অন্য লাইনে কাজ শুরু করে দিল মাথা। এ মুহূর্তে একটাই কাজ আছে, পালাতে হবে। সুটকেস নেয়ার উপায় নেই, তাই ওটার দিকে তাকাল না রানা। যে সব না নিলেই নয়, সেগুলো ব্রীফকেসে ভরে তৈরি হয়ে নিল। রুমের আলো নিভিয়ে দিল।

হঠাৎ একটা আইডিয়া এল মাথায়। রোজানার মৃতদেহ যদি আর কোন রুমে সরিয়ে ফেলে ও, কেমন হয়? যদি···চমকে উঠল রানা দরজায় জোর নকের আওয়াজ শুনে। পরমুহূর্তে মোটা একটা গলা শোনা গেল। 'ওপেন দ্য ডোর, সেনিয়র! পুলিস!'

বুকের ভেতর ধক্ করে উঠল। সর্বনাশ! পুলিস! কেন? ওরা···এই অবস্থায় যদি দেখে ওকে পুলিস, ঘরের মধ্যে এক লাশের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে···আর ভাবতে পারল না। স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মুহূর্তের জন্যে। আবার নক্ হলো। নক্ নয়, বোমা পড়ল যেন। 'দরজা খুলুন, সেনিয়র! পুলিস!'

'দুঃখিত, রোজানা,' চাপা কণ্ঠে বলে ব্রীফকেস তুলে নিল ও। 'তোমার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। কথা দিচ্ছি, সাদেক আর তোমার হত্যার প্রতিশোধ আমি নেবই।'

চিতার মত নিঃশব্দ, ক্ষিপ্র পায়ে ব্যালকনির দিকে এগোল ও। সামনের বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল একই গলা। 'দরজা খুলুন, সেনিয়র! নইলে ভেঙে ঢুকব আমরা!'

ব্যালকনিতে পৌঁছে নিচে উঁকি দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ছাঁৎ করে উঠল বুকের মধ্যে। দুটো ছায়া দেখা যাচ্ছে নিচে। অন্ধকারে পরিষ্কার বোঝা যায় না, তবে মনে হলো পুলিসই হবে। মুখ তুলে খুব সম্ভব এই ব্যালকনির দিকেই তাকিয়ে আছে। ঝপ্ করে বসে পড়ল ও। এ ধরনের বিপদে বেশিরভাগ মানুষের যেখানে ভয়ে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে ওর বেলায় ঘটছে উল্টো।

ভয়ের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে। এ মুহূর্তে একদম শান্ত। ভীষণ রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ব্রীফকেস খুলে দেশী এক পেপারব্যাক ওয়েস্টার্ন বের করল রানা। নিরীহ দর্শন চেহারা। কিন্তু ভেতরে একটিও পৃষ্ঠা নেই, আছে

প্রচ্ছদের সাইজে কেটে বসানো এক ফালি জেলিগনাইট। মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে এলে ত্রিশ সেকেন্ড পর ভয়াবহ শব্দে বিস্ফোরিত হবে জিনিসটা। বাতাসের হাত থেকে সুরক্ষার জন্যে বইয়ের খোলা তিন মুখ সার্জিক্যাল টেপ দিয়ে আটকে রাখা আছে।

কেসের ডালা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল রানা। কাজটা সারতে বড়জোর পাঁচ সেকেন্ড সময় লেগেছে ওর। আরেকবার নিচে তাকাল, আছে ব্যাটারা। ওদিকে সামনের দরজায় দুম্ দুম্ আওয়াজ উঠছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়বে।

ফড়াৎ করে এক টানে টেপসহ ওটার ব্যাক কভার ছিঁড়ে ফেলল রানা। চোখ ঘড়ির লিউমিনাস কাঁটার ওপর, ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে চিত করে টিপে ধরে রেখেছে বইটা। বাইশ সেকেন্ডের মাথায় বইটা হোটেলের সামনের দিক সই করে ছুঁড়ে দিল ও ফ্রিসবি ছোঁড়ার মত। বাতাসে পেট ভাসিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

ঠিক আট সেকেন্ড পর বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো জেলিগনাইট, পুরো হোটেল ভবন কেঁপে উঠল ভীষণভাবে। আগুনের লকলকে জিভ লাফিয়ে উঠল আকাশে। শক্ ওয়েভের জোর ধাক্কায় অসংখ্য জানালার কাঁচ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, হোটেলের প্রবেশপথে মহা শোরগোল শুরু হয়ে গেল। এদিকে বিস্ফোরণের শব্দে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল নিচের দুই পুলিস, পরমুহূর্তে ছিটকে পড়ল বাতাসের ধাক্কায়। কোনরকমে সামলে উঠেই এলোমেলো পায়ে পড়িমরি ছুট লাগাল সামনের দিকে।

সুযোগটা ঝটপট কাজে লাগাল রানা। ব্রীফকেস নিচে ছুঁড়ে ফেলে পিলার বেয়ে তরতর করে নেমে গেল। সবার মনোযোগ এখন সামনের দিকে, কাজেই বিনা বাধায় বেরিয়ে পড়ল ও পিছনের গেট দিয়ে। কেউ টেরই পেল না।

পনেরো মিনিট পর ছোট এক বারে মৃত্যু হলো টেক্সান অয়েল প্লেবয় গ্যারি কারের, বেন কার্পেন্টার হয়ে বেরিয়ে এল রানা। এক পাব থেকে ফোনে হিরণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রওনা হলো ট্রান্সটিভেয়ারের সেফ হাউসের দিকে। টাইবারের তীর ধরে খানিক হেঁটে এগোল ও, বাকি পথ দু'বার ট্যাক্সি, একবার বাসে চড়ে। পন্টি গ্যারিবাল্ডির বড় ব্রিজের কাছে বাস থেকে নেমে পড়ল রানা, সেফ হাউস এখান থেকে কাছেই। সম্ভাব্য ফেউ খসাবার জন্যে শেষবারের মত কিছুক্ষণ এ গলি ও গলি করল ও, তারপর আরেক বারে ঢুকল।

রাতটা দৌড়ঝাঁপের মধ্যে দিয়ে কাটতে পারে ভেবে ডিনার সেরে নিল একবারে। শেষে কড়া এক কাপ এসপ্রেসো খেয়ে যখন বের হলো, তখন আটটা বাজে। নক্ হতে দরজা খুলল হিরণ। ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল।

'এমন দেখাচ্ছে কেন আপনাকে, মাসুদ ভাই? কি হয়েছে?'

ব্রীফকেস রেখে চেয়ারে বসল ও। 'রোজানাকে খুন করেছে সিমকা।'

'অ্যাঁ!' চমকে উঠল যুবক।

'কি এক জরুরী খবর দেয়ার জন্যে তোমাকে খুব খুঁজেছে আজ মেয়েটি, না পেয়ে সরাসরি যোগাযোগ করেছিল আমার সাথে। ব্যাপার টের পেয়ে সিমকা মুখ বন্ধ করে দিয়েছে ওর।'

চেহারা কালো হয়ে গেল যুবকের। মুখ নিচু করে ঝাড়া এক মিনিট মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল। 'আপনার সেই তালিকায় স্থানীয় যারা আছে, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেকিঙে ব্যস্ত ছিলাম আমি,' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল সে। 'ইশ্‌শ্‌! এ কি হয়ে গেল?'

'রোজানার মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী,' সিগারেট ধরাল রানা। 'আমার বোকামির জন্যেই মরতে হলো ওকে।'

প্রশ্ন করল না হিরণ, নীরবে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। চেহারায় বিষাদ ও আগ্রহ। সংক্ষেপে ঘটনাটা খুলে বলল ও। বেশ সময় লাগল যুবকের সহজ হতে। পকেট থেকে টাইপ করা একটা শীট বের করে এগিয়ে দিল সে। 'দুপুরের পর এসেছে এটা ঢাকা থেকে।'

পড়তে লেগে গেল রানা। যা জানা গেল তা এরকমঃ সুইটজারল্যান্ডের লুগানোয় লুগানো ব্যাঙ্ক নামে এক ব্যাঙ্ক আছে, লিবারেল বলে খ্যাত সুইস ব্যাঙ্কিং স্ট্যান্ডার্ডকেও এতটাই টপকে গেছে ওরা, যা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ওটার ষাট শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে পিয়েরো সিমকা, ত্রিশ শতাংশ লরেনযো কন্টি। দেশ বিদেশে যে স্থাবর সম্পত্তি আছে সিমকার, তার আনুমানিক মূল্য চব্বিশ বিলিয়ন ডলার। কন্টিও প্রায় সম-পরিমাণ অর্থবিত্তের মালিক। তবে এদের সমস্ত অর্থ বিদেশে।

সিমকা একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। সে সময় তাকে সাসেক্সের একটা রেস্ট ফার্মে ভর্তি করা হয়। ইজিফুল একরস্ ওটার নাম। ওদের রেকর্ডে কন্টি, ম্যালোরি ও হেদায়েতুল ইসলামের নাম আছে। দু'চারদিন আগে-পরে ওখানে ভর্তি করা হয় তাদের। দু'মাসের বেশি সময় ছিল ওখানে তারা। কিন্তু সিমকার নাম রেকর্ডে নেই। এর কারণ জানা গেছে।

রোগী হিসেবে নয়, ফার্মের জার্মান রেসিডেন্ট সার্জন, ড. আনটেনওয়েজারের অতিথি হিসেবে ছিল সে। এই ডাক্তার মেডিটেশন বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী।

মানসিক রোগীদের ওপর এ বিদ্যা প্রয়োগের জন্যে এক চিনা চিকিৎসক জুঙ বিশেষ এক পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করেন, যার নাম *আই চিঙ*, ইংরেজিতে ট্রানসেনডেন্টাল মেডিটেশন যাকে বলে, তার কাছাকাছি। পরে সেই চিনা চিকিৎসকের নামে পদ্ধতিটির নাম রাখা হয়—জুঙ। রোগীদের সম্মোহন করে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন জুঙ। যথেষ্ট কার্যকর প্রমাণিত হয় তাঁর এ পদ্ধতি। অবশ্য দীর্ঘ সময় লাগত রোগীর সেরে উঠতে।

প্রথমদিকে জুঙের পদ্ধতি অনুসরণ করত বলে জুঙিয়ান হিসেবে খ্যাত ছিল আনটেনওয়েজার। কিন্তু তাতে সময় বেশি লাগে বলে পরে গবেষণার মাধ্যমে জুঙেরই এক শর্টকাট নিরাময়ের রাস্তা বের করে সে একই রোগের ক্ষেত্রে।

তাতে সুফল কতখানি অর্জিত হয়েছে জানা না গেলেও প্রচুর কুফল যে হয়েছে, তার প্রমাণ আছে ভূরি ভূরি। জার্মান পত্রপত্রিকা উঠেপড়ে লাগে তার বিরুদ্ধে, তাকে আখ্যা দেয় জুঙফেক নামে। সরকার চিকিৎসার লাইসেন্স বাতিল করে আনটেনওয়েজারের, জনরোষের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালায় সে, ইংল্যান্ড চলে আসে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় সেটা।

সাসেক্সে বিশাল এক ফার্মল্যান্ড কিনে সেখানে প্রতিষ্ঠা করে সে নিজের রেস্ট ফার্ম। ইজিফুল একরস্। তার ওখানে যতদিন ছিল সিমকা, বন্ধ এক রুমে থাকত সর্বক্ষণ। ড. ওয়েজার ছাড়া কেউ যেত না সে রুমে। কড়াকড়িভাবে নিষেধ ছিল। ফার্মের এক প্রাক্তন কর্মচারী, বর্তমানে লন্ডনের টার্নব্রিজ ওয়েলসে বসবাসরত রিকি জর্ডান হলপ করে বলেছে, একদিন ওখানকার বারান্দা ঝাঁট দেয়ার সময় সিমকার রুমের দরজা খোলা দেখে কৌতূহলী হয়ে উঁকি দিয়েছিল সে।

ভেতরে কটে শোয়া দেখেছে সে তখন লোকটাকে, হাত-পা বাঁধা ছিল। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলেছে জর্ডান, সেই লোকই আজকের ইটালিয়ান সিনেটর, পিয়েরো সিমকা। বিসিআইয়ের লন্ডন অফিস জানিয়েছে, আসলে ড. ওয়েজার নয়, ইজিফুলের মালিক লন্ডনের এক সিটি কম্বাইন। সারাদেশে তাদের অনেকগুলো একই ধরনের রেস্ট ফার্ম আছে। সবগুলোই অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এবং লাভজনক।

সবচেয়ে মজার ঘটনা, সিটি কম্বাইনের চেয়ারম্যান অভ দ্য বোর্ড আর কেউ নয়, স্বনামখ্যাত স্যার হিউ মারসল্যান্ড। বোর্ডের অন্য সদস্যরা কেবল কাগজে আছে, কাজের বেলায় নেই। অস্তিত্বহীন, ডামি। স্যার হিউ একাই পরিচালনা করে চেইনের সবগুলো ক্লিনিক।

থামল মাসুদ রানা। আচ্ছা! আপনমনে ভাবল, কেচ্ছা তাহলে এই? জুঙফ্রাউ নয়, তাহলে জুঙফেক বোঝাতে নোট বইয়ে CH লিখেছিল সাদেক? দীর্ঘক্ষণ লাগল ওর ধরায় ফিরতে।

ফের মন দিল রিপোর্টে। সোনার প্রতি দুর্বলতা আছে স্যার হিউর। টাকার দাম ওঠানামা করে, সোনার দাম স্থিতিশীল থাকে। তাই কয়েকবছর আগে থেকে টাকাকে সোনায় রূপান্তরিত করতে শুরু করে সে। সিমকা, কন্টি ও ম্যালোরিও তাকে অনুসরণ করে। সহজে বহনযোগ্য ইনগটে পরিণত করে সবাই মিলে সিমকা-কন্টির লুগানো ব্যাঙ্কের অল প্রুফ ভল্টে সোনা জমা করতে শুরু করে।

অতিসম্প্রতি তাদের গচ্ছিত সমস্ত সোনা খুব গোপনে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কোথায় নেয়া হয়েছে জানা যায়নি। তবে কয়েকটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থার অনুমান, দক্ষিণ-পুব এশিয়ার কোনও দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে খুব সম্ভব।

রুমের আরেক কোণে টিভি দেখছিল হিরণ। আচমকা সিধে হলো সে। ঝট্ করে এদিকে ঘুরল। 'মাসুদ ভাই!'

চোখ তুলল ও, নজর পড়ল টিভি পর্দায় নিজের ছবির ওপর। বিশেষ নিউজ

বুলেটিন প্রচার করছে রোম টিভি নেটওয়ার্ক। '…আলিটালিয়ার এক এয়ার হোস্টেস, রোজানা মোরান্ডিকে মৃত উদ্ধার করেছে পুলিস। তীক্ষ্ণধার ছোরা দিয়ে জবাই করা হয়েছে তাকে। হোটেলের উক্ত ফ্লোরে ডিউটিরত কারাবিনিয়েরি হলপ করে বলেছে, মিস মোরান্ডি স্যুইটে ঢোকার পর স্যুইটের টেক্সান গেস্ট, রজার গ্যারি কার ছাড়া আর কেউ ভেতরে ঢোকেনি।

'রোম পুলিস উক্ত মার্কিন ব্যবসায়ীটিকে খুঁজছে। গ্যারি কার দীর্ঘদেহী। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা। মাথার চুল কালো, ব্যাক ব্রাশ করা। ক্লীন শেভড। বয়স আটাশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। তাকে শেষ দেখা গেছে ইংলিশ কাট্ ডার্ক গ্রে টপ্ কোট, গ্রে ফ্লানেল স্যুট ও ডার্ক গ্রে ফেল্ট হ্যাট পরা অবস্থায়। ইটালিয়ানে কথা বলতে পারে সে। এ ব্যাপারে পুলিস জনসাধারণের সাহায্য কামনা করেছে।'

পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ডুবে আছে গভীর চিন্তায়। বেশ শক্ত প্যাঁচেই তাহলে ফেলেছে ওকে পিয়েরো সিমকা। নরহত্যার দায়ে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। এবার নিশ্চই পুরো ইটালিয়ান মিডিয়াকে ওর পিছনে লেলিয়ে দেবে? এবং পুলিস প্রশাসনের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে ওকে পাকড়াও করার জন্যে? তা সিমকা করতেই পারে, সে ক্ষমতা তার আছে। আর ক্ষমতা দেখানোর এটাই উপযুক্ত মুহূর্ত।

'এখন কি করবেন, মাসুদ ভাই?' বলে উঠল হিরণ।

'কি করব?' ভাবল ও, করার একটাই আছে, হানা দিতে হবে লরেনযো কন্টির ওয়্যারহাউসে। জানতে হবে আর কি কি আছে ওর মধ্যে। যে সমস্ত মিলিটারি ইকুইপমেন্ট ওখানে দেখেছে রানা, তার সাহায্যে অনেক কিছুই করে বসতে পারে ওরা। কাজেই আগে ওকে জানতে হবে ওসব শুধুই প্রপ নয়, আসল জিনিস। এবং মতলব খারাপ ওদের। যদি তা প্রমাণ করা সম্ভব হয়, তাহলে যা করার এদেশের প্রশাসনই করবে। আর যদি না হয়…সে তখন দেখা যাবে। 'এ মুহূর্তে করার একটাই আছে,' বলল ও। 'সিমকার লেজে পা দেয়া। এবং আজই করতে হবে যা করার।' ওর মন বলল ওগুলো খাঁটি। প্রপ হতেই পারে না। শুধু প্রপ পাহারা দেয়ার জন্যে এত গার্ড ও কুকুর প্রয়োজন হয় না।

'আজ রাতে?'

'হ্যাঁ।'

খানিক চুপ করে থাকল হিরণ। 'আমিও যাব।'

কথা বলল না রানা, মনে হলো শুনতে পায়নি।

'মাসুদ ভাই!'

'কিছু বলছ?'

'বলছি আমিও যাব আপনার সাথে।'

'কোথায়?'

'আপনি যেখানে যাবেন।'

আপত্তি জানাল না রানা। ভাবল একজন সঙ্গী থাকলে বরং ভালই হবে।

গার্ড আর কুকুরের সংখ্যা খুব বেশি ওখানে। পিছনদিকটা কভার করার জন্যে একজন থাকলে মন্দ হয় না। 'বেশ,' বলল ও। 'যেয়ো।' পকেট থেকে এক তাড়া ইটালিয়ান নোট বের করল। 'আগে একটা কাজ করো। আমার জন্যে সাধারণ একটা স্যুট, গ্রেট কোট ইত্যাদি কিনে নিয়ে এসো। আর কিছু সস্তা হ্যামবার্গার। গোটা আট-দশেক।' আরও দুয়েকটা জিনিসের নাম বলল ও।

'হ্যামবার্গার কেন!'

'ওখানে প্রচুর কুকুর আছে। ওগুলোকে ঠাণ্ডা করতে দরকার হবে।'

'তাহলে তো সিডেটিভও···'

'আছে আমার শেভিং কিটে।'

'আর কিছু?'

'ভুয়া নামে একটা গাড়ি ভাড়া করো, আর···নিঃশব্দে চলার মত কিছু হলে ভাল হয়। ওখানে পৌঁছে বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে এগোতে হবে। একেবারে কম নয় পথ। রাই-সাইকেল হলে···'

'আছে ও জিনিস,' বাধা দিয়ে বলে উঠল হিরণ। 'একজোড়া কোলাপসিবল রাই-সাইকেল আছে আমাদের, ওগুলো গাড়ির ট্রাঙ্কে ভরে নিয়ে আসব।'

'গুড। নিয়ে এসো।'

'পথে বের হওয়ার আগে আপনার চেহারা খানিকটা বদলে নিলে ভাল হয় না?'

মাথা দোলাল রানা। 'সাধারণ স্যুট আর নতুন পাসপোর্টেই কাজ চলে যাবে।'

'ওখানে শুধুই কুকুর গার্ড, মানুষ নেই?'

'আছে, প্রচুর।'

'ওদের হাত থেকে বাঁচার উপায় ভাবতে হবে না?' বলল যুবক।

'ভেবেছি। তুমি ওদের ডাইভার্ট করবে।'

'কি করে?' চোখ কোঁচকাল হিরণ।

'সে পরে ভেবে বের করা যাবে। কাজ সেরে এসো।'

দুই ঘণ্টা পর ফিরল হিরণ। জিনিসপত্রের সাথে এক হালি লেট নাইট এডিশন খবরের কাগজও নিয়ে এসেছে। যা ভাবছিল রানা একটু আগে, সবগুলো পত্রিকা গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে রোজানা মোরান্ডি হত্যাকাণ্ডের খবর। এবং প্রত্যেকটায় একই ছবি ছাপা হয়েছে ওর, আজই বিকেলের টী-পার্টিতে তোলা ছবি, রোজানার মৃত্যুর সম্ভবত দুই ঘণ্টা আগে। হেডিংগুলো পড়ল রানাঃ

ইউরকিডো (মার্ডার)! **রেপিমেন্টো** (রেপ)! **ভায়োলেনযা** (ভায়োলেন্স)! **মিসটেরো** (মিস্টিরি)!

টিভির খবরেরই প্রতিধ্বনি করেছে সব পত্রিকা, সাথে কিছু সম্পাদকীয়

মন্তব্যও ছেপেছে। দেশে দেশে পয়সাওয়ালা, বিকৃত রুচির যৌন-উন্মাদ আমেরিকানদের অশুভ তৎপরতা যে ভীষণ বেড়ে গেছে, তা নিয়ে নাতিদীর্ঘ মন্তব্য করেছে তারা। তার সাথে আছে সুন্দরী ইটালিয়ান মেয়েদের জন্যে এইসব রহস্যময় চরিত্র থেকে দূরে থাকার নসিহত। একই সাথে এরাও আমেরিকান প্লেবয়টিকে আটক করার ব্যাপারে পুলিসকে সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে।

ওগুলো মেঝেতে ফেলে দিল রানা। চেহারায় কোন অভিব্যক্তি নেই ওর। দামী পরিধেয় খুলে হিরণের কিনে আনা সাধারণ স্যুট ও টপকোট পরে নিল। একটু ঢিলা হলো, সম্ভবত এক সাইজ বড় হয়ে গেছে। তাতে বরং ভালই মানাল। এরপর স্যান্ডউইচগুলো নিয়ে পড়ল রানা। ব্রীফকেস থেকে শেভিং ফোমের লেবেল প্রিন্ট করা একটা মাঝারি স্প্রে ক্যান বের করে প্রত্যেকটার মাঝখানে খানিকটা করে স্প্রে করল ভেতরের তরল পদার্থ।

জিনিসটা এক ধরনের অ্যান্টি-পেস্‌কি কেমিক্যাল, গন্ধওয়ালা। বিসিআইয়ের নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে তৈরি। মশা-মাছি থেকে শুরু করে কুকুর পর্যন্ত ঘায়েল করা যায় এর সাহায্যে। নামও তাই রাখা হয়েছে কাজের সাথে মিল রেখে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধে, গন্ধটা এক কথায় অপ্রতিরোধ্য। অপরিচিত কারও দেয়া কিছু না খাওয়ার ব্যাপারে সেরা ট্রেনিং পাওয়া কুকুরও এর লোভ এড়াতে পারে না।

কাজ শেষ হতে বার্গারগুলো এক শপিংব্যাগে ভরল রানা। এরমধ্যে সেফ হাউসের খুদে কিচেন থেকে নিজেদের জন্যে কফি তৈরি করে এনেছে হিরণ। নীরবে কফি পান করার ফাঁকে আসন্ন অভিযান সম্পর্কে মাথা ঘামাতে লাগল রানা।

'কখন রওনা হচ্ছি আমরা, মাসুদ ভাই?'

ঘড়ি দেখল ও। প্রায় এগারোটা। 'আরও দেড় ঘণ্টা পর। একটু রাত করে বের হওয়াই ভাল।'

'জায়গাটা কোথায়?' এক চুমুক কফি খেল হিরণ।

'ফিউমিসিনোয়। এয়ারপোর্টের সামান্য পরে।' কন্টির স্টুডিও কমপ্লেক্স সম্পর্কে যুবককে মোটামুটি ধারণা দিল ও।

'বাপরে! বিরাট ব্যাপার!'

'হ্যাঁ।'

'মিলিটারি ইন্সটলেশনের মত গার্ড ব্যবস্থা?'

'তাই।'

'তাহলে তো নিশ্চই কাবাবমে হাড্ডি হ্যায়।'

'তোমার ফায়ার আর্মস এনেছ?' প্রশ্ন করল রানা।

'জ্বি। ও জিনিস সবসময় সাথেই রাখি।'

'আর সব?'

'এনেছি। দেখাচ্ছি আপনাকে।'

সাত

একটা কাগজে কন্টির স্টুডিও কমপ্লেক্সের স্কেচ আঁকল রানা। যেখানে যা দেখেছে সেগুলোকে সেখানে বসাল। বড় রাস্তা থেকে যাওয়ার প্রাইভেট রাস্তা, গার্ড পোস্ট-স্টেশন সব।

'এই হচ্ছে মেইন গেট,' বল পেন দিয়ে টোকা মেরে জায়গাটা হিরণকে দেখাল ও। 'এখানেই এই প্রাইভেট রোড শেষ, ভেতরে চলে গেছে। এই গেটে কড়া পাহারার ব্যবস্থা আছে। এটা হচ্ছে স্টুডিওর পেরিমিটার ফেন্স। পিছনে এর শেষ কোথায় জানি না। তবে ওদিকে যাওয়ার প্রয়োজন মনে হয় পড়বে না আমাদের। সামনের দিকের কোনও এক সুবিধেজনক জায়গা দেখে ঢুকে পড়ব। অবশ্য···' থেমে কিছু ভাবল রানা। 'সাইকেল যখন আছে, পিছনের বা সাইডের কোনও একদিক থেকে ঢুকলেই বা অসুবিধে কি?'

'তাই তো,' মাথা ঝাঁকাল যুবক। 'আমাদের নিরাপদে ঢোকা নিয়ে কথা।'

'ঠিক। কোনদিক দিয়ে ঢোকা যায়?' নিজেকে প্রশ্ন করল ও।

'আপনি বলছেন ফেন্সের কাছেপিঠে আর কোন রাস্তা নেই?'

'না, নেই। তবে মনে হচ্ছে যেন একটা ট্রেইল আছে। দেখেছি আমি।'

'কি আছে না আছে ওখানে গিয়ে দেখব, মাসুদ ভাই, চলুন,' কিছুটা ব্যস্ততা ফুটল হিরণের কণ্ঠে। অ্যাকশনের গন্ধ পেয়ে উত্তেজিত।

পকেট ট্রানজিস্টর আকারের হোমিং ডিভাইস লোকেটর যন্ত্রটা বের করল রানা ব্রীফকেস থেকে, ট্রাউজারের পকেটে ভরল। সাথে হিরণের নিয়ে আসা মটর দানা সাইজের এক ম্যাগনেটিক ডিভাইস। আফটার শেভ লোশনের শিশির মুখে বসানো ছোট্ট সাদা বলটা বিশেষ কায়দায় বের করে ওটাও পকেটে ঢোকাল রানা। দেখে বোঝার কোন উপায় নেই যে ওটা আসলে বিষাক্ত গ্যাস বম্ব। এরপর কেসের ফলস্ বটম থেকে চার ইঞ্চি ব্লেডের তীক্ষ্ণধার এক ছোরা তুলে নিল। ডান কব্জির ভেতরদিকে টেপ দিয়ে ওটাকে খোলা অবস্থায় এমনভাবে আটকে নিল যাতে প্রয়োজনের সময় সামান্য ঝাঁকি দিলেই হাতে চলে আসে। এছাড়া এক্স জুতোর হিলের ভেতরের গোপন চেম্বারে আরেকটা ফোল্ডিঙ ছোরা সবসময় মজুত রাখে রানা, সেটাও আছে।

সবশেষে শার্টের বুক পকেটে একটা কলম ঢোকাল। দেখতে কলম হলেও ওটা একটা টর্চলাইট। ফোকাস আধুলি সাইজ থেকে পিনের মাথার মত সরুও করা সম্ভব ওটার অ্যাডজাস্টিং নব ঘুরিয়ে। 'এবার যাত্রা করা যেতে পারে,' ঘোষণা করল ও। শোল্ডার হোলস্টারে রাখা ওয়ালথারের স্পর্শ অনুভব করে হিপ পকেটের এক্সট্রা ক্লিপটা আছে কি না দেখে নিল।

পাঁচ মিনিট পর ঘরের আলো নিভিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা নিঃশব্দে। গাড়িটা ঝরঝরে এক বুইক কনভার্টিবল, দেখে ভরসা করতে মন চাইল না রানার। কিন্তু স্টার্ট দেয়ার পর এঞ্জিনের যে আওয়াজ উঠল, তাতে বোঝা গেল ভরসা না করতে পারার কোন কারণ নেই। চমৎকার টিউন করা গাড়ি। নিখুঁত কাজ।

হিরণ বসল ড্রাইভিং সীটে, গাড়ি ছেড়ে দিল। 'পনেরো-বিশ মিনিট লাগবে ফিউমিসিনো পৌঁছতে,' বলল সে। 'যদি গ্যারি কারকে ধরার জন্যে পথে রোড ব্লক বসিয়ে না থাকে পুলিস।'

'ধরুক না ওরা তাকে যতবার খুশি, তাতে বেন কার্পেন্টারের অসুবিধে কি?' সিগারেট ধরাল রানা।

'তা বটে।'

পুরো রাস্তা নিরাপদেই এগোল ওরা, কোন ব্লক চোখে পড়ল না। এয়ারপোর্ট অতিক্রম করে মাইল দুয়েক এগিয়ে গাড়ি থামানোর নির্দেশ দিল রানা, আর বেশি দূরে নৈই স্টুডিও। হাইওয়ের পাশের ঘন গাছপালার ভেতর সুবিধেজনক এক জায়গা দেখে পার্ক করল হিরণ। আলো নিভিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে দিল। নেমে ট্রাঙ্ক থেকে দুটো তিন ভাঁজ করা কোলাপসিবল বাই-সাইকেল বের করল সে। ভাঁজ টেনে খুলে এখানে ওখানে দু'চারটা নাট বল্টু টাইট দিতেই আস্ত দ্বিচক্রযানে পরিণত হলো ওগুলো।

চেপে বসল দু'জন দুটোয়, রওনা দিল বড় রাস্তার দিকে। যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকে এগোল আবার জোর পেডাল চালিয়ে। সামনে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক, তার ওপাশ থেকে শুরু রোম শহরতলীর। ব্লক অতিক্রম করে গতি আরও বাড়াল মাসুদ রানা। সাঁই-সাঁই করে ছুটতে লাগল। ওর কয়েক গজ পিছনে থাকল হিরণ, সমান তালে আসছে।

পাঁচ মিনিট একনাগাড়ে ছোটার পর দূর থেকে স্টুডিওর মেইনগেটের জোড়া ফ্লাড লাইট চোখে পড়তে গতি কমাল রানা। 'এসে পড়েছি।'

আরও মিনিট চারেক এগোল ওরা। থেমে দিক অনুমান করে নিল রানা, তারপর রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়ল। মনে পড়েছে, ট্রেইল এদিকেই কোথাও দেখেছে ও। সত্যি তাই, তারার আবছা আলোয় মিনিট দুয়েক খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল ট্রেইল। 'পুরনো হান্টিং ট্রেইল,' মন্তব্য করল হিরণ। 'হান্টিং ট্রেইল ধরে হান্টিঙে যাওয়া, মন্দ কি? ভালই তো!'

দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় বেশ ঝোপঝাড় জন্মেছে ট্রেইলে, তবে সে জন্যে বিশেষ অসুবিধে হলো না পথ চলায়। বেশ দ্রুত ফেন্স আর নিজেদের মাঝের ব্যবধান কমিয়ে আনল ওরা। কমপ্লেক্সের দক্ষিণ দিক এটা। ফেন্স ও জংলা গাছপালার মাঝে গজ পঞ্চাশেক পরিষ্কার জায়গা আছে, দেখেছে ও কাল লিমোয় চড়ে স্পটে যাওয়ার সময়।

বনের কিনারায় পৌঁছল ওরা নিঃশব্দে। রানা খেয়াল করল বাতাস আছে মৃদু। তবে উল্টো। কমপ্লেক্সের দিক থেকে আসছে। অর্থাৎ কুকুর ওদের গায়ের গন্ধ পাবে না। কাজেই নিশ্চিন্তমনে ভেতরে ঢোকার উপযুক্ত জায়গার

খোঁজে এগোল। প্রায় মাইলখানেক এগোতে পাওয়া গেল। অন্যসব জায়গা থেকে এখানটা কিছুটা অন্ধকার, কারণ পর পর দুটো পোলে আলো জ্বলছে না।

থেমে পড়ল রানা। সাইকেল শুইয়ে রাখল বড় এক ঝোপের আড়ালে। দেখাদেখি হিরণও তাই করল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফেন্সের দিকে তাকিয়ে থাকল দীর্ঘসময়। টহলগার্ড চোখে পড়ল না, তবে গাঢ় দুটো কাঠামো দেখা গেল—থেকে থেকে উদয় হচ্ছে ফেন্সের ওপাশে। ফেন্সের গোড়ায় নাক ঠেকিয়ে শুঁকছে। দুলকি চালে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক করে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। অকারণ হাঁকডাক নেই। হাইলি ট্রেইনড্ কুকুর।

করণীয় ঠিক করে নিল মাসুদ রানা। হিরণকে ওকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে যথাসম্ভব সামনে ঝুঁকে থেমে থেমে ফেন্সের দিকে এগোল। খানিক এগোয়, একটু থামে, আবার এগোয়। ওটার ত্রিশ গজের মধ্যে পৌঁছে শুয়ে পড়ল ওরা উপুড় হয়ে। আর সামনে গেলে বিপদ ঘটে যেতে পারে। কিছু সময় অপেক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিল রানা, কুকুর দুটোই আছে এদিকে। হয়তো গার্ড দেয়ার সীমানা ভাগ করা আছে ওদের। ব্যাগ থেকে দুটো হ্যামবার্গার বের করল রানা।

একটা যুবকের হাতে দিয়ে চাপা কণ্ঠে বলে দিল কি করতে হবে। 'ছোঁড়ার সময় খেয়াল রেখো, ফেন্স অন্তত আঠারো ফুট উঁচু।'

'আচ্ছা,' মাথা দোলাল সে।

বার্গার ধরা হাত দেহের পিছনে লম্বা করে রেখে অপেক্ষায় থাকল দু'জনে। এবার প্রায় পাঁচ মিনিট পর এল ওরা। হ্যাঃ-হ্যাঃ করে হাঁপাচ্ছে, আওয়াজটা পরিষ্কার শোনা যায়। চক্কর সেরে যেই ফিরে যাওয়ার জন্যে পিছন ফিরেছে দুই হাউন্ড, তখনই ঝট্ করে শূন্যে উঠে পড়ল ওদের দু'জনের হাত। ক্রিকেট খেলায় বোলিং করার ভঙ্গিতে একসাথে বার্গার ছুঁড়ে দিল রানা ও হিরণ।

ফেন্স অতিক্রম করে মৃদু শব্দ তুলে মাটিতে আছড়ে পড়ল ও দুটো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দুই হাউন্ডের বাচ্চা। বাঘের মত ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল। জিনিসগুলো চোখে পড়তে একটু চঞ্চল হয়ে উঠল, ঘুরে দাঁড়াল দ্রুত। ইতস্তত পায়ে এগোল কয়েক কদম। থেমে পড়ল। চোখ তুলে এদিক-ওদিক তাকাল কিছু সময়। লেজ দোলাচ্ছে তুমুলবেগে।

নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে আরও কয়েক ইঞ্চি এগোল কুকুর দুটো, নাক নিচু করে গন্ধ শুঁকল। ওদের ভাব দেখে রানা প্রায় ধরেই নিয়েছিল কৌশলটা ব্যর্থ হয়েছে। পরমুহূর্তে ভুল ভাঙল। একযোগে বার্গারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই উলফহাউন্ড। দুই-তিন কামড়ে পেটে চালান করে দিল একেকটা হ্যামবার্গার।

ঠিক ত্রিশ সেকেন্ডের মাথায় অ্যান্টি-পেসকি কেমিক্যালের ফলাফল চাক্ষুস করল রানা ও হিরণ। খাওয়ার পরই একটু একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিল কুকুরগুলো, পা উঠছিল না ঠিকমত। সেকেন্ডের কাঁটা আধ চক্কর ঘুরতেই একযোগে চার পা ভাঁজই হয়ে গেল, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হলো

ওরা বসে পড়তে। বসে থাকল ঝিম্ মেরে। একটা মৃদু 'কেঁউ' করে উঠল বটে একবার, কিন্তু আওয়াজটা পুরো বের হলো না, ভেতরে রয়ে গেল অর্ধেক।

এক সময় সামনের দুই প্রসারিত পায়ের ফাঁকে মাথা গুঁজল দুই উলফহাউন্ড। সেটাই ছিল জীবনের শেষ নড়াচড়া ওদের। বুঝল রানা কাজ হয়েছে, তবু পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে শুয়ে থাকল আরও কিছুক্ষণ। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। ফেন্সের কাছে পৌঁছে ভীষণ তৎপর হয়ে উঠল রানা। পিছনের বেল্টে গোঁজা ওয়্যার কাটার বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল পথ পরিষ্কার করার কাজে। একজন মানুষ অনায়াসে আসা-যাওয়া করতে পারে, তার কেটে এমন এক ফাঁক তৈরি করতে পাঁচ মিনিট লাগল।

ভেতরে ঢোকার আগে সাইলেন্সার জুড়ে নিল ওরা অস্ত্রের নলের সাথে। ঝুঁকে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল একপাশের আকাশছোঁয়া ওয়্যারহাউসের উদ্দেশে। সতর্ক দৃষ্টি নেচে বেড়াচ্ছে চারদিকে। প্রতি মুহূর্ত তটস্থ হয়ে আছে দু'জনেই—এই বুঝি ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুর, এই বুঝি হেঁকে উঠল কোন গার্ড বা আর কিছু। তেমন কিছু ঘটল না শেষ পর্যন্ত। রানার মনে হলো মেইন গেটে আর্মি গার্ড আর ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা করতে পেরেই বোধহয় কন্টি সন্তুষ্ট। অন্যদিকে বিশেষ নজর রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি।

না করায় ভালই হয়েছে, ভাবল রানা, অনেক ঝুট ঝামেলা থেকে বাঁচা গেছে। জায়গামত পৌঁছে থামল ওরা। ডানদিকের ওয়্যারহাউসের সাইড গেটের সামনেটা অন্ধকার। হেভি ডবল-বোল্ট তালা ঝুলছে গেটে। টর্চলাইটের পিনের মাথা সাইজ আলো ফেলে ওটা দেখল রানা। মনে মনে হাসল। এসব দেখতেই যা, খোলা ডাল-ভাত ব্যাপার। টর্চ অফ করে দাঁতে কামড়ে ধরে পকেট থেকে প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী একটা স্টীলের তৈরি পাঁচ ইঞ্চি দীর্ঘ পিন বের করল ও। এক মাথা চ্যাপ্টা পিনটার, মাঝখানে কাটা। তালার মধ্যে কাটা প্রান্ত ভরে দিয়ে লেগে পড়ল কাজে।

তিন মিনিট পর প্রেতের মত নিঃশব্দ পায়ে অন্ধকার ওয়্যারহাউসে ঢুকে পড়ল দু'জনে। গেটের পাল্লা পুরো বন্ধ করল না রানা, হিরণকে ফাঁকে চোখ রেখে বাইরে নজর রাখার নির্দেশ দিয়ে আসল কাজে লেগে গেল। বিশাল এক অস্ত্র ভাণ্ডার খুঁজছিল ও মনে মনে, দেখা গেল এটা সত্যি তাই। পেন লাইটের আলোয় যে ভাণ্ডার আবিষ্কার করল রানা, তাতে নিজেরই বাক্‌রুদ্ধ হওয়ার দশা।

রাশিয়ার তৈরি মিগ-২৪ বিমানই আছে আটটা। ওগুলোর জন্যে প্রস্তুত মিসাইল অসংখ্য। নিউক্লিয়ার আর্মড ওয়ারহেড রকেট, NA T-2B রকেট, ইউএস নেভির বুল পাপ মিসাইল, আরও কত কী! ডামি নয় একটাও, সব আসল জিনিস।

তৃতীয় গুদামে ঝুঁকি নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, ভাবল রানা, এই একটায় যে সমস্ত আনলিস্টেড, ক্লাসিফায়েড সমরাস্ত্র আছে, তাই যথেষ্ট। ন্যাটোভুক্ত যে কোন দেশের প্রতিনিধিদল, অথবা রাশিয়া কি চিনের ওয়েপন ইন্সপেকশন টীম একবার যদি চোখ বোলায় ভেতরে, দুনিয়া জাহান্নাম হয়ে

উঠবে। সিমকা বা তার সঙ্গীদের হাজারো রাজনৈতিক প্রভাব কোন কাজে তো আসবেই না, বরং চোদ্দবার করে ফাঁসীতে ঝোলানো হবে সব ক'টাকে।

সঙ্গে একটা ক্যামেরা কেন আনল না ভেবে প্রচণ্ড আফসোস হলো রানার। কয়েকটা ছবি যদি তুলে নিয়ে যাওয়া যেত এখানকার, অনেক সহজ হয়ে যেত ওর কাজ।

স্তব্ধ হয়ে দূরে সার দিয়ে রাখা চকচকে মিগগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল ও। ঘাড়ের খাটো খাটো চুল আপনাআপনি দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে। একদল মানসিক রোগী, অর্ধ উন্মাদের হাতে এত সমস্ত ধ্বংসের সাজ-সরঞ্জাম তুলে দেয়ার কথা নির্মাতা দেশগুলো ভাবল কি করে? এদের ওপর এত ভরসা কেন তাদের? সেসব দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কোনটিরই কি জানা নেই এদের অতীত?

ছবির জন্যে সমরাস্ত্রের প্রয়োজন হতেই পারে, সে জন্যে এতসব লেটেস্ট, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র এদের হাতেই তুলে দেয়া কেন? সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কি রাখা যেত না এসব? যে দৃশ্যের জন্যে যখন যেটা প্রয়োজন, বের করে নিয়ে কাজ চালাবার অনুমতিই তো যথেষ্ট ছিল সে জন্যে। তা না করে সব সিমকা-স্যার হিউর ওপর ছেড়ে দিল ওরা কোন ভরসায়?

কতদিন থেকে সমরাস্ত্র সংগ্রহ করছে এরা? ন্যাটোর কোন অস্ত্র পরিদর্শক টীম কি পা রেখেছে কখনও এসব ওয়্যারহাউসে? কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছল মাসুদ রানা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল একটা মিগ-২৪ ফ্লিপার ফাইটারের দিকে। কাছেই ককপিটে ওঠার ল্যাডার দাঁড়িয়ে, ওটা টেনে জায়গামত নিয়ে এল, উঠে পড়ল ঝট্‌পট্। ক্যানোপি উন্মুক্ত এটার। ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। নতুন গাড়ির ভেতরে যেমন মিষ্টি গন্ধ থাকে, এখানেও সেই গন্ধ পেল।

চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত ভাবল ও, এঞ্জিনের স্ট্যাটাস চেকিং সিকোয়েন্স পুরো করতে কোন কোন সুইচ টিপতে হবে, মনের পর্দায় তার পরিষ্কার একটা ছবি ফুটিয়ে তুলল। কোন দেশ যখনই কোন নতুন প্লেন কি সমরাস্ত্র তৈরি করুক, গোয়েন্দা সূত্রে তার সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য একসময় ফাঁস হয়েই যায়। অন্য সব সংস্থার মত ঘুরেফিরে তা বিসিআইয়ের হাতেও পড়ে। সংস্থার সেরা স্পাইদের মুখস্থ করতে হয় সে সব বিস্তারিত তথ্য।

চোখ খুলল রানা। এক এক করে গোটাদশেক সুইচ টিপল। পুরো ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল আলো হয়ে উঠল মিগের, অনেকগুলো ডায়ালের কাঁটা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছোট বড় অজস্র ডায়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল ও কিছুক্ষণ। পর্যাপ্ত পাওয়ার, ফুয়েল, এয়ারপ্রেশার সবই আছে। আকাশে ওড়ার জন্যে একদম তৈরি।

সুইচগুলো অফ করে নেমে পড়ল ও। ল্যাডার জায়গায় রেখে একটা টর্পেডোর কাছে এসে দাঁড়াল। লম্বা এক কাঠের ওয়ার্ক টেবিলের ওপর শুয়ে আছে ওটা। ব্রিটেনের তৈরি মার্ক ইলেভেন, নতুন সিরিজ, আনলিস্টেড, ক্লাসিফায়েড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রথম এই টর্পেডো ব্যবহার করে ব্রিটেন।

অনেকদিন বন্ধ ছিল উৎপাদন, নব্বই দশকের মাঝখানে আবার শুরু হয়েছে। একশো দশ পাউন্ড ওজন এর, ভেতরের অনেকটা জায়গাজুড়ে ঠাসা থাকে অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরক।

বিস্ফোরক রাখার চেম্বারের চৌকো মুখটা খোলা এ মুহূর্তে, ভেতরে ফাঁকা। হয়তো আরও কার্যকর কোন বিস্ফোরক ভরা হবে পরে। অয়েল ট্যাঙ্কার উড়িয়ে দেয়ার জন্যে তৈরি করা হচ্ছে এটাকে? ভাবল ও। টর্চের আলোয় চকচকে ধাতবের দীর্ঘ খোলটার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। অজান্তে শিউরে উঠল।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। এখানে আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। তাড়াতাড়ি রোমে ফিরে যেতে হবে। রিপোর্ট করতে হবে রাহাত খানকে।

হিরণের কাছে ফিরে এল ও। 'চলো।'

'হয়ে গেল দেখা?'

'হ্যাঁ, হয়ে গেল।' বাইরে উঁকি দিল ও। 'কোন গার্ড?'

'নাহ্!' বলল যুবক। 'একটাকেও দেখলাম না। কিন্তু এখন বের হব কি করে, মাসুদ ভাই? চাঁদ উঠেছে, বেশ আলো বাইরে।'

'সরো। দেখতে দাও আমাকে।' দরজা খানিকটা ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিল ও। সত্যি তাই। তবে মেঘও অল্পস্বল্প আছে। নড়ছে ধীরগতিতে। বড় এক খণ্ড মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, শামুকের গতিতে চাঁদের দিকে এগোচ্ছে। মাথায় অন্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে ওর। এত গার্ড এখানে, তারা সব গেল কোথায়? গার্ড দেয়ার জন্যে সেকশন ভাগ করা আছে? তাহলেও তো এই অংশে দুয়েকজন থাকার কথা। কোথায় তারা? কুকুরের ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে ঘুমাচ্ছে নিশ্চিন্তে?

অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠেছে ওরা। অবশেষে ঝাড়া বিশ মিনিট পর চাঁদ ঢাকা পড়ল মেঘের আড়ালে। বেরিয়ে এসে চারদিক দেখে নিল রানা, তারপর এগোল। নিরাপদেই পৌঁছে গেল ফেন্সের ওপাশে। ফের চাঁদ উঁকি দিতে যাচ্ছে দেখে ঝেড়ে দৌড় লাগাল। পিছনে কোন হৈ-চৈ হলো না, কারও ছুটে আসার আওয়াজ এল না, কুকুরের কলজে হিম করা হাঁকও না, কিচ্ছু না।

ঝোপের আড়াল থেকে যার যার বাই সাইকেল তুলে নিল ওরা। ঘুরতে যাবে, এমন সময় পিছনে মৃদু নড়াচড়ার আওয়াজ উঠল। জমে গেল রানা। দীর্ঘদিনের অর্জিত অভিজ্ঞতা জানান দিল, হার হয়ে গেছে। দেরি হয়ে গেছে। এখন কিছু করতে যাওয়া মানে মৃত্যুকে তরান্বিত করা। চাপা কণ্ঠে হিরণকে বোকার মত কিছু করে না বসার জন্যে সতর্ক করল ও, তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ঘোরাল।

খাটোমত গাট্টাগোট্টা একটা কালো কাঠামো দেখল, ওর মাত্র পাঁচ হাত পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে আরও তিনজন, তারা প্রত্যেকে প্রকাণ্ডদেহী। বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো, ওদের আক্রমণ বা নিরস্ত্র করার কোন চেষ্টা দেখা গেল না কারও মধ্যে।

'কেমন দেখলি ভেতরে, রানা?' পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল সামনের খাটো লোকটা। ওই কণ্ঠ, অ্যাকসেন্ট, সবই বহু পরিচিত।

বিশ্বাস করতে ভরসা হলো না ওর। 'কে?'

'আমি! লিউ ফু চুঙ।' কাছে এসে রানাকে অক্টোপাস আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের এককালীন কলকাতা চীফ। ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ককিয়ে উঠল ও। 'আরে ছাড়্ ছাড়্! পাঁজর ভেঙে যাবে।'

'চোপ্ শালা! অনেক বছর পর দেখা, ঘাটতিটা পূরণ করতে দে।'

হিরণ তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে আছে দু'জনের দিকে। চুঙের তিন সঙ্গী আগের জায়গায় অনড়। সাইকেল হিরণের হাতে দিয়ে অনেক কষ্টে বন্ধুর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করল রানা। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল তার প্রায় গোল মুখের দিকে। 'তুই এখানে?'

'নে!' হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করল চিনা এজেন্ট। 'এতবছর পর দেখা, কোথায় কুশল জিজ্ঞেস করবি, তা নয়!'

মৃদু হাসি ফুটল ওর মুখে। 'হ্যাঁ, কুশল বিনিময়ের উপযুক্ত জায়গাই বটে।'

'তা যা বলেছিস।' চাঁদের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল লোকটার ঝকঝকে সাদা দু'সারি দাঁত। 'আয়, একটু সরে দাঁড়াই।'

ঘন জঙ্গলের আড়ালে এসে দাঁড়াল দু'জনে। অন্যরাও এল। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকল। 'কেমন আছিস্, দোস্ত?' বলল লিউ ফু চুঙ।

'ভাল। তুই?'

'এমনিতে ভালই আছি। তবে এদের,' ওয়্যারহাউস দেখাল সে ইঙ্গিতে। 'তৎপরতা দেখে উদ্বিগ্ন। ভেতরে কি কি দেখলি?' রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলে উঠল, 'পিয়েরো সিমকার অশুভ তৎপরতার খবর অনেক আগেই পেয়েছি আমরা। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে এক সপ্তা হলো হঙকঙ থেকে এখানে এসেছি। এতদিন তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আজ এসেছিলাম ভেতরে ঢুঁ মারব বলে। পৌঁছে দেখি আমার আগেই তুই সিঁদ কাটতে লেগেছিস। তাই আর ভেতরে ঢুকিনি, অপেক্ষা করছিলাম তোর ফিরে আসার।'

হাসল ফু চুঙ। 'কুকুর দুটোকে শেষ করে ভালই করেছিস্, দোস্ত। গার্ড শালাদের ঘুম পাড়াতে সুবিধে হয়েছে আমাদের।'

'গার্ড?' চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ। কুকুরের খোঁজ নেই দেখে ঘটনা চেক্ করতে এসেছিল ব্যাটারা, রাতের মত ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। ওই দ্যাখ!' আট-দশ হাত দূরে নিজের মিনি টর্চলাইটের আলো ফেলল সে।

তাকাল রানা। দুই ইউনিফর্ম পরা গার্ড মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে দেখতে পেল। ঘুমাচ্ছে হাঁ করে, চোখ আধবোজা। 'কিভাবে?'

'এইভাবে,' তর্জনী দিয়ে ট্রিগার টানার ভঙ্গি করল চুঙ। 'মাথার ওপর গ্যাস বম্ব ফাটিয়ে।'

আপনমনে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ভালই করেছিস্, ধন্যবাদ।'

'বল্ দেখি, ভেতরে কি ধরনের অস্ত্রশস্ত্র আছে?'

'তার আগে তোর সংস্থা কেন উদ্বিগ্ন, সেটা শুনি।'

'আমরা খবর পেয়েছি এরা ছবি নয়, অন্য কোন বদ উদ্দেশ্যে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, প্লেন, চপার, টর্পেডো, মিজাইল ইত্যাদি সংগ্রহ করছে। বলছে ছবির কথা, প্রস্তুতি নিচ্ছে অন্যকিছুর। আমাদের তৈরি মিগও সংগ্রহ করেছে এরা।'

'তোরা দিলে করবে না কেন?' বলল রানা। 'সিমকা রাজনৈতিক প্রভাব...'

'যা ব্যাটা!' খেঁকিয়ে উঠল লিউ ফু চুঙ। 'আমরা দিয়েছি কে দিল তোকে সে খবর? সিমকার প্রভাবের এক কানাকড়ি মূল্যও দেই না আমরা।'

'তাহলে ওসব এল কোত্থেকে?'

'আসছে তৃতীয় দেশ থেকে। দিয়েছে তাদের দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকরা, তোদের সো-কলড্ মুক্তবিশ্বের ধান্ধাবাজরা। যারা সহজে পয়সায় বিক্রি হয়ে যায়।'

তাকিয়ে থাকল ও বন্ধুর দিকে। 'খুলে বল।'

'সিমকা আর স্যার হিউ হচ্ছে শয়তানের বাবা। জানে, যত যা-ই বলুক না কেন, এতকিছু কোন দেশই দেবে না ওদের, উল্টে সন্দেহ করে বসবে। তাই কৌশলে তৃতীয় দেশের মাধ্যমে জোগাড় করেছে এতসব। মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছে তার কোন এক মিত্রের কাছ থেকে, রাশিয়ারগুলো সিরিয়ার মাধ্যমে, ব্রিটিশ ওয়েপনস্ জার্মানির কাছ থেকে, এইভাবে।'

'তোদেরগুলো?' ভাবল রানা, তাই তো বলি!

'তোদের এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে।'

'পাকিস্তান?'

মাথা দোলাল চুঙ। 'মিয়ানমার।'

'তারপর?'

'এসব দেশের মাথা আর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর প্রত্যেকের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কিনে নিয়েছে এই দুই শয়তান। তাদেরই জনগণের ট্যাক্সের টাকায় অথবা ঋণের মাধ্যমে তাদেরকে দিয়েই কিনিয়েছে এসব দেশের প্রতিরক্ষায় প্রয়োজন বলে। তারপর গোপনে পাচার করে দিয়েছে। এরা অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কাজ শেষ হলে ফেরত দেবে। কিন্তু আমরা জানি সে দিন কোনদিনও আসবে না।'

'আর সব দেশ জানে এ খবর?'

'আর কারও কথা জানি না, দোস্ত, আমরা জানি। জানি বলেই তো খোঁজ নিতে এসেছি আসলে কি চলছে।'

কিছু ভাবল রানা। 'কি করে টের পেলি তোরা?'

'ছ'মাস দশ দিন আগে আটটা লেটেস্ট সিরিজের মিগ উনিশের চালান পৌঁছে দিয়েছিলাম আমরা ইয়াঙ্গুনে। বিক্রির শর্ত অনুযায়ী ছয় মাস পর পর ওগুলোর সার্ভিসিং করে দেয়ার কথা আমাদের এক্সপার্টদের। কিন্তু সময়মত মিয়ানমার গেলেও কাজ করতে দেয়া হয়নি এক্সপার্টদের। বিমানগুলোর

ধারেকাছেও তাদের ঘেঁষতে দেয়া হয়নি সার্ভিসিং প্রয়োজন নেই বলে। পরে আমাদের ওখানকার সোর্স জানিয়েছে প্লেনগুলো নাকি ওদেশেই নেই, হাওয়া হয়ে গেছে।'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা।

'এরপর গত সপ্তায় আমাদের এক গোয়েন্দা স্যাটেলাইট প্লেনগুলোকে আবিষ্কার করে এখানে। খবর পেয়ে ছুটে আসি আমি। এই হচ্ছে ঘটনা,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'তোদের এখানকার ব্যুরো চীফকে হত্যা করা হয়েছে জানি। তারপর তুই এসেছিস তাও জানি। ছদ্মপরিচয়ে তোর প্রযোজক সাজার অভিনয় দেখে গত দু'দিন হেসেছি মনে মনে।'

'তোর তদন্ত কতদূর?'

'প্রায় শেষ। ভেতরে কি কি আছে জানা গেলেই সিমকার বাচ্চার নাড়িভুঁড়ি বের করে আনব গলা দিয়ে। আমার সব তো শুনলি, এবার বল্, তুই কি কি দেখলি?'

'আর একটা প্রশ্ন আছে আমার।'

'কি?'

'ন্যাটোর কিছু আইটেমও আছে এদের কাছে। ওগুলো···'

'বুঝেছি কি জানতে চাস্,' মাথা দোলাল লিউ ফু চুঙ। 'ওরাই দিয়েছে। কয়েকটা হিট অ্যান্ড রান স্পীডবোট। আনুষঙ্গিক অস্ত্র-গোলাবারুদ ছাড়া হার্মলেস। তা বেশ কিছুদিন আগে দিয়েছে ওগুলো ওরা। ছবির কাজে এরকম এক-আধটা আইটেম দেয়ায় আইনগত কোন বাধা নেই।'

চোখ কুঁচকে বন্ধুকে দেখল রানা। 'তুই ন্যাটোর মুখপাত্র হয়েছিস কবে?'

'এখানে আমি ওদের সহযোগী হয়ে কাজ করছি, রানা। ইন্টারপোলেরও। ন্যাটোর সাথে সিমকার চুক্তি আছে প্রতি দু'সপ্তা পর পর ওদের ইন্সপেকশন টীমকে এই ওয়্যারহাউস পরিদর্শন করতে দেবে সে। কিন্তু দিচ্ছে না ব্যাটা। প্রথমে দিয়েছে দুই দফা, তারপর বন্ধ করে দিয়েছে। নানান অজুহাতে বারবার ফিরিয়ে দিচ্ছে ওদের। ন্যাটো তাই চিন্তিত। ইন্টারপোলও। কিন্তু কিছু করতে পারছে না প্রমাণের অভাবে। অনেক চেষ্টা করেছে ওরা সিমকার দলে নিজেদের কাউকে ঢোকাতে, পারেনি।'

'তাই তোর সাহায্য চেয়েছে?'

'হ্যাঁ। হয়তো তোর কাছেও চাইবে। তোর ওপরও নজর রেখেছে ওরা।'

'ওদের প্রস্তুতি কেমন?' প্রশ্ন করল রানা। 'কত শর্ট নোটিসে অ্যাকশনে নামতে পারবে?'

'দুই ঘণ্টা!' একটু বিরতি দিল ফু চুঙ। 'কি কি আছে ভেতরে, রানা?'

'যা আছে, তাতে কয়েকবার ধ্বংস করা যাবে পৃথিবী।'

থমকে গেল ফু চুঙ। 'কি বলছিস্!'

'যা দেখেছি তাই।'

'কি কি আছে বল্, রানা,' চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল তার।

'এখানে সময় নষ্ট না করে সরে পড়ি, চল্। পথে বলব।'

'কোথায় যাবি?'

'রোম। চীফের সাথে কথা বলব। ওঁকে রিপোর্ট করতে হবে।'

'বেশ তো, আমার সাথে চল্। এ কাজ আমার ওখান থেকেও করতে পারবি। তবে আমার মনে হয় এখন কথা বলে সময় নষ্ট না করে আগে আমাদের অ্যাকশনে নামা উচিত। তুই যা বললি তাতে সেটাই সঠিক হবে।'

ঠিক বলেছে ফু চুঙ, ভাবল রানা। ফিরে গিয়ে আগে ওকে সব ব্যাখ্যা করতে হবে বৃদ্ধকে, জেনে নিয়ে তিনি নির্দিষ্ট চ্যানেলে রোমের সাথে যোগাযোগ করবেন, তারপর আসবে অ্যাকশনের কথা। এর মাঝে নিশ্চয়ই কিছু সময় নষ্ট হবে। কতক্ষণ কে জানে? এত ঝামেলায় না গিয়ে যা রানা করতে চাইছে, তা যদি ন্যাটোকে দিয়ে করিয়ে নেয়া যায়, ক্ষতি কি? পরে না হয় বুঝিয়ে বলা যাবে সব তাঁকে।

'চল্ তাহলে,' বলল রানা। 'হিরণ, চলে এসো।' চিনা ভাষায় নিজের তিন সঙ্গীকে কিছু নির্দেশ দিল লিউ, মাথা দুলিয়ে সায় দিল দু'জন। অন্যজন এগিয়ে এল। 'ওদের পাহারায় রেখে যাচ্ছি,' নিজে থেকেই বলল সে। 'নজর রাখবে।'

রানা কিছু বলল না। দ্রুত হেঁটে চলল ওরা গাড়ির অবস্থানের দিকে। লিউর নির্দেশে ওদের সাইকেল দুটো দুই কাঁধে তুলে নিয়েছে তার বিশালদেহী সঙ্গী। নিজেরটা দিতে চায়নি হিরণ, ছাড়েনি লোকটা। প্রায় কেড়েই নিয়েছে। অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে নীরবতা ভাঙল লিউ। 'রানা!'

'বল্।'

'সোহানাদি কেমন আছে রে?'

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে উদাস কণ্ঠে বলল ও, 'জানি না।'

মুখ ঘুরিয়ে রানাকে দেখল সে। মৃদু গলায় বলল, 'বিয়ে করতে করতেও শেষ পর্যন্ত কেন করলিনে তোরা, দোস্ত?'

চুপ করে থাকল ও। মনটা যেন আর কোথাও হারিয়ে গেছে। 'করলে ওর ভেতরের তেজস্বী মেয়েটিকে মিস্ করতাম আমি। সোহানাও স্বামীর মধ্যে ওর প্রিয় সেই রানাকে আর খুঁজে পেত না। তাই।'

মাথা দোলাল সে। 'অনেক বছর হলো দেখি না। কেমন আছে সোহানাদি?'

'জানি না।'

'কোথায় আছে তাও নিশ্চই জানিস না?'

দীর্ঘশ্বাস মোচন করল ও। 'ঠিক ধরেছিস।'

'এমন প্রেমই করলি, বন্ধু, প্রেমিকার খোঁজটাও রাখার প্রয়োজন মনে করিস না!'

'কি হবে রেখে? তুই তো রবীন্দ্রনাথ পড়েছিস, মনে নেই তাঁর সেই বিখ্যাত দুই পঙক্তি, "পথের ধূলি পথেরে না দিলে জঞ্জাল জমে শেষটা"?'

মাথা দোলাল ফু চুঙ। 'হ্যাঁ, পড়েছি। আরও পড়েছি, "আমারে পাছে

সহজে বোঝো তাইতো এত লীলার ছল, বাহিরে যার হাসির ছটা ভেতরে তার অশ্রুজল"।'

'দারুণ! আজও সে সব মনে রেখেছিস?' বলল বটে রানা, কিন্তু একইসাথে বুকের কোথায় যেন খচ্ করে কাঁটার খোঁচাও খেল।

আট

প্রায় যানবাহনশূন্য হাইওয়ে ধরে তীব্র গতিতে রোমের দিকে ছুটে চলেছে ফু চুঙের ফিয়াট লাক্সারি লিমুজিন। ড্রাইভ করছে ও নিজে, রানা পাশের সীটে বসা। হিরণ পিছনে। ওদের বুইক নিয়ে পিছন পিছন আসছে চুঙের সঙ্গী।

মাত্র বারো মিনিটে শহরে পৌঁছে গেল ওরা। আরও চার মিনিট পর পৌঁছল ট্রাসটিভেয়ারে। কয়েকবার এ রাস্তা ও রাস্তা করে বড়সড় এক বিল্ডিঙের বন্ধ গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল চুঙ। গেটের গায়ের চৌকো এক গর্ত খুলে বাইরে তাকাল গার্ড, গাড়ির হেড লাইট দু'বার হাই-ডীপ করে সঙ্কেত দিল চিনা, প্রায় সাথে সাথে একপাশে সরে গেল বিদ্যুৎচালিত গেট। সাঁ করে ঢুকে পড়ল গাড়ি। সামনেই চওড়া এক র‍্যাম্প, ওটা বেয়ে নেমে গেল বেশ বড় এক সাব-বেজমেন্ট পার্কিং এরিয়ায়।

পার্কে অনেকগুলো গাড়ি দেখতে পেল রানা, নানান দেশের নাম্বার প্লেট ওগুলোর। ছয়টা ইটালিয়ান গাড়ি আছে ওর মধ্যে। আর আছে একটা জার্মান, একটা আমেরিকান, একটা ব্রিটিশ, একটা সুইস, একটা অস্ট্রিয়ান। ইটালিয়ানগুলোর তিনটার প্লেট ডিপ্লোম্যাটিক।

নেমে পড়ল ওরা। ফু চুঙের ইঙ্গিতে সামনের এক অটোম্যাটিক এলিভেটরের দিকে এগোল একযোগে। চারতলায় থামল এলিভেটর। দীর্ঘ, নির্জন এক করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। দু'পাশে বেশ কয়েকটা ঝকঝকে পালিশ করা দরজা, সবগুলো বন্ধ। কোনটায় কোন নেমপ্লেট নেই। করিডরের এক মাথায় একটা খোলা জানালা দেখতে পেল রানা। তার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক স্টেনধারী গার্ড। নির্বিকার চেহারা।

মুসোলিনি আমলের কোন সরকারী অফিস বিল্ডিঙ হবে এটা, ভাবল রানা। চেহারা সুরত তাই বলে। বাঁ দিকের তৃতীয় দরজায় নক্ করল লিউ ফু চুঙ, সঙ্গে সঙ্গে চড়া কণ্ঠে আহ্বান জানাল কেউ ভেতর থেকে। 'কাম ইন!'

নব্ ঘুরিয়ে দরজা মেলে ধরল ফু চুঙ, মাথা ঝাঁকাল রানার উদ্দেশে, 'আয়। তুমিও এসো,' হিরণকে বলল সে।

ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। অভ্যেসবশে ঘরে পা রেখেই চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল রানা। বেশ বড়, আয়তকার একটা রুম। মেঝেতে পুরু কার্পেট, জানালায় দামী ড্রেপার। চার দেয়ালের রঙ হাল্কা নীল। মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। ঘরের এক মাথায় আধখানা চাঁদের মত প্রকাণ্ড এক

ডেস্ক। তার ওপর বিভিন্ন রঙের আটটা টেলিফোন শোভা পাচ্ছে। রুমের এক কোণে বড় এক টেলিভিশন সেট।

ওপাশে পুরু গদি মোড়া একসার চেয়ারে বসে আছে এগারোজন নানা বর্ণের মানুষ। একজন বাদে আর সবার বয়স ষাটের ওপর হবে অনুমান করল রানা। এদের কাউকে জীবনে দেখেনি ও, চেনে না। ওরই ওপর সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ টের পেয়ে নিজেকে পরীক্ষার্থী মনে হলো রানার। আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসের ওপর পিএইচডি লাভের জন্যে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হাজির হয়েছে যেন, ওপাশের সবাই আন্তর্জাতিক ফ্যাকাল্টি কমিটির সদস্য।

ওকে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিল ফু চুঙ, কিন্তু সুযোগ পেল না। তার আগেই রানার সোজাসুজি বসা ছিপছিপে স্বাস্থ্যের অভিজাত চেহারার মানুষটি কথা বলে উঠল বিনয়ের সাথে। 'আহ্! মিস্টার মাসুদ রানা, ফ্রম বিসিআই, আই বিলিভ, স্যার?'

ষাটের কোঠার মাঝামাঝি হবে লোকটার বয়স, অনুমান করল ও। চুলের রঙ উজ্জ্বল হলুদ। চোখে সোনালী রঙের হাফ গ্লাস। তোবড়ানো গাল। লোকটার নাটুকে ভঙ্গি দেখে আরেকটু হলে প্রায় হেসেই ফেলেছিল রানা। সামলে নিল। সমান বিনয়ের সাথে জবাব দিল, 'ঠিক ধরেছেন। আমি কার সাথে কথা বলছি, স্যার?'

'বলছি। প্লীজ, বসুন,' সামনের চেয়ার ইঙ্গিত করল লোকটা। ফু-চুঙ ও হিরণের দিকে তাকাল। 'আপনারাও বসুন দয়া করে।'

বসল ওরা। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল। সামনের প্রত্যেকে গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছে রানাকে। বোঝা যায় ওর সম্পর্কে এরমধ্যে সব জেনে হাফেজ হয়ে বসে আছে মানুষগুলো। লিউ ফু-চুঙের দিকে ফিরল হলুদ চুলওয়ালা। মুখে সন্তুষ্টির হাসি। 'মিস্টার রানাকে নিয়ে আসার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, মিস্টার চুঙ। অনেক ধন্যবাদ আমাদের সবার তরফ থেকে।' একটু বিরতি দিয়ে ওর দিকে ফিরল লোকটা। 'মিস্টার রানা, আমি কর্নেল পিয়েট নরডেন। নরওয়ে। ইন্টারপোলের সাথে জড়িত।'

একটা পাঁচ বাই চার দামী ফোল্ডার এগিয়ে দিল সে রানার দিকে। 'পড়ে দেখুন, প্লীজ! আমার পরিচয়পত্র।'

নিল ওটা মাসুদ রানা। ভেতরে চোখ বোলাল। দেখা গেল মানুষটা ইন্টারপোলের অন্যতম মাথা। কার্ডটা ফিরিয়ে দিল ও নীরবে

'আপনার রোম উপস্থিতির খবর যেদিন আপনি এলেন, সেদিনই পেয়েছি আমরা। আমাদের খুব ইচ্ছে ছিল আপনার সাথে যোগাযোগ করার, কিন্তু সিমকা আমাদের সে সুযোগ দেয়নি। সে যাই হোক; অবশেষে আমরা মিলিত হয়েছি, সেটাই এখন বড় কথা। মিস্টার চুঙের মুখে শুনেছি আপনি তাঁর খুব পুরনো ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই আপনাকে এ পর্যন্ত নিয়ে আসার দায়িত্ব আমরা ওঁর ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে ছিলাম।'

থামল কর্নেল। মুহূর্তে অন্য কোন চিন্তা গ্রাস করল তাকে। চোখ কুঁচকে রানার চুলের দিকে তাকিয়ে থাকল। অন্যদের মধ্যে দু'তিন জন নড়েচড়ে

বসল। পিন পতন নীরবতা ঘরে। খানিক পর মুখ তুলল কর্নেল। লিউ ফু-চুঙকে দেখল। 'আপনাদের দেখা হলো কোথায়?'

ঘটনা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল সে। মাথা দোলাল পিয়েট নরডেন। রানার উদ্দেশে বলল, 'আমি আপনার নিয়োগকর্তা নই, তাই আপনাকে কোন প্রশ্ন করা ঠিক নয়। তবু ভরসা আছে আপনি, আমি-আমরা সবাই এ মুহূর্তে একই কাজে জড়িত। একদল অর্ধ উন্মাদের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষার চেষ্টায় আছি। যদি দয়া করে বলেন, ওয়্যারহাউসে কি কি দেখেছেন, মানে···'

'বলব বলেই এসেছি আমি,' বলল রানা।

'দ্যাট'স ভেরি কাইন্ড অভ ইউ, স্যার।'

'তার আগে আপনার সঙ্গীদের পরিচয় জানতে পেলে খুশি হব।'

লজ্জা পাওয়া হাসি দিল কর্নেল। 'ছি ছি, কি লজ্জার কথা! ওদিকের কথা চিন্তা করতে গিয়ে এদিকের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।' ডানদিকের পাঁচজনকে দেখাল সে এক এক করে, নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল তারা। 'ও মাথায় বসেছেন জেনারেল মাসেরাতি, ইটালিয়ান। ন্যাটো। তাঁর এপাশে কর্নেল লে গ্র্যান্ডি, অস্ট্রিয়া। ইন্টারপোল। হের বারজেন, জার্মানি। ইন্টারপোল। কেনেথ লিন্ডসে জোনস, ইংল্যান্ড। ন্যাটো। আর ইনি পলকভনিক ইউরি পেরেসটভ, রাশিয়া। ইন্টারপোল।'

বাঁ দিকে নজর দিল এবার নরডেন। 'ও মাথায় বসেছেন মাইকেল রবার্টসন, আমেরিকা। ইন্টারপোল। জেনারেল লুইগি, ইটালি। ন্যাটো। কর্নেল ট্রসেন, সুইটজারল্যান্ড। ইন্টারপোল। কর্নেল পন্টিসেলি, ইটালি এবং কর্নেল সিলাচি, ইটালি। এঁরা দু'জন ন্যাটোর।'

নড়েচড়ে বসল রানা। বলে যেতে থাকল। এগারো জোড়া চোখ, সমান সংখ্যক কান স্থির, খাড়া হয়ে থাকল ওর বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত। কাউকে কোন তথ্য টুকে রাখার জন্যে ব্যস্ত হতে দেখা গেল না, কেউ বাধা দিল না কথার মধ্যে। নীরবে কান দিয়ে শুনল, তারপর মস্তিষ্কের তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দিল তথ্যগুলো। রানার বলা শেষ হতে একটা মেমো শীটে কিছু লিখল কর্নেল নরডেন, ইন্টারকমে কাউকে ডাকল।

তারপর ডানে-বাঁয়ে নজর বোলাল। 'আমরা তাহলে স্ট্রাইকের জন্যে প্রস্তুতি নিতে পারি, কি বলেন?'

দশটা মাথা একযোগে দু'বার ওঠানামা করল। মনে হলো ব্যাপারটা যেন আগে থেকে রিহার্সেল করা ছিল। এক যুবক এসে ঢুকল রুমে। প্রায় রানার সমান লম্বা সে, পাশে দুইগুণ। চেহারা কঠিন। তার হাতে শীটটা দিল কর্নেল। 'এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রুপস্ আর ট্রান্সপোর্ট রেডি চাই আমি।'

যুবক বেরিয়ে যেতে রানার দিকে তাকাল। 'সরকারী অনুমোদন পাওয়ামাত্র রওনা হব আমরা, মিস্টার রানা। এখন বাজে,' হাতঘড়ি দেখল সে। 'সাড়ে তিনটা। আশা করি পাঁচটার মধ্যে পুরো প্রস্তুত হয়ে যাবে আমাদের ফোর্স। তারপর অনুমতি চাওয়া হবে।'

'যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, ততই ভাল,' বলল লিউ ফু চুঙ। 'মৃত কুকুর

আর গার্ড নিখোঁজ, জানাজানি হলেই…'

'জানুক না,' হাসল কর্নেল। 'তাতে কি? অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে ফেলবে? অসম্ভব! অত সমস্ত হেভি ওয়েপনস্, প্লেন-ট্যাঙ্ক এইটুকু সময়ের মধ্যে কোথায় সরাবে ওরা?'

নড়ে বসল কর্নেল পন্টিসেলি। এই লোক বয়সে সবার কনিষ্ঠ, পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের মত হবে। 'সে চেষ্টা যদি করা হয়, আমাদের ফাঁদে পা দেবে ওরা,' বলল সে। 'এক সপ্তা ধরে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছি আমরা।'

'ভেতরে আপনি যা যা দেখেছেন বললেন, মিস্টার রানা,' বলে উঠল ন্যাটোর কেনেথ লিন্ডসে জোনস। 'তার শতকরা বিশভাগও যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, যত প্রভাব আর ক্ষমতাই থাক পিয়েরো সিমকার, কাল দুপুরের মধ্যে ধুলোয় মিশিয়ে দেব আমরা ওকে।'

'ওয়েল, জেন্টেলমেন, এবার বোধহয় আমরা একটু রিল্যাক্স করতে পারি?' কর্নেল নরডেন হাসল। 'কিছুটা সামাজিক হতে পারি, ইভেন একটু গলা ভেজাতেও পারি। আর সময় যখন আছেই, একটু গল্প-গুজবও করতে পারি।' ইন্টারকমে দ্রুত কিছু নির্দেশ দিল সে। যেন তৈরিই ছিল, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মিনি ইউনিফর্ম পরা দুই সুন্দরী যুবতী। প্রকাণ্ড এক ট্রলি ট্রেতে রাজ্যের খাবার ও পানীয় নিয়ে এসেছে।

ওরা বেরিয়ে যেতে ঘরের পরিবেশ সত্যিই অনেকটা সামাজিক হয়ে উঠল। গাম্ভীর্য খসে পড়ল সবার, খাওয়ার ফাঁকে এ-গল্প সে-গল্পে মেতে উঠল। 'কি আশ্চর্য, দেখুন,' ডি-ডে প্রসঙ্গ উঠতে বলল কর্নেল নরডেন। 'মাত্র কয়েক বছর আগেও এরা কেউই কোন ফ্যাক্টর ছিল না। অথচ আজ সেই মানুষগুলোই পৃথিবীর সবচে' বড় ফ্যাক্টর। স্যার হিউ মারসল্যান্ড অতীতে নিজ দেশে একজন সৎ রাজনীতিক ও ফিন্যান্সিয়ার হিসেবে পরিচিত ছিল। সবার শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। লরেনযো কন্টি ছিল আর দশজন প্রযোজকের মতই একজন, ছবিতে টাকা খাটিয়ে কি করে তার বহুগুণ তুলে আনা যায়, সেই চিন্তা করত। স্টাডস ম্যালোরি ছিল এক জিনিয়াস পরিচালক। বাকি থাকে লিটল জায়ান্ট। এই লোক অবশ্য বেশ আগে থেকেই প্রভাবশালী ছিল। পড়ুয়ার মাফিয়া ডন ছিল। পয়সা ছিল তার। পয়সা জায়গামত খাটিয়ে নিজের প্রভাব কি করে আরও বাড়ানো যায়, ঘটে সে বুদ্ধিও ছিল।

'নিজের প্রভাব বাড়ানোর লক্ষে কাজ করে গেছে প্রথম থেকেই। ফলে আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, প্রমাণ ছাড়া তার বিরুদ্ধে একটা আঙুল যদি কেউ তোলে, তোলপাড় ঘটে যাবে ইটালিতে। এদেশের সবগুলো রাজনৈতিক দল, ডান-বাম আর মধ্যপন্থী, প্রত্যেকে তার পক্ষ নেবে। কারও ক্ষমতা নেই সে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার।'

'আর যদি কন্টির স্টুডিওয় হানা দিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ আমরা জোগাড় করতে পারি,' বলল জেনারেল লুইগি। 'তাহলে ওকে সবার চোখের সামনে পিষে ফেললেও কেউ একটা আঙুলও তুলবে না।'

'মাফিয়া ছাড়া,' চট করে বলে উঠল কর্নেল সিলাচি।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল জেনারেল। 'ওদের কথা খেয়াল ছিল না।'

হাসি ফুটল প্রত্যেকের মুখে। কেউ কেউ শব্দ করে হাসল।

'ভাল কথা,' রানার দিকে ফিরল ইন্টারপোলের সুইস প্রতিনিধি, ট্রুসেন। 'এই গ্রুপে যে আপনাদের দেশী একজন আছে, সাম হেদায়েত, লোকটা একাত্তর সালে দেশের কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে, জানেন নিশ্চই?'

'জানি। ওর বিরুদ্ধে দুটো খুনের ঘটনা প্রমাণও হয়েছে।'

'এই মানুষটিও জড়িত আছে সিমকাদের সাথে,' মুখ ভর্তি স্যান্ডউইচের ফাঁক দিয়ে বলে উঠল কর্নেল নরডেন। 'কম্পিউটর জিনিয়াস। স্যার হিউর কেনা গোলাম। সে-ই নাকি আজও খাড়া রেখেছে লোকটাকে, নইলে অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত।'

খাবার সামলে এক ঢোক হর্স দ' ভ্রিস গিলল কর্নেল। 'বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পালিয়ে ইংল্যান্ডে চলে যায় হেদায়েত। ওখানে কম্পিউটরের ওপর জটিল কিছু কোর্স করতে গিয়ে নিজে থেকেই কম্পিউটর জিনিয়াস বনে যায়। স্যার হিউর জন্যে কিছু কিছু অ্যাডের কাজ করতে গিয়ে তার চোখে পড়ে মানুষটা। তারপর হঠাৎ নার্ভাস ব্রেকডাউন ঘটে তার মানসিক চাপের কারণে, কয়েকটা হত্যাকাণ্ড ঘটায়, তারপর ভর্তি হয় স্যার হিউর রেস্ট ফার্মে। ওটার কথা তো জানেনই আপনি।'

'ইজিফুল একরস, সাসেক্স,' বলল ও।

'প্রিসাইজলি। দশ-বারো বছর আগে হঠাৎ করেই স্যার হিউর মানসিক ভারসাম্য টলে যাওয়ার লক্ষণ দেখা দেয়, অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে সে। ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে হিউ, নিজেই নিজের চিকিৎসার আয়োজন করে। পঁচাশি সালের কথা সেটা। তখন জার্মানি থেকে ইংল্যান্ডে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয় এক নামকরা ডাক্তার, তার সাহায্য নেয় সে।'

'ডক্টর আনটেনওয়েইজার,' মৃদুকণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

হেসে মাথা দোলাল কর্নেল। 'ঠিক।'

'জুঙফেক।'

চোখ তুলে রানাকে এক পলক দেখল লিউ ফু চুঙ। মুখে প্রশংসার হাসি। খেয়াল করল না ও। 'চিনাম্যান জুঙ শুধু সম্মোহনের মাধ্যমে অজ্ঞান করতেন তাঁর রোগীদের, ডক্টর ওয়েজার তা করত না। তার চিকিৎসা পদ্ধতি মোটামুটি এক হলেও ট্রাংকুইলাইজার এবং আরও কি কি সব ওষুধ যেন প্রয়োগ করে রোগীকে অজ্ঞান করত সে, এরপর তার ওপর প্রয়োগ করত জুঙের ট্রানসেনডেন্টাল মেডিটেশন বা আই চিঙ পদ্ধতি। স্যার হিউর ওপরও একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে তার সাইকোটিক সাইকেল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে লোকটা।'

গরম কফিতে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। কর্নেল ও ফু চুঙকে অফার করল। 'তারপর,' একগাল ধোঁয়া ছেড়ে শুরু করল আবার নরডেন। 'স্যার হিউ খুব বেশিরকম উচ্চাভিলাষী ছিল। এখনও তাই আছে। শারীরিক

অসুস্থতা, বিরাট কিছু হতে চেয়ে ব্যর্থ হওয়া আর প্রচণ্ড খাটুনী, এই তিন কারণে মানসিক ভারসাম্য হারায় সে। পরপর কয়েকটা নামকরা মেয়ে মডেলকে হত্যা করে যৌন ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে। গলা টিপে মারে আর কি!

'কিন্তু লোকটা তখন যথেষ্ট প্রভাবশালী, অর্থবিত্তের মালিক। সরকারই তার পক্ষ নেয়, ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে ফেলে। আপনাদের হেদায়েত, কন্টি, ম্যালোরি এবং সিমকা, এরা প্রত্যেকে স্যার হিউর মত একই রোগের শিকার। রোগটার নাম, অ্যাগ্রিওথিমিয়া অ্যামবিটিওজা। দীর্ঘদিনের সমাজ ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা ইত্যাদি ধ্বংস করার এক অদম্য, অপ্রতিরোধ্য বাসনা।'

সাদেকের 'AA' নোটেশনের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল, ভাবল রানা।

'সাধারণ অনেকের মধ্যেই আছে এ রোগের লক্ষণ। অনেক সময় বিভিন্ন কারণে মানুষের মনে সমাজের ওপর রাগ, ক্ষোভ, বিতৃষ্ণা জন্মে। সেসব থেকে ক্রমে এই রোগের সৃষ্টি হয়। অন্যদের বেলায় যেমন-তেমন, স্যার হিউর ব্যাপারটা একটু অন্যরকম, কারণ সে সাধারণ ছিল না। ছিল অসাধারণ। তার পয়সা ছিল, প্রভাব ছিল। আর ছিল ধৈর্য। শেষের গুণটার কথা আসছে এই জন্যে যে নিজস্ব পদ্ধতির চিকিৎসার সাহায্যে ডক্টর ওয়েজার তাকে আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ করে তুলতে পারলেও আসলে তার বড়রকম ক্ষতিই করে বসে। ঘৃণা, ক্ষোভ ইত্যাদির পরিধি বেড়ে যায় স্যার হিউর। সে কথায় একটু পরে আসছি।'

সিগারেটে লম্বা টান দিল নরডেন। কথা বলার আর্ট জানে মানুষটা। তাই কাহিনী জানা থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত প্রায় সবাই তার কথা মন দিয়ে শুনছে। 'স্যার হিউর ধৈর্যের কথা বলি এবার,' শুরু করল সে। 'ডক্টর ওয়েজারের ওপর সন্তুষ্টি বা নিজের ওপর আস্থাহীনতা থেকে হোক, অথবা ভবিষ্যতে বড় কিছু অর্জনের উদ্দেশ্যে হোক, সাসেক্সে বিশাল এক ফার্মল্যান্ড কিনে সেখানে বিশেষ রোগীদের জন্যে এক হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করে সে, ওয়েজারকে বসিয়ে দেয় তার প্রধান হিসেবে। নার্ভাস ডিজঅর্ডারনেস, ড্রাগ ও ড্রিঙ্ক উইথড্রল ইত্যাদির চিকিৎসা করার মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু হয় ইজিফুল একরসের। দিনে দিনে বাড়তে থাকে ওদের চিকিৎসার ক্ষেত্র।

'আশির দশকের শেষ দিকে ডি-ডের নায়িকা, ক্যামিলা ক্যাভোর ওখানে প্রথম ভর্তি হয় মেন্টাল ব্রেকডাউনের শিকার হয়ে। সিমকা নিজ খরচে ভর্তি করে তাকে। সময়টা ছিল ক্যামিলার জীবনের সবচে' বড় টার্নিং মোমেন্ট। সাধারণ এক কলগার্ল থেকে ছবির জগতে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে তখন। আশ্চর্য যে ওয়েজারের চিকিৎসায় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায় মেয়েটি। সুস্থই আছে আজও পর্যন্ত।'

শেষ টান দিয়ে সিগারেট অ্যাশট্রেতে পিষে ফেলে দিল মাসুদ রানা। অবাক হওয়ার বিশেষ কিছু নেই, তবু কিছুটা হলো। ক্যামিলার কমনীয় মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। কালকের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল। সকালে অমন একটা চিঠি লিখে রেখে গেল, অথচ বিকেলে স্টুডিওতে পুরোটা সময় বেশ গম্ভীর দেখা গেল ওকে, কেন?

'ভাগ্যের কি খেলা দেখুন,' বলে চলল পিয়েট নরডেন। 'মেয়েটা সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ম্যাসিভ নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হয়ে ওখানে ভর্তি হলো আপনাদের হেদায়েত, স্টাডস ম্যালোরি, লরেনযো কন্টি ও পিয়েরো সিমকা, মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে।

'পরীক্ষা করে তাদের প্রত্যেকের ভেতর স্যার হিউর সেই রোগের লক্ষণ পাওয়া গেল। তাদের ধারণা, সমাজ, জাতি তাদের হেয় করেছে নানাভাবে। সেই ক্ষোভ পুষে রেখেছে তারা দীর্ঘদিন। প্রতিকার করার সুযোগ পায়নি। ফলাফল নার্ভাস ব্রেকডাউন। হেদায়েতের বিশ্বাস একান্তর সালে সে যা করেছে, ঠিকই করেছে। অথচ বিনিময়ে সমাজ, জাতি তাকে ধিক্কার ছাড়া কিছু দেয়নি।

'কন্টির ধারণা তার জমি কেড়ে নিয়ে সরকার তাকে তুচ্ছ করেছে, অপূরণীয় ক্ষতি করেছে তার। ম্যালোরি অস্কারের জন্যে মনোনীত হয়েছে দু'বার। অথচ শেষ মুহূর্তে পুরস্কার পায়নি। অপদস্থ বোধ করেছে সে। আর থাকল সিমকা। বামন বলে সবসময়ই মানুষ করুণা করত তাকে। আড়ালে তো বটেই, প্রকাশ্যেও হাসাহাসি করত। সে জন্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল মনে। সেটাই বিস্ফোরিত হয় একদিন তাকে নিয়ে আঁকা এক কার্টুনকে কেন্দ্র করে সিনেটে হাসাহাসি হয় বলে। আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল লোকটা, ব্যর্থ হয় শেষ পর্যন্ত। অনেকের মতে কারণটা নাকি হাসাহাসি নয়, সিমকা-ক্যামিলার একান্ত ব্যক্তিগত।

'সে যাই হোক, চিকিৎসা চলতে থাকে এদের সবার। স্যার হিউ রেস্ট ফার্মের মালিক, মাঝেমধ্যে যায় সে ওখানে ডিরেক্টরাল ভিজিটে। তার পক্ষে রোগীদের রেকর্ডস্, ডায়াগনোস্টিক নোটেশনস্ ইত্যাদিতে চোখ বোলানো খুবই স্বাভাবিক। হেদায়েতের অসুখ জানত হিউ, ভিজিটে গিয়ে এদের তিনজনের খবরও জানল, এবং তার ধৈর্যের পরীক্ষা একটা পরিণতি লাভ করল।

'ওয়েজারের ফেক চিকিৎসার ফল হিসেবে ততদিনে তার ভেতরের জমাট বাঁধা ক্ষোভ, ঘৃণা ইত্যাদি আকাশছোঁয়া বিস্তৃতি লাভ করেছে। এতই বিস্তার লাভ করেছে যে সমাজ আর আইন ব্যবস্থা ধ্বংস করা তখন তার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনা। প্রতিশোধ স্পৃহা বেড়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আরও অনেক বড়, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকেই একটা শিক্ষা দেয়ার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গেছে সে তখন।

'পাঁচ প্রতিশোধকামী জিনিয়াস এক হলো, মতের মিল হলো, কাঠামো প্রস্তুত হলো মেগালোম্যানিয়াক স্কেলিটন, ডি-ডে নামে। টাকা আর রাজনৈতিক প্রভাব অনেক বেশি বলে দলের নেতৃত্ব নিল সিমকা, স্যার হিউ মেনে নিল বিনাপ্রশ্নে। বুদ্ধিও আছে সিমকার, নানান দেশের মাধ্যমে জোগাড় করল সে এতসব ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র। এরটা ওকে দিয়ে, ওরটা তাকে দিয়ে কিনিয়ে এনে জড়ো করেছে ওরা। একশো মিলিয়ন ডলার সো কল্ড ডি-ডে'র বাজেট, যার এক তৃতীয়াংশই এসেছে এক দল খুচরো বিনিয়োগকারীর পকেট

থেকে। ওরা নিজেরা হয়তো পকেটের টাকা ঢালেইনি এ প্রজেক্টে। উল্টে সুইটজারল্যান্ডে নিজেদের গচ্ছিত সমস্ত ধন-সম্পদ, বিশেষ করে সোনা, সব সরিয়ে ফেলেছে অজ্ঞাত কোথাও। অনুমান, একুশ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনা,' বিরতি দিয়ে বিড়বিড় করে বলল কর্নেল। 'ক্যান ইউ ইমাজিন?'

ঘুরে রানাকে দেখল লিউ ফু-চুঙ। কি ভেবে হাসল। 'তুইও তো পাঁচ মিলিয়ন ইনভেস্ট করেছিস্।'

'হ্যাঁ,' আরেকটা সিগারেট ধরাল ও। হাসছে মিটিমিটি। 'চেক দিয়েছি। তবে ওটা অনারড্ হবে কি না ভেবে চিন্তিত।'

শব্দ করে হেসে উঠল ফু-চুঙ। অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল রানা। 'আমার একটা প্রশ্ন আছে, কর্নেল।'

'শিওর, বলুন,' ঝুঁকে এল নরওয়েজিয়ান।

'হিউ-সিমকা, এদের আসল উদ্দেশ্য যে পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া, এ খবর আপনি জানেন কি করে? কার মাধ্যমে, বা···'

'রোজানা মোরান্ডির মাধ্যমে।'

থমকে গেল ও। 'পার্ডন?'

'ঠিকই শুনেছেন আপনি, মিস্টার মাসুদ রানা। রোজানা আমাদের ইনফর্মার ছিল। আমিই ওকে দিয়ে ফোন করিয়েছিলাম আপনাকে, তার মাধ্যমে ওদের আসল উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে আপনাকে সতর্ক করার জন্যে। নিজেদের জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা এক দুর্বল মুহূর্তে মুখ ফস্‌কে রোজানাকে বলে বসেছিল সিমকা। ক্ষতিকর কিছু যে ওরা করতে যাচ্ছে, সে অনুমান আমরা আগেই করেছিলাম। কিন্তু সেটা যে কি, তা জেনেছি রোজানার কাছ থেকে।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'মেয়েটার কথা ভাবলে দুঃখ হয়।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল সবাই। ডুবে থাকল যে যার চিন্তায়। কর্নেলই আবার মুখ খুলল। 'ওদের মধ্যে হেদায়েত হচ্ছে ডি-ডে'র কর্নারস্টোন। তার টেকনিক্যাল নো-হাউর কোন তুলনা নেই। ওদের ষড়যন্ত্র প্রোগ্রাম করবে সে, উপযুক্ত সময় সুইচ টিপলেই ঘটনা, মানে, তারা যা চাইছে, ঘটতে শুরু করবে। কাল তার কিছু নমুনা তো দেখেছেন আপনি পর্দায়, তাই না?'

'কি করে জানলেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'কি করে?' হাসি ফুটল কর্নেলের মুখে। 'আমাদের এক বিশেষজ্ঞ নিয়মিত "হ্যাক" করে হেদায়েতের প্রোগ্রাম। আপনারা কাল স্টুডিওতে যা দেখেছেন, এখানে বসে তা আমরাও দেখেছি।'

একটা টেলিফোন বেজে উঠল। একযোগে সবাই ঘুরে তাকাল। ওটা একটা লাল টেলিফোন। থাবা চালাল কর্নেল নরডেন। 'ইয়েস!' নীরবে ও প্রান্তের কথা শুনল। তারপর ফোন রেখে রানার দিকে তাকাল। 'ওরা টের পেয়ে গেছে ঘটনা। অজ্ঞান গার্ড আর মরা কুকুর উদ্ধার করেছে। হুলস্থুল কাণ্ড চলছে ওখানে।'

ঘড়ি দেখল রানা। প্রায় চারটা। আবার বাজল একই টেলিফোন। 'ইয়েস! অল রাইট। ইয়েস, গুড!' রিসিভার জায়গামত রেখে জেনারেল

মাসেরাতির দিকে ফিরল নরডেন। 'জেনারেল, আপনার কম্যান্ডো বাহিনী রেডি। শহরের উত্তরপুব মাথায় মুভ করার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষায় আছে ওরা। সব ঠিক ঠাক।'

'জেন্টলমেন,' বলল সে আর সবার উদ্দেশে। 'ব্যাপারটা এখন সম্পূর্ণ ইটালিয়ান সরকারের, তাই কন্টির স্টুডিওতে রেইড চালানোর কাজটা পরিচালনা করবেন জেনারেল মাসেরাতি। এখন থেকে আমরা কেবল ঘটনার দর্শক।'

মাথা দোলালেন জেনারেল। প্যারেড গ্রাউন্ড গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্ণতার সাথে বললেন, 'রাইট! এ অপারেশনের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব আমার। আমাদের ওয়ার মিনিস্ট্রারের মৌখিক অনুমোদনই যথেষ্ট এ জন্যে।'

কর্নেল পন্টিসেলি ও কর্নেল সিলাচিকে দেখলেন। 'চূড়ান্ত পরিকল্পনা আমরা আগেই করে রেখেছি। সেই অনুযায়ী চলবে অপারেশন। আপনারা দু'জন সত্যিকার অ্যাকশনে কম্যান্ডোদের দুই দলকে নেতৃত্ব দেবেন।'

'রাইট, জেনারেল,' একযোগে বলল দুই কর্নেল।

হাত বাড়িয়ে লাল টেলিফোনটা কাছে টেনে নিলেন মাসেরাতি, কয়েকটা সংখ্যা পাঞ্চ করে অপেক্ষা করলেন কিছুক্ষণ। ও প্রান্তে সাড়া পেতে খ্যাঁক করে উঠলেন। 'আমি জেনারেল মাসেরাতি বলছি! অ্যাঁ?···জাগাও তাঁকে, আমার কথা বলো। ইট ইজ আটমোস্ট আর্জেন্ট।'

তিন মিনিট পর ফোন রেখে হেলান দিয়ে বসলেন তিনি। সন্তুষ্ট। 'হয়ে গেছে।'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই ফের বেজে উঠল ফোন। নরডেন ধরল এবার। বিনাপ্রশ্নে ও প্রান্তের বক্তব্য শুনল কয়েক মিনিট। 'একটু আগে কয়েকটা সাপ্লাই ট্রাক ঢুকেছিল কন্টির স্টুডিও কমপ্লেক্সে,' ফোন রেখে বলল সে। 'বের হয়ে আসার সময় ওখান থেকে কিছুটা দূরে থামানো হয় ওগুলো, সার্চ করা হয়। জানা গেছে ওখানকার স্টাফদের জন্যে ফুড সাপ্লাই পৌঁছে দিতে গিয়েছিল ওগুলো। সার্চ করা হয়েছে সবগুলোকে, দুধের বোতল ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি।'

'আর কিছু না?' জানতে চাইলেন মাসেরাতি। 'মৃত কুকুর, অজ্ঞান গার্ড, কাটা ফেন্স ইত্যাদির খবর পেয়ে আমাদের প্রিন্সিপালদের কেউ পরিদর্শনের যায়নি ওখানে?'

'না।'

'ভাল।'

সোয়া পাঁচটায় কন্টির স্টুডিও কমপ্লেক্সে ঝটিকা অভিযান চালাল জেনারেল মাসেরাতির বাহিনী। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো মিশন।

বসে আছে মাসুদ রানা। হতবাক্, বিস্মিত। জেনারেল মাসেরাতির ব্যর্থতার খবর শুনছে লিউ ফু-চুঙের মুখে। কালো হয়ে আছে চেহারা। 'এসব কি বলছিস্, তুই?' ভাষা ফিরে পেয়ে বলল ও। ফোন রেখে সোজা হলো চিনা

এজেন্ট।

'সত্যি, রানা। তিনটে ওয়্যারহাউসই একদম ফাঁকা। কিচ্ছু নেই।

'দূর! তা কি করে সম্ভব? এতকিছু এই সামান্য সময়ের মধ্যে কি করে সরাল ওরা, কোথায়…'

'জানি না! জেনারেল মাসেরাতির মুখে যা শুনলাম, আমি তাই বলছি।'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্থবির হয়ে গেল রানা। আগের সেই বাড়িটিতেই আছে এখনও ওরা দু'জন। একই রুমে। অন্যরা কেউ নেই। একদল গেছে অপারেশন পরিচালনা করতে, অন্যরা মনিটর করতে। হিরণকে নিজের কাজে পাঠিয়ে দিয়েছে রানা।

'তাহলে,' বলল ও। 'তাহলে নিশ্চই কোন ক্যামোফ্লেজিঙ ট্রিক্ খাটিয়েছে ওরা, লিউ। এ অসম্ভব! আমি আসার দুই আড়াই ঘণ্টার মধ্যে চালানো হয়েছে অপারেশন। ভেতরে এতকিছু দেখেছি আমি…' থেমে গেল ও খেই হারিয়ে। 'অসম্ভব! এ অসম্ভব!'

'কিছু নেই ওখানে, রানা,' একঘেয়ে গলায় বলল লিউ ফু চুঙ। স্বর সামান্য চড়া, তীক্ষ্ণ। 'কিচ্ছু নেই। সবগুলো ওয়্যারহাউস একদম ফাঁকা, ফ্লোর খালি। ধুলো ছাড়া কিছু নেই। খোলা শূটিং স্পটেরও একই অবস্থা।'

পায়ে পায়ে ডেস্কের পিছনের জানালার দিকে এগোল রানা। দুশ্চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছে কয়েকটা। ড্রেপার সরিয়ে বাইরে তাকাল। টাইবার নদীর ওপর চোখ পড়ল। সকালের রোদ মেখে চিক্ চিক্ করছে তার বুক। বিভিন্ন ধরনের নৌযান চলাচল করছে। 'তোদের মিগগুলো?' ঘুরে দাঁড়াল ও।

'নেই।' কিছু সময় চুপ করে থাকল লিউ। 'রানা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

তার দিকে তাকিয়ে থাকল ও। কিছু বলল না।

বেশ দ্বিধার সাথে জিজ্ঞেস করল সে, 'তুই ঠিক দেখেছিলি তো, দোস্ত? শিওর, কোন ভুল হয়নি?'

'তুই আমাকে এত বেকুব ভাবিস্, জানা ছিল না তো!' বেশ ভেবেচিন্তে আর কিছু জবাব খুঁজে না পেয়ে বলল রানা। রেগে গেছে।

'রাগ করিস্ নে,' মাথার চুল মুঠো করে ধরে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকল ফু-চুঙ। 'কি যে ছাইভস্ম ভাবব, বুঝতে পারছি না কিছু।'

দ্রুত টিভির দিকে এগোল রানা। অন্ করতেই তাৎক্ষণিক ছবি ফুটল পর্দায়। সকালের প্রথম-সংবাদ প্রচার হচ্ছে দেখল ও। '…এ ঘটনাকে ব্যক্তি অধিকারের মারাত্মক লঙ্ঘন বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন সিনেটর পিয়েরো সিমকা।' পাঠক বলে চলেছে, 'ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা এ দেশে আর ঘটেনি দাবি করে তিনি বলেছেন, ইটালিয়ান আর্মির এই অভিযানে এটা পরিষ্কার, মুসোলিনিউত্তর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরও তারা তাদের ডিক্টেটরশিপের খোলসেই আজও আবদ্ধ রয়ে গেছে।

'ইন্টারপোল নামের এক দুর্নীতিবাজ পুলিস ফোর্সের প্ররোচনায়, জেনারেল মাসেরাতি কন্টি ফিল্ম্ ইন্ডাস্ট্রিজে যে অভিযান চালিয়েছেন আজ,

তা এ দেশের শিল্প ও সংস্কৃতি ধ্বংসের এক সুদূর প্রসারী নীল নক্‌শার প্রথম পদক্ষেপ বলে অ্যাখ্যায়িত করেছেন তিনি।'

টিভি অফ করে ফু-চুঙের দিকে ফিরল ও। 'জেনারেল মাসেরাতি কোথায় এখন?'

'ওয়ার মিনিস্ট্রিতে গেছে সবাই। কি চলছে ওখানে কে জানে!'

নয়

'আমি আবার যাব,' বলল রানা।

অবাক হলো ফু-চুঙ। 'কোথায়?'

'কন্টির স্টুডিওতে।'

'এই দিনের বেলায়? পাগল হয়েছিস্ তুই? ভুলে গেলি রোজানার খুনের দায় তোর ঘাড়ে চেপেছে? পুলিস খুঁজছে তোকে?'

অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করল রানা। সত্যি তো, উত্তেজনার ঠ্যালায় কথাটা ভুলেই বসে ছিল ও এতক্ষণ। রাতে হয়তো পুলিসের চোখকে ফাঁকি দেয়া যেত কার্পেন্টারের পরিচয়পত্র দেখিয়ে, দিনের আলোয় তা নিশ্চই হবে না।

'কি ভাবছিস, রানা?' বন্ধুর অস্থিরতা দেখে প্রশ্ন করল লিউ।

'যে করেই হোক, স্টুডিওর কাছে যাওয়া প্রয়োজন আমার,' জরুরী কণ্ঠে বলল ও। 'অন্তত তিন মাইলের মধ্যে।'

'কেন?'

'একটা রাশান মিগ ফ্লিপার ফাইটারের ককপিটে হোমার প্ল্যান্ট করে রেখে এসেছি আমি সার্চের সময়, ওটার ব্লিপ্ ট্রেস্ করতে।'

'দাঁড়া, দাঁড়া!' ওর মুখোমুখি দাঁড়াল এসে সিএসএস এজেন্ট। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'কিসের সাথে কি প্ল্যান্ট করেছিস?'

আবার বলল রানা। পকেট থেকে ছোট্ট ট্র্যানজিস্টরটা বের করে দেখাল তাকে। 'এটা একটা লোকেটিঙ ডিভাইস। কিন্তু অল্প শক্তির, মাত্র তিন মাইল এর ক্ষমতা। এখান থেকে চেষ্টা করলেও হোমারের ব্লিপ্ ধরা যাবে না। জায়গাটা অনেক দূরে, তাই যাওয়া প্রয়োজন আমার।'

'এতক্ষণ বলিস্‌নি কেন?'

'দ্যাখ্, লিউ, তোর-আমার এবং ন্যাটো ও ইন্টারপোলের মিশন এক, কিন্তু পথ ভিন্ন ভিন্ন। তোর সাথে যদি রাতে দেখা না হত, তক্ষুণি শহরে ফিরে বস্‌কে রিপোর্ট করতাম আমি। এরা যত সময় নিয়েছে অপারেশন শুরু করতে, সে ক্ষেত্রে তত দেরি হয়তো হত না। গার্ড আর কুকুরের বিষয়টা ওরা টের পেয়ে যাওয়ার আগেই যদি রেইড চালানো যেত, আমি বাজি ধরে বলতে পারি এতক্ষণে হিউ-সিমকা ও দলবল চোদ্দ শিকের ভেতরে থাকত। এই

ঝামেলার জন্যে তুই-আমি দু'জনেই সমান দায়ী। তুই চেয়েছিস্ আমার দেখার ওপর ভরসা করে মূল দায়িত্ব ন্যাটো আর ইন্টারপোলের ঘাড়ে চাপাতে, আর আমি চেয়েছি তোদের সবার ঘাড়ে বন্দুক রেখে গুলি চালাতে।

'ভেবে দ্যাখ্, এখানে যে সময় আমরা খাওয়া আর গল্পে অপচয় করেছি, ততক্ষণে অন্তত দু'বার রেইড চালানো যেত কন্টির এস্টাবলিশমেন্টে। আমি কি ভাবছি জানিস্? ওরা অনাহূত কারও প্রবেশ টের পেয়ে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল, তাই সরিয়ে ফেলেছে সমস্ত কিছু। এইজন্যেই কম্যান্ডো···'

'তোর প্রথম দুটো পয়েন্ট মানি আমি, রানা। ঠিকই বলেছিস্ তুই। কিন্তু শেষেরটা যে কত অসম্ভব, অবিশ্বাস্য, তা তুই নিজেই একবার চিন্তা করে দ্যাখ্। এত কিছু ওরা মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে কি করে সরাল, তাও ওখানে উপস্থিত আমাদের লোকজনের চোখের সামনে দিয়ে?'

'ওরা সব সরিয়ে ফেলেছে বলেছি আমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'তার অর্থ এই নয় যে উপস্থিত সবার চোখের সামনে দিয়েই সরাতে হবে।'

হতভম্ব চেহারা হলো লিউ ফু চুঙের। 'তার মানে! কি বলছিস্ তুই, আমি তো কিছুই···'

'তোর মধ্যে আগের সেই লিউকে কেন দেখতে পাচ্ছি না আমি?' সপাং করে চাবুক হানল যেন রানার কণ্ঠ। 'কোথায় গেল তোর সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি? মাথা খাটা, গাধা কোথাকার!'

চাবুক খেয়েই হয়তো আচমকা জ্ঞানের চোখ খুলে গেল তার। কয়েকবার খাবি খেল ডাঙায় তোলা মাছের মত। 'তুই···তুই বলতে চাইছিস···রানা! ওহ্ গড!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এই তো গাধা মানুষ হয়েছে।'

কয়েক মুহূর্ত বাক্‌রুদ্ধ হয়ে থাকল লিউ। তারপর রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, 'তাই তো বলি, মাসুদ রানার এতবড় ভুল হয় কি করে?'

'এই জন্যেই ওই জায়গার কাছাকাছি যেতে চাইছি আমি, বুঝলি, হাঁদারাম?' ট্রানজিস্টরটা দেখাল রানা। 'এটা দিয়ে প্রমাণ করে দেব আমি কি ভাবে জেনারেল মাসেরাতিকে বোকা বানিয়েছে সিমকা।'

'দাঁড়া!' বাঁদরের মত লাফ দিল লিউ। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল লাল টেলিফোনটার ওপর, ওয়ার মিনিস্ট্রির সুইচ-বোর্ড নাম্বারে ফোন করল দ্রুত। নক্ হলো দরজায়। 'কাম ইন!' হাঁক ছেড়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে ফোনে কথা বলতে। হড়বড় করে কি সব বলে যেতে থাকল। সেদিকে মন দিতে ব্যর্থ হলো রানা দরজা খোলার শব্দে।

বিশালদেহী দুই চিনা দানব ঢুকল ভেতরে। মুখ শুকনো, চোখ লাল। এরাই সম্ভবত লিউ ফু চুঙের সেই দুই সঙ্গী, যাদের ও ওয়্যারহাউসের পাহারায় রেখে এসেছিল রাতে। রানাকে এক পলক দেখল তারা, তারপর নজর দিল লিউর দিকে। তার কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

দড়াম করে ফোন রাখল লিউ। চেহারায় চাপা উল্লাস। 'রানা, চল্!'

'কোথায়?'

ততক্ষণে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে সে। 'বেরোও! পথে বলব।' দুই সঙ্গীর উদ্দেশে কি যেন বলল দুর্বোধ্য ভাষায়, তারপর প্রায় দৌড়ে এগোল এলিভেটরের দিকে। রানাও পিছন পিছন ছুটল। এক মিনিট পর লিউর ফিয়াট লাক্সারি হুঙ্কার ছেড়ে স্টার্ট নিল সাব-বেজমেন্ট কার পার্কে, গেট দিয়ে বেরিয়ে সাঁই-সাঁই করে ছুট্ লাগাল যানবাহনে ঠাসা রাস্তা দিয়ে। পিছনে আরেক গাড়িতে আসছে ওর দুই সঙ্গী।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল রানা।

ব্যস্ত হাতে গিয়ার শিফট্ করল চাইনিজ। 'ওয়ার মিনিস্ট্রি। ওদের বলেছি আমি তোর সন্দেহের কথা। শুনে মিনিস্টার তোর সাথে কথা বলতে চেয়েছেন।'

পনেরো মিনিট পর। সমর মন্ত্রির মুখোমুখি বসা রানা ও লিউ। এক পাশে মাথা নত করে বসে আছেন জেনারেল মাসেরাতি। এরমধ্যে বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে তাঁর। কর্নেল পিয়েট নরডেন অনুপস্থিত। চাপের মুখে তাকে প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছে ন্যাটো। এক পর্তুগীজ ন্যাভাল অ্যাটাশে, সেনহর সোসাকে তার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এক পুলিস অফিসার, মেজর মিলিয়ারডোন একটু আগে যোগ দিয়েছে বৈঠকে। ফিউমিসিনোর আগের পুলিস স্টেশন সেন্টোসেল্লোর ইন-চার্জ সে। মানুষটা ছোটখাট। তবে বাঘা পুলিস, চেহারা-চাউনি দেখেই বুঝল মাসুদ রানা। আর আছে ইন্টারপোলের রুশ প্রতিনিধি কর্নেল ইউরি পেরেসটভ। অন্যদের কোথাও দেখতে পেল না ওরা।

বেশি কিছু বলার ছিল না। যা ছিল অল্প কথায় মন্ত্রিকে গুছিয়ে বলল রানা। দুই হাত এক করে তার ওপর থুতনি রেখে একভাবে ওকে দেখতে থাকলেন তিনি। আসলে দেখলেন না কিছুই, মন পড়ে রয়েছে তাঁর অন্য কোথাও। ভদ্রলোকের বয়স বেশি নয়, চল্লিশ-বেয়াল্লিশের মত। গড়ন একহারা। মাথার চুল বেশিরভাগই সাদা। চেহারায় উদ্বেগ।

অনেকক্ষণ চিন্তা-ভাবনার পর মুখ খুললেন তিনি। 'আন্ডারগ্রাউন্ড হাইড আউট! এ-ও কি সম্ভব?'

'যারা এত অসাধ্য সাধন করতে পারে, তাদের পক্ষে ওটাও খুবই সম্ভব,' বলল ও। 'নইলে সামান্য সময়ের মধ্যে এতকিছু সরিয়ে ফেলা আর কোন্ উপায়ে সম্ভব?'

'নিচে নামাতেও তো প্রচুর সময়ের প্রয়োজন।'

'আমার বিশ্বাস ওগুলোর কোনটাই ওদের কষ্ট করে নামাতে হয়নি, সেনিয়র। শুধু সুইচ টিপে গোটা ফ্লোর আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়ে গেছে। ফাঁকা স্থান পূরণ করেছে বিকল্প ফ্লোর তুলে দিয়ে।'

মুখ তুলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন জেনারেল। দৃষ্টিতে আশা ও সন্দেহের ছায়া।

'শক্তিশালী লোকেটিং ডিভাইস হলে এখানে বসেও আমার হোমারের

ব্লিপ রিসিভ করা যাবে,' বলল ও। 'তবে ইউজুয়াল কম্বিনেশন থাকতে হবে ওটায়। নইলে কাজ হবে না।'

'আমাদের কমিউনিকেশনস্ সেলেই আছে ওর অনেকগুলো,' কিছুটা ব্যস্ততা ফুটল মন্ত্রির বলার সুরে। 'ওখানে টেস্ট করে দেখা যেতে পারে।'

ইন্টারকমে কাউকে কিছু নির্দেশ দিলেন মন্ত্রি, তারপর ব্যক্তিগত সচিবের হাতে তুলে দিলেন ওদের সবাইকে। লোকটাকে অনুসরণ করে মিনিস্ট্রির কমিউনিকেশনস্ সেলে এসে পৌছল দলটা। কমিউনিকেশনস্ অফিসারকে মন্ত্রী নিজেই যা বলার বলে দিয়েছেন, তাই সেলে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে এল সে, পথ দেখিয়ে নানান ধরনের অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্টের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক যন্ত্রের সামনে নিয়ে এল ওদের। কাছ থেকে ওটা দেখল রানা। কাঠামো অনেকটা ওয়াশিং মেশিনের মত। বেশ কয়েকটা ডায়াল ও সুইচ রয়েছে ঢালু ওপরের অংশে।

'আপনার টার্গেট কত দূরে, সেনিয়র?' জানতে চাইল লোকটা।

'ফিউমিসিনোয়,' বলল রানা।

'আহ্, মাত্র চব্বিশ কিলোমিটার। এই যে ভল্যুমটা দেখছেন, দূরত্ব সেট করে এটা আস্তে আস্তে ঘোরান, এরিয়ার মধ্যে থাকলে এই ডায়ালের কাঁটা সঙ্কেত দেবে।'

কোনটা কি করতে হবে দেখে নিয়ে লোকটাকে বিদেয় করে দিল ও ধন্যবাদ জানিয়ে। রানার ডানদিকে কর্নেল পেরেসটভ ও মেজর মিলিয়ারডোন টেবিলে রোমের বড়সড় এক ম্যাপ বিছিয়ে তৈরি। অন্য-দিকে নির্দিষ্ট ডায়ালের ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে লিউ ফু-চুঙ। মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করল রানা, নির্দিষ্ট সুইচ টিপে প্রথমে অক্ষাংশ স্কেলে দূরত্ব সেট করল, তারপর একটু একটু করে ঘোরাতে থাকল ডায়াল।

হাফ প্লেটের মত বড়সড় ডায়ালের মধ্যেকার সরু লাল কাঁটাটা ছোটখাট এক লাফ মেরেই স্থির হয়ে গেল দেখে ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে। পরক্ষণে খেয়াল হলো উত্তেজনার চোটে বেশি ঘোরানো হয়ে গেছে ডায়াল, কাঁটা খেই হারিয়ে ফেলেছে। আবার শুরু থেকে ঘোরাতে আরম্ভ করল ও। তির তির করে কাঁপতে কাঁপতে স্থান বদল করছে কাঁটা। খানিকটা উঠে আপনাআপনি থেমে গেল, লক্ষ্য নির্দেশ করছে। মিলিয়ারডোনের সুবিধের জন্যে কিছুক্ষণ থামল রানা। জায়গাটা ম্যাপে চিহ্নিত করল সে ফোঁটা দিয়ে।

চাপা উত্তেজনা সবার মধ্যে। বুকের পাঁজরে দমাদম আঘাত করছে হৃৎপিণ্ড। রানার ঘাড়ের ওপর ভোঁশ-ভোঁশ করে দম ছাড়ছে পেরেসটভ। ফোঁটার ওপর কালো একটা রেখা টেনে মাথা ঝাঁকাল ইটালিয়ান। 'গট দ্যাট।'

পরেরবার দ্রাঘিমাংশে স্কেল সেট করল রানা, আরেকটা রেখা টানল মেজর। সবার নজর দুটো রেখা যেখানে পরস্পরকে ছেদ করেছে, সেখানে সেঁটে আছে আঠার মত। ঠিক লরেনযো কন্টির ওয়্যারহাউসের ওপর ক্রস করেছে দুটো রেখা।

'কি অদ্ভুত কথা!' বলে উঠল মেজর।

'এটা কোন ট্রিকও হতে পারে,' আড়চোখে রানাকে একবার দেখে মন্তব্য করল ন্যাটোর সেনহর সোসা।

'এই ক্ষেত্রে অন্তত পারে না,' দৃঢ় স্বরে বলল কর্নেল পেরেসটভ। 'কারণ এই মেশিন ম্যানিপুলেট করা হয়নি।'

ঠাণ্ডা চোখে সোসাকে দেখল রানা। তাড়াতাড়ি আরেকদিকে মন দিল লোকটা। চেহারা নির্বিকার।

'ওয়েল!' ব্যস্ততা ফুটল কর্নেলের ভাবভঙ্গিতে। 'আমরা তাহলে দেরি করছি কেন? মিনিস্টারকে সব জানাতে হবে না? চলুন, চলুন!'

ফিরে এল ওরা মন্ত্রীর বিলাসবহুল অফিস রুমে। মাসুদ রানার চোখেমুখে সন্তুষ্টির ছাপ। ওর অনুমান যে সঠিক তা প্রমাণ করতে পেরেছে ও। আরেকদফা বসল বৈঠক। ঘটনা শুনে জেনারেল মাসেরাতির মুখে রঙের আভাস ফিরে এল। কিন্তু মন্ত্রীর দুশ্চিন্তা মনে হলো যেন আরও বেড়ে গেল। 'যারা ওখানে ওয়াচে ছিল, তারা কি বলে?' জানতে চাইলেন তিনি। 'তাদের রিপোর্টে অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কিছু আছে?'

'আমার দুই লোক ছিল,' বলল লিউ ফু চুঙ। 'ওরা যা বলল, তাতে একটা সন্দেহজনক পয়েন্ট আছে বলে মনে হয়েছে আমার।'

'কি সেটা?'

'ওরা জানিয়েছে ঘটনা জানাজানির পর ওখানকার গার্ডদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা দেখা দেয়। বেশ কিছুটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি বুঝে তাদের একজন পোস্টের ফোন থেকে কাকে যেন রিঙ করে ঘটনা জানায়। এর একটু পর মৃদু গুঞ্জন শুনতে পায় আমার ওয়াচাররা, ওয়্যারহাউসের দিক থেকে আসছিল। হিটিং সিস্টেম অন করলে যেরকম গুন্ গুন্ আওয়াজ হয়, অনেকটা সেইরকম।'

'এলিভেটর!' উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা। 'ওয়্যারহাউসের ফ্লোর শুধু ফ্লোর নয়, ওগুলো এলিভেটর! যা ভেবেছি।'

কিন্তু মন্ত্রিকে মোটেই প্রভাবিত হতে দেখা গেল না। 'কোথায় আপনার সেই দুই ওয়াচার?' বললেন তিনি।

'এখানেই আছে। বাইরে অপেক্ষা করছে,' বলল চুঙ।

ইন্টারকমে সচিবকে অল্প কথায় অপেক্ষমাণ দু'জনকে ভেতরে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে রানার দিকে তাকালেন। মুখে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি। 'যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড আজ ভোরে ঘটে গেছে, তাতে এমনিতেই আমার সরকারের টালমাটাল অবস্থা। সিনেটের নেক্সট অধিবেশনে কতদূর কি হবে জানি না, সেনিয়র। তাই নতুন করে কিছু করার আগে খুব ভাল করে পরিস্থিতি বুঝে নিতে চাই আমি।'

মাথা দোলাল ও জবাবে।

ভেতরে ঢুকল দুই চাইনিজ। দাঁড়াল অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে। 'আমি চলে আসার পর ওখানে কি কি ঘটেছে রিপোর্ট করো,' ইংরেজিতে বলল ফু চুঙ।

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল একজন ঘটনা। 'আপনি নিজে শুনেছেন সে গুঞ্জন?' প্রশ্ন করল মেজর মিলিয়ারডোন।

'ইয়েস, সেনিয়র।'

'আপনিও শুনেছেন?' মাথা ঝাঁকাল সে দ্বিতীয়জনের উদ্দেশে।

'ইয়েস, সেনিয়র।'

'ভাল করে ভেবে বলো,' বলল ফু চুঙ।

'একদম পরিষ্কার শুনেছি,' জোরের সাথে মাথা ঝাঁকাল প্রথমজন।

'নির্জন রাত ছিল, বেশ স্পষ্ট শোনা গেছে আওয়াজটা,' দ্বিতীয়জন বলল দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে।

'ধন্যবাদ,' বললেন মন্ত্রী। 'বাইরে অপেক্ষা করুন, প্লীজ।' আসন ছাড়লেন। ডেস্কের পিছনে পায়চারি শুরু করলেন, বিড় বিড় করছেন আপনমনে। 'রাইজিং স্টেজ, লোয়ারিং স্টেজ! সব কাজে নাটুকে ট্রিক!'

'হেদায়েতুল ইসলামের আরেক টেকনিক্যাল অ্যাচিভমেন্ট,' বলল রানা। 'মনে হয় রিমোটলি কন্ট্রোলড্।'

'ওখানে যাওয়া যায় কি করে ভাবছি,' বললেন তিনি। 'ব্যর্থ রেইডের পর নতুন যে আর্মি গ্রুপ ওখানকার দায়িত্ব নিয়েছে, তারা সরাসরি প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন। আমার কোন অর্ডার মানবে না, নতুন রেইড পার্টিকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। যা ঘটে গেল তারপর এখনই প্রেসিডেন্টকে কি করে বলি…'

চিন্তার ছাপ সব ক'টা মুখে। মেজর মিলিয়ারডোন ম্যাপটা মেলে রেখেছে হাঁটুর ওপর, কপাল চুলকাচ্ছে ঘন ঘন। কোনও গভীর ভাবনায় পড়েছে। হঠাৎ মুখ তুলল সে। 'ব্যাপারটা যখন আন্ডারগ্রাউন্ডের, আমরাও কেন আন্ডারগ্রাউন্ড থেকেই যা করার করি না?'

'মানে?' দাঁড়িয়ে পড়লেন মন্ত্রী।

'অনেক বছর ধরে চোর-ডাকাত ধাওয়া করার চাকরিতে আছি, সেনিয়র,' বলল মিলিয়ারডোন। 'মাটির ওপরে নিচে সবখানে তাড়া করে ফিরতে হয় ওদের। রোমের আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজ আমি খুব ভাল চিনি। আপনি অনুমতি দিলে…' ম্যাপটা টেবিলের ওপর রাখল সে। 'এখানে দেখুন।'

মন্ত্রী এগিয়ে এলেন। অন্যরা ঝুঁকে দেখতে থাকল মেজরের পেন্সিলের কাজ, আঁকিবুকি করছে লোকটা। জবর এক ধাঁধা মনে হচ্ছে রেখাগুলোকে। 'উনিশ শতকে তৈরি আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজ,' বলল সে। 'চাকরিতে জয়েন করে মাটির ওপর যতক্ষণ কাটিয়েছি, তারচে' ঢের বেশি সময় কাটিয়েছি নিচে। ধাওয়া খেলে চোর-ছ্যাঁচোররা সব এই গর্তে ঢোকে, তাই আমাকেও ঢুকতে হয়।

'কথাটা এতক্ষণ মাথায় খেলেনি আমার। এখন মনে হচ্ছে, সেনিয়র,' মাথা ঝাঁকিয়ে রানাকে দেখাল সে। 'ঠিকই ধরেছেন ফাঁকটা। ওয়্যারহাউসের নিচের প্যাসেজকে হয়তো কাজে লাগিয়েছে ওরা সবাইকে বোকা বানাবার জন্যে। আপনি অনুমতি দিলে গোপনে ব্যাপারটা চেক্ করে আসতে পারি আমরা,' কথা শেষ করল মন্ত্রীর দিকে ফিরে।

'মন্দ নয় আইডিয়া,' বলল কর্নেল ইউরি পেরেসটভ। 'কিন্তু ঝুঁকি আছে। ওদের হাতে সত্যি যদি নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড থাকে, যদি দুর্ঘটনাবশত তার একটা ফেটে যায়, তাহলে?'

'পরিস্থিতি চেক করতে কেউ গেলে যদি একটা ফাটেই,' ভেবেচিন্তে বলল রানা। 'তাতে কতই বা ক্ষতি হবে? কিন্তু কাল যখন সবগুলো ফাটাবে সিমকা, তখন কি হবে ভেবেছেন?'

'তা বটে,' মাথা ঝাঁকাল সে।

'একদম খাঁটি কথা বলেছেন, সেনিয়র,' মাথা ঝাঁকাল মিলিয়ারডোন। 'আজ যদি দুর্ঘটনাবশত একটা বার্স্ট করেই, ভেতরে যে দু'চারজন থাকবে তারা হয়তো মরবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সরকার ফ্রেশ অ্যাটাক চালিয়ে। নইলে কত লক্ষ যে মরবে, কত জনপদ ধ্বংস হবে, তা কে বলতে পারে?'

আপনমনে মাথা দোলালেন সমর মন্ত্রী।

চোখ তুলল রানা। 'আপনি রাজি হলে আরেকটা কাজও করা যায়, যাতে সাপ মরবে, লাঠিও আস্ত থাকবে।'

সবাই ঘুরে তাকাল ওর দিকে। 'কি রকম?' প্রশ্ন করলেন মন্ত্রী।

'কেউ একজন যদি আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজ ধরে আমাকে ওয়্যারহাউসের কাছে পৌঁছে দেয়, ওখানে হার্মলেস অথচ আওয়াজ করে বেশি, এমন একটা বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে পারি আমি।'

'তাতে লাভ?'

'ফায়ার ডিপার্টমেন্টের লাইসেন্স হাত করে রাখবেন আপনি আগে থেকে। বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধান করতে দেশের যে কোন জায়গায়, যে কোন মুহূর্তে হানা দেয়ার ক্ষমতা আপনার আছে, তাতে এমনকি প্রেসিডেন্টের অনুমতির প্রয়োজনও হয় না। বোমার আওয়াজ কানে যাওয়ামাত্র ওখানে ফের হানা দেয়ার উপযুক্ত একটা ছুতো পেয়ে যাবেন আপনি, কিচ্ছু করার থাকবে না সিমকার সেক্ষেত্রে।'

'গুড!' বলে উঠল পুলিস অফিসার। 'ভেরি গুড, এই না হলে বুদ্ধি! আমি সেনিয়রকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি, স্যার। আর আমি এ কাজে ওঁর সঙ্গী হতে চাই।'

'আমিও যাব,' বলল কর্নেল পেরেসটভ। 'অন মাই কান্ট্রি'জ ইন্টারেস্ট।'

নড়েচড়ে বসে খুক করে কাশি দিল লিউ ফু চুঙ। 'আমিও।'

বেশ কিছুক্ষণ বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামালেন মন্ত্রী। 'আনঅফিশিয়াল ভিজিট, নিশ্চই?' প্রশ্নটা রানাকে করলেন।

'অফ কোর্স!'

'অফিশিয়াল হলেই বা ক্ষতি কি?' বলল মিলিয়ারডোন। 'এঁরা তিনজন বিদেশী ট্যুরিস্ট, পথে নেমে ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন। আমি এঁদের অভিযোগ পেয়ে গিয়েছি ছিনতাইকারীদের ধরতে, কার কি বলার আছে?'

'তা বটে।' মৃদু হাসি ফুটল মন্ত্রীর ঠোঁটে। চেয়ারে বসে চোখ বুজে ঢুলে

ঢুলে কিছু ভাবলেন। 'অল রাইট, জেন্টলমেন। পুলিসকে দায়িত্ব পালনে বাধা দিতে পারি না আমি। তবে,' রানার চোখে চোখ রাখলেন। 'কিছু ঘটাবার আগে দয়া করে নিশ্চিত হয়ে নেবেন সত্যিই গলদ আছে কি না ওখানে।'

'অবশ্যই।'

পুলিস অফিসারের দিকে ফিরলেন তিনি। 'কোন জায়গা থেকে নিচে নামবেন ঠিক করেছেন?'

'সেইন্ট ক্যালিক্সটাস থেকে, স্যার। ওখানকার জাঙ্কইয়ার্ডের কাছে একটা আনচার্টেড ক্যাটাকম আছে আমার জুরিসডিকশনের অধীনে। ওই পথ দিয়ে।'

'গুড। বেরিয়ে পড়ুন তাহলে।'

শোফারচালিত ছাপহীন পুলিস কারে চড়ে বিশ মিনিট পর সেইন্ট ক্যালিক্সটাস পৌঁছল চারজনের দলটা। এয়ারপোর্টের একটু আগে জায়গাটা, ট্যুরিস্টদের জন্যে বেশ কিছু বিনোদন কেন্দ্র আছে এখানে। ওটা ছাড়িয়ে সামান্য উত্তরে গেলে বড়সড় এক জাঙ্কইয়ার্ড। ইয়ার্ডের ভাঙাচোরা গাড়ির স্তূপের মধ্যে দিয়ে দ্রুত পায়ে এগোল দলটা, নেতৃত্ব দিচ্ছে মেজর মিলিয়ারডোন। দুপুর গড়িয়ে যেতে বসেছে।

উন্মুক্ত ক্যাটাকম দিয়ে নিচের চওড়া প্যাসেজে ঢুকে পড়ল দলটা। টর্চের আলোয় পথ দেখে দ্রুত পায়ে এগোল লক্ষ্যের দিকে। দু'পাশের দেয়ালজুড়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রচুর চোরাই ফিয়াট, আলফা রোমিও। বেশিরভাগেরই কেবল খোলটা আছে, আর সব হাওয়া। আস্ত গাড়িও কয়েকটা দেখা গেল ওর মধ্যে।

'এই যে,' ওগুলো দেখিয়ে বলল মিলিয়ারডোন। 'এই চোর ব্যাটাদের ধাওয়া করে দিন আর রাত কাটে আমার।'

কোন পাল্টা মন্তব্য এল না। সবার আগে হেঁটে চলেছে মেজর, তার পিছনে রানা। রুশ কর্নেল আর ফু-চুঙ প্রায় পাশাপাশি হাঁটছে। কর্নেলের বাঁ হাতে একটা চেক অটো হ্যান্ডগান, ফু-চুঙের হাতে হাঁটার ছন্দে দুলছে পিলে চমকানো সাইজের এক চাইনিজ রিপিটার পিস্তল।

'আধ ঘণ্টার মধ্যে জায়গামত পৌঁছে যাব আমরা,' বলল মেজর। 'তবে কন্টির সীমানা আরও আগেই শুরু হবে।'

এবারও কেউ কিছু বলল না। সবাই উত্তেজিত। ভেতরের গরমে ঘামছে অল্প অল্প। জায়গামত পৌঁছল ওরা। থেমে দাঁড়াল মেজর। ঘুরে নিঃশব্দে আঙুল তুলে প্যাসেজের নিচু সিলিঙ দেখাল। 'পৌঁছে গেছি,' ফিস্ ফিস্ করে বলল লোকটা। 'কোন শব্দ হয় না যেন···'

সাবধানের ইটালিয়ান প্রতিশব্দ *প্রুডেনযা*, সেটাই উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু সুযোগ হলো না। আচমকা ওদের সামনে ও পিছনে লোহার ভারী কিছু আছড়ে পড়ল, বদ্ধ জায়গায় কংক্রিটের মেঝের সাথে লোহার সংঘর্ষে বিকট আওয়াজ উঠল। পরক্ষণে এক সাথে জ্বলে উঠল কয়েকটা জোরাল ফ্লাডলাইট, আলোর বন্যায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল

প্রত্যেকে।

'ওয়েলকাম, সেনিয়র গ্যারি কার ওরফে মাসুদ রানা, ওয়েলকাম!' গম গম করে উঠল পিয়েরো সিমকার কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠ। 'আপনাদেরকেও স্বাগতম আমাদের সাম্রাজ্যে। পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?'

'ইঁদুরের ফাঁদে কেমন লাগছে, মিস্টার রানা?' স্যার হিউ মারসল্যান্ড করল প্রশ্নটা। পরমুহূর্তে বিকট অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে।

দশ

চোখ সয়ে আসতে সামনে-পিছনে শব্দের উৎস খুঁজল মাসুদ রানা। দেখা গেল পুরু গরাদের দুটো গ্রিলের মধ্যে আটকা পড়েছে ওরা, কোনদিকে যাওয়ার উপায় নেই। বেড়ার ওপাশে কিছুদূর দেখা যায়, তারপর গাঢ় অন্ধকার। প্যাসেজের দেয়ালের রঙ বাদামী। এখানে-ওখানে সরু ফাটল আছে গায়ে।

'তারপর?' সিমকা বলল। 'প্রায় দু'দিন হতে চলল দেখা সাক্ষাৎ নেই আপনার সাথে, সেনিয়র রানা। কুশলাদি বিনিময় হয় না। কেমন কাটল এই দুটো দিন?'

মেজর মিলিয়ারডন খেপে উঠল, রানা বাধা দেয়ার আগেই কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে দুটো গুলি ছুঁড়ল সে। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল সবার।

'বোকামি করবেন না!' চাপা ধমক লাগাল রানা। 'শান্ত থাকার চেষ্টা করুন, নইলে মরবেন।'

'মিস্টার রানা ঠিকই বলেছেন, অফিসার,' বলল স্যার হিউ। 'তাছাড়া আমরা যেখানে রয়েছি ভেবে গুলি ছুঁড়েছেন আপনি, তার ধারেকাছেও নেই আমরা। যেখানে আছি, সেখানে আপনারা কেউ কোনদিনই পৌঁছতে পারবেন না। দূরে বসে টিভিতে আপনাদের দেখছি আমরা, কথা বলছি মাইক্রোফোনের মাধ্যমে। আমাদের এক বাংলাদেশী জিনিয়াস বন্ধুর কীর্তি এসব। মাসুদ রানা ভাল চেনেন তাকে।'

সিমকার হাসি শোনা গেল। 'আপনার বুদ্ধি আর সাহসের প্রশংসা করি আমি, সেনিয়র রানা। আপনার জায়গায় আর কেউ হলে খুনের দায়ে পুলিসের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে অনেক আগেই পালিয়ে যেত। অথচ আপনি করলেন উল্টোটা, আমাদের ফাঁদে ফেলার জন্যে রাতে হানা দিলেন ওয়্যারহাউসে। প্রমাণ সংগ্রহ করে একদল মাথামোটা আমলার সামনে বয়ান দিলেন আবিষ্কারের। আমার আফসোস যে তারপরও কিছু করতে তো পারলেনই না, উল্টে ন্যাটো আর ইন্টারপোল এখন হাত-পা ধরছে আমার, কেঁদেকেটে বুক ভাসাচ্ছে। ওখানে ব্যর্থ হয়ে এবার ধরেছেন ঠোলা। যাদের কাজ ঘুষ খাওয়া আর চোর-ডাকাতের পিছনে ছুটে বেড়ানো। এই কাজটা ঠিক

করেননি আপনি, সেনিয়র। আমাদেরকে এত খাটো করে দেখা উচিত হয়নি আপনার।

'সে যাক্, এবার বলুন, এত কষ্ট করে সঠিক জায়গায় পৌঁছেও এই যে আবার ব্যর্থ হলেন, ব্যাপারটা কেমন লাগছে আপনার?'

জবাব দিল না রানা।

'আচ্ছা থাক্, এখন বলতে হবে না। সামনাসামনি বসেই কথা বলব আমরা। দাঁড়ান, ব্যবস্থা করছি।'

মৃদু হিস্ হিস্ শব্দ কানে এল ওদের। শব্দটা কিসের দেখার জন্যে এদিক-ওদিকে তাকাল রানা, কিন্তু কিছু দেখল না। হঠাৎ করে একটা ঘুম-ঘুম আবেশ পেয়ে বসল ওদেরকে। গ্যাস! ব্যাপার টের পেয়ে অন্যদের সতর্ক করার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল ও, সময় পেল না। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

জ্ঞান ফিরতে নিজেকে বড় এক রুমে আবিষ্কার করল রানা। বিলাসবহুল রুম। সামনের পুরো এক দেয়ালজোড়া ক্যামিলার বিশাল সিল্ক্ স্ক্রীন-প্রিন্ট ছবি। মাথার ভেতরের জমাট বাঁধা ভাবটা দূর করার জন্যে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল ও। ঘোর কেটে গেল, একটু একটু করে স্বচ্ছ হয়ে উঠল দৃষ্টি।

নিজের দিকে মন দিল। পুরু গদিমোড়া এক চেয়ারে বসে রয়েছে ও, হাতলের সাথে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে হাত বাঁধা আছে শক্ত করে। ডানে-বাঁয়ে তাকাল। ওর ডানে লিউ ফু-চুঙ ও মিলিয়ারডোন। কর্নেল পেরেসটভ বাঁদিকে। সবে জ্ঞান ফিরেছে সবার। হাবার মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। মিলিয়ারডোনের ডান ভুরুতে রক্ত দেখা যাচ্ছে, বোধহয় আছড়ে পড়ার সময় কেটে গেছে।

সামনে তাকাল। বড় দুই সোফায় গা ডুবিয়ে বসে রয়েছে স্যার হিউ, স্টাডস ম্যালোরি, লরেনযো কন্টি, হেদায়েতুল ইসলাম। পিয়েরো সিমকা এক চেয়ারে বসা। ওটা স্বাভাবিকের চাইতে খাটো। ওদের চেয়ার সারির দু'পাশে দুই দৈত্যাকার ওয়ার্ডেনকে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ছয় ফুট চারের একটুও কম হবে না লোক দুটো। মিনি উজি শোভা পাচ্ছে তাদের হাতে।

'ঘুম ভেঙেছে তাহলে চার পরাজিত সেনাপতির?' হাসি দেখা দিল সিনেটরের মুখে। রানাকে দেখল লোকটা। 'কোথায় আছেন অনুমান করতে পারেন?'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'তোমার কবরের শিয়রে।'

খ্যাক্-খ্যাক্ করে হাসল সে। স্যার হিউর দিকে তাকাল। 'এখনও ঘোর কাটেনি সেনিয়রের, স্বপ্ন দেখছে।'

'দেখতে দাও। সময় হলেই নিজেই বুঝবে কবরটা কার।'

'বুঝতে আমি ঠিকই পারছি, স্যার হিউ। পারছ না তোমরা। ভেবেছিলে ডুবে ডুবে পানি খাবে, কেউ জানবে না। দেখো গিয়ে দুনিয়ার কারও জানতে বাকি নেই তোমাদের আসল উদ্দেশ্য।' মাথা দোলাল রানা। 'তোমাদের জন্যে ইলেক্ট্রিক চেয়ার প্রস্তুত। একবার বোকা বানিয়েছ বলে ভেবেছ···'

'কে বসাবে আমাদের ইলেক্ট্রিক চেয়ারে, সেনিয়র?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল লরেনযো কন্টি। 'ইটালি, আমেরিকা, না ইংল্যান্ড? আজ সে ক্ষমতা কারও নেই। এমন কোন শক্তি নেই পৃথিবীতে। আগে হলে হয়তো সম্ভব ছিল, কিন্তু আজ আর সম্ভব নয়। কাউকে পরোয়া করি না আমরা।'

'ঠিক বলেছে আমার বন্ধু,' তার পিঠ চাপড়ে দিল স্যার হিউ। 'কারণ দু'দিন পর পৃথিবীর মালিক হব আমরাই। আমরা এই পাঁচজন। সমস্ত ক্ষমতা, শক্তি থাকবে আমাদের মুঠোয়। আপনি যাদের ভয় দেখাচ্ছেন, তাদের কারও অস্তিত্বই থাকবে না তখন।'

'রাখো,' বলল সিমকা, পা দোলাচ্ছে। 'আগেরটা ফেলে পরের প্রসঙ্গে চলে এসেছি আমরা। সেনিয়র রানা, হাতে সময় কম, আগে কাজের কথা সেরে নিই, তারপর দু'চার মিনিট সময় থাকলে না হয় খোশগল্প করা যাবে।

'বয়স ও নানান সমস্যার ভারে পৃথিবী আজ জর্জরিত। এর মূল কারণ দেশে দেশে অসভ্য, অভব্য জাতি, দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রপরিচালক ও আমলা ইত্যাদির জঘন্য নোংরা, স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপ। এরা কেউই যোগ্য প্রতিভার কদর বোঝে না, তাকে তার প্রাপ্য দিতে চায় না। এখানেই আমাদের ক্ষোভ, আমাদের রাগ, আমাদের দুঃখ। আমি কিছু দিতে চাইলে সমাজ-দেশ খুশি মনে গ্রহণ করবে, অথচ বিনিময়ে আমাকে কিছু দেবে না। কারণ ওরা দিতে শেখেনি, শিখেছে কেবল নিতে। দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে বিশ্ব, জর্জরিত হয়ে পড়েছে জনসংখ্যার ভারে। এই অবস্থার অবসান প্রয়োজন। বোঝা কমিয়ে পৃথিবীকে সুস্থ, জঞ্জালমুক্ত করতে চাই আমরা। ডি-ডে'র আড়ালে তাই...'

'এতগুলো বোঝা তোমার ওই ছোট্ট দুই কাঁধের পক্ষে একটু বেশি ভারী হয়ে গেল না?' বাধা দিয়ে বলে উঠল রানা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সিমকা। বোঝা গেল রাগ সামাল দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আবার যখন মুখ খুলল, একদম শান্ত, স্থির সে। মনে হলো যেন কিছুই ঘটেনি মাঝে। 'আপনাদের চারজনের মধ্যে তিনজন আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে খেটেপিটে যে সব তথ্য জানতে পেরেছেন, তার সবই সত্যি। মিথ্যে নেই ওর মধ্যে। সত্যি আমরা ধ্বংস করতে যাচ্ছি পৃথিবীর তথাকথিত কিছু সভ্য, উন্নত দেশকে। তাদের ধ্বংস করব আমরা তাদেরই অস্ত্র দিয়ে। এই হচ্ছে আমাদের ডি-ডে'র আসল প্লট। ছবি-টবি সব ভুয়া, ওসব করেছি আমরা সবাইকে বোকা বানাবার জন্যে। মানুষের পকেটের টাকা খসাবার জন্যে।

'কন্টি খুব নাম করা প্রযোজক, ম্যালোরি নাম করা পরিচালক, ছবির জগতে টাকা খাটিয়ে এরা কখনও লস করেনি, বরং মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার কামিয়েছে। এরা ছবি করতে যাচ্ছে, খুচরো বিনিয়োগকারীদের পুঁজি খাটানোর সুযোগ দিতে চাইছে, এ কথা শুনলে কে না আসবে?'

'ফাঁদ ভালই পেতেছিলে,' বলল রানা। 'কত রোজগার হলো?'

হাসল লোকটা। 'পঁচানব্বই পার সেন্ট। আপনার চেক্‌টা ডিজঅনার

করেছে ব্যাঙ্ক, নাহলে একশো পার সেন্টই হত। একশো মিলিয়ন ছিল ডি-ডে'র বাজেট, পঁচানব্বই মিলিয়ন জোগাড় হয়েছে।'

'তোমাদের সোনা যে দেশে, এ টাকাও নিশ্চই সেই দেশে রপ্তানি হয়ে গেছে?'

হাসি চওড়া হলো সিমকার। 'ঠিক বলেছেন। যাকগে, যে কথা হচ্ছিল। এই যে এত কষ্ট করে ডি-ডে তৈরি করতে যাচ্ছি আমরা, ছবি নয়, আসল ডি-ডে'র কথা বলছি আমি, এতদিন আফসোস ছিল তার কোন দর্শক থাকবে না। দর্শক অবশ্যই থাকবে, লাখো দর্শক থাকবে, কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা তো তাদের অজানা। চাচ্ছিলাম আপনাদের মত কিছু দর্শক, যাদের আগে থেকে সব জানা থাকবে এ সম্পর্কে। ভাগ্য ভাল, শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলাম।

'এখানে বসে টিভির পর্দায় আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ডি-ডে দেখতে পাবেন আপনারা, সে ব্যবস্থা করে যাব। তবে···' থেমে নাকের ডগা চুলকাল বামুন। 'এ ক্ষেত্রেও অন্য একটা আফসোস থাকবে আমাদের, বিশেষ করে বন্ধু ইজল্যাম আর ম্যালোরির। কেন না দর্শকদের প্রতিক্রিয়া জানার কোন উপায় থাকবে না ওদের।'

'তা হোক,' চকচক করে উঠল পরিচালকের দু'চোখ। 'প্রাকটিক্যাল ঘটনা ওরা দেখবে, আমরা তাতেই সন্তুষ্ট। কি বলো, বন্ধু?' হেদায়েতের দিকে ফিরল সে। মাঝারি আকারের ফুটবল দুলিয়ে সায় দিল লোকটা।

হাতে ধরা ক্রিস্টাল ডিক্যান্টারের চার আঙুল পরিমাণ বুরবোঁয় ঠোঁট ডোবাল ম্যালোরি। এক চুমুকে টেনে নিল আঙুলখানেক।

'ইউ প্যাথলজিক্যাল সাইকোপ্যাথ!' গর্জে উঠল কর্নেল পেরেসটভ। হাত ছোটাবার জন্যে মোচড়ামুড়ি শুরু করে দিল।

'শান্ত হোন, কর্নেল,' সিমকা বলল নরম সুরে। 'উত্তেজিত হবেন না। আপনার পাশে সভে ছয় ফুটী যে দুই দানব দেখছেন, ওরা আমার খুবই বাধ্যগত রোবট। কেবল একটাই নির্দেশ বোঝে, এবং সেটা ওদের মস্তিষ্কে ঢোকানো আছে। ওরা গণ্ডমূর্খ ইন্দোনেশিয়ান, মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা বোঝে না। আর ওদেরটা এখানে একমাত্র আমি বুঝি, বলতেও পারি। ওদের জাতিগত হানাহানি বন্ধ করতে জাতিসংঘের তরফ থেকে একবার ওদের দ্বীপে কয়েক মাস থাকতে হয়েছে আমাকে। মাত্রাছাড়া উত্তেজিত হলে আপনার হাত-পা টেনে ছিঁড়তে শুরু করবে ওরা একটা একটা করে।'

এক চোখ টিপল বামুন। 'ইন ফ্যাক্ট সেই নির্দেশই দেয়া আছে ওদের। কাজেই শান্ত থাকুন।' রানা ও লিউকে দেখল সে পালা করে। 'কেন কি ঘটেছে, ঘটছে এবং দু'দিন পর ঘটবে, তার ব্যাকগ্রাউন্ড আপনাদের জানার অধিকার আছে। এবার আমরা সে প্রসঙ্গে আসছি। স্যার হিউ তার বক্তব্য রাখবেন প্রথমে, কারণ আমাদের বর্তমান গল্পের শুরুটা তার নেতৃত্বেই দানা বেঁধেছিল···'

'সাসেক্সের এক মানসিক হাসপাতালে,' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রানা। 'যেখানে এক হয়েছিলে তোমরা পাঁচ উন্মাদ।'

'যা খুশি বলতে পারেন, সেনিয়র। ওসব শুনে শুনে কান পচে গেছে, আজকাল আর রাগ হয় না। হিউ, শুরু করে দাও।'

ঝুঁকে হাঁটুর ওপর হাতের ভর রেখে বসল লোকটা। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি হাতে-পায়ে বাধা পেয়ে ঠেকে গেছে, নইলে মেঝেতে ঠেকত বলে মনে হলো রানার।

'বছর দশেক আগে,' শুরু করল সে। 'মাঝে মাঝে নার্ভাস ডিজঅর্ডারনেসে আক্রান্ত হতে শুরু করি আমি হঠাৎ করে। সিনকোপ, মস্তিষ্কে রক্তস্বল্পতাজনিত কারণে হয়। যাকে সোজা কথায় মৃগী রোগ বলে। তার সাথে আরও কিছু উপসর্গ দেখা দেয়, যেমন মাথা ঝিম ঝিম করা, কিছু সময়ের জন্যে সম্পূর্ণ মেমোরি ব্ল্যাকআউট হয়ে যাওয়া, এইসব আর কি!

'সস্তায় অন্তত দু'রাত মডেল মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করা অভ্যেস ছিল আমার। এমন এক রাতে হঠাৎ স্মৃতি হারিয়ে ফেললাম, ওর মধ্যেই গলা টিপে খুন করে বসলাম সঙ্গিনীকে। আমি অবশ্য তা পরে জেনেছি। আমার বন্ধুরা মেয়েটির পরিবারকে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিয়ে ধামাচাপা দিয়ে ফেলে ব্যাপারটা। কিছুদিন পর ফের একই কাণ্ড ঘটিয়ে বসি। চারটে মেয়েকে পরপারে পাঠিয়ে হুঁশ হলো, বুঝলাম আমার চিকিৎসা প্রয়োজন।

'ভাগ্য ভাল, হাতের কাছে পেয়ে গেলাম···'

'এসব আমাদের জানা, মারসল্যান্ড,' বাধা দিল ফু-চুঙ। 'শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ তুমি।'

রেগে উঠল লোকটা। 'সিমকা! ওদের বলে দাও,' দুই দানবকে দেখাল চোখ ইশারায়। 'যে আমার কথার মধ্যে একটা কথা বলবে, তার যেন দুটো করে দাঁত উপড়ে ফেলা হয়।'

তাই করল সিমকা। মনিবের নির্দেশ শুনে মাথা ঝাঁকাল লোক দুটো। নড়েচড়ে বসল রানা। একভাবে বসে থাকতে থাকতে নিতম্ব ধরে গেছে। অন্যরাও নড়ছে থেকে থেকে। নজর নেচে বেড়াচ্ছে ঘরের সবকিছুর ওপর।

'তো, যা বলছিলাম,' স্বাভাবিক ভঙ্গিতে শুরু করল আবার স্যার হিউ। 'পেয়ে গেলাম এক জার্মান ডাক্তার, আনটেনওয়েজারকে। এই লাইনের বিশেষজ্ঞ। আমার স্যাডিস্টিক ওভারফ্লো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল সে অল্পদিনে। ওদিকে এতগুলো খুনের ব্যাপারে আমাকে ঘিরে বেশ তোলপাড় হচ্ছিল তখন দেশে। টাকা আর প্রভাব দুটোই আছে বলে কোন অসুবিধে অবশ্য হয়নি। ওপর মহল থেকে চাপা দিয়ে দেয়া হলো সে সব।

'আনটেনওয়েজারের চিকিৎসায় সুস্থ হলাম আমি। সে আমাকে বোঝাল আমার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই, সুচিকিৎসা পেলে একদম সুস্থ হয়ে উঠব আমি। নিয়মিত চিকিৎসার জন্যে নিজেই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করলাম। কিছুদিন পর বুঝলাম তার কথাই ঠিক। এরপর বেশ কয়েকবছর পেরিয়ে গেল। সব ঠিকঠাক। এই সময় হঠাৎ একদিন মনে হলো, আগেই বুঝি ভাল ছিলাম আমি। ওয়েজারের চিকিৎসায় জীবনটা কেমন নীরস হয়ে উঠেছে।

পানসে হয়ে গেছে।

'এর কিছুদিন পর মনে হলো, নীরস ভাবটা কাটানোর জন্যে কিছু করা প্রয়োজন আমার, নইলে কাজেকর্মে এনার্জি আসবে না। কিন্তু কি করব? আগের মত ছাড়া ছাড়া হত্যায় যে তৃপ্তি আসবে না, তাও বুঝে ফেললাম। তাহলে কি করা যায়? মন বলল এক ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে, পৃথিবীকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিতে। সেই প্রথম ডি-ডে'র চিন্তা ঢুকল আমার মাথায়। তখনই আমার গড়া হাসপাতালে ভর্তি হলো ক্যামিলা। তারপর একে একে এরা চারজন। আমার কাহিনী শেষ, এবার কন্টি বলো।'

কন্টি, ম্যালোরি ও সিমকার কাহিনী মোটামুটি জানা, তাই শোনার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। তবে একাত্তরের ঘাতক যখন বলতে শুরু করল, তখন মন না দিয়ে পারল না।

'…ষোলোই ডিসেম্বর রাতে শেষবারের মত হত্যা করলাম আমরা চার বিদেশী চর, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীকে। প্রথম থেকেই আশা ছিল দেশের সাধারণ মানুষ আমাদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করবে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় দৈনিক মাত্র তিন টাকা বেতনে যে অমানুষিক পরিশ্রম আমরা করেছি, সে কথা ভেবে আমাদের সমর্থন জানাবে। হলো না তা শেষ পর্যন্ত। প্রতিবেশী দেশের পয়সা খাওয়া, মুখচেনা কিছু দালালের ক্রমাগত প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হলো পূর্ব-পাকিস্তানের নিরীহ, সহজ-সরল জনগণ। এর সাথে বিদেশী প্রচার মাধ্যমের প্রচারণাও ছিল। যা হোক, পবিত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম থেকেই যে বড় দেশটি তার জানের শত্রু ছিল, তার ষড়যন্ত্র সফল হলো, দুই খণ্ড হয়ে গেল পাকিস্তান। ভিন্ন হয়ে গেল দুই ভাই।

'খুব কষ্ট লাগল। মনের ঝাল মেটাতে ষোলো তারিখ শেষবারের মত চার দালালকে হত্যা করলাম রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নিয়ে। এরপর ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করব। হাই কম্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না, খোঁজ নেই তাদের কারও। শীতকাল ছিল, চাদর মুড়ি দিয়ে মগবাজারে গেলাম দলের অফিসে খোঁজ নিতে।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল লোকটা। মনে হলো আবেগ সামাল দিতে চেষ্টা করছে। 'গিয়ে দেখি চৌরাস্তা জ্যাম করে কাকে যেন গণপিটুনি দিচ্ছে জনতা। সাহস করে কাছে গেলাম, দেখি…সে আমারই যমজ ভাই। মাত্র কয়েক মিনিটের ছোট আমার থেকে। চেহারা এক বলে ওকে আমি ভেবে বেদম মার মারছে একদল মানুষ। কতবার ভাবলাম তাদের বলি, দোষ করলে আমি করেছি। আমাকে মারো, ওকে ছেড়ে দাও। সাহস হলো না। আতঙ্কে আর ছোট ভাইয়ের অসহায় কাতর আর্তনাদ শুনে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেও ওকে সাহায্য করতে না পারার দুঃখে বুকের মধ্যে কি যে হচ্ছিল আমার তখন, সে আমিই জানি। চোখের সামনে মৃত্যু হলো আমার ভাইটার।

'ধিক্কার জন্মাল নিজের ওপর, গোটা বাঙালী জাতটার ওপর ঘৃণা জন্মাল সে সব বুকে পুষে রেখে পালালাম। নয় মাসে মোটামুটি পয়সাকড়ি

জমিয়েছিলাম, তার কিছু খরচ করে লন্ডন চলে এলাম। কম্পিউটরের ওপর বিভিন্ন কোর্স করে শো বিজনেসের সাথে নিজেকে জড়ালাম। স্যার হিউর সাথে পরিচয় হলো। তারপর…'

বাধা দিল মাসুদ রানা। 'উন্মাদ হলে কি করে?'

থমকে গেল হেদায়েতুল ইসলাম। দু'চোখ জ্বলে উঠল। অবশ্য সাথে সাথে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল সে। পাত্তা না দিয়ে আবার শুরু করল, 'লন্ডনবাসের দেড় দশকেরও বেশি হয়ে গেছে, অথচ তখনও পর্যন্ত উন্মত্ত জনতার সেই রুদ্ররূপ ভুলতে পারিনি আমি। প্রায় সময়ই ছোট ভাইটার রক্তাক্ত মৃত চেহারা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। একেক সময় মনে হত পাগল হয়ে যাব আমি। বাঙালীর ওপর ঘৃণাও কেন যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। একদিন ইস্ট এন্ডের এক বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে গেলাম কিছু ব্রিটিশ বন্ধু নিয়ে। খাওয়া সেরে বের হয়ে আসার সময় ওটার বাঙালী মালিক-কাম-ম্যানেজারকে সামান্য কথায় খুন করে রেখে এলাম।

'একই কাণ্ড আরও কয়েকবার ঘটবার পর ধরা পড়লাম। স্যার হিউ বাঁচালেন আমাকে। তার আইনজীবী কোর্টে প্রমাণ করে ছাড়ল আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি, আমাকে সুস্থ করে তোলার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সাসেক্সের…'

'বুঝলাম,' মাথা দোলাল ও। সিমকার দিকে ফিরল। 'আর কিছু?'

'আর একটু বাকি রয়ে গেছে এখনও,' হাসল সে। 'ফিনিশিং টাচ্ যাকে বলে ফিল্‌মি ভাষায়। নাকি, ইজল্যাম! তাই তো বলো তোমরা?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা হচ্ছে,' রানার দিকে ঘুরল লোকটা। 'আমরা পাঁচজন পাঁচ লাইনের বিশেষজ্ঞ, পাঁচ প্রতিভা। একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল যদিও। মনের জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে, দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছি আমরা পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থাকে, গোটা পৃথিবীটাকেই চরম এক শিক্ষা দেয়ার সুযোগের আশায়।

'এই সমাজ ব্যবস্থা আমাদের প্রত্যেককে নানাভাবে আহত করেছে, কষ্ট দিয়েছে। আমাকে আমার খুদে আকৃতির জন্যে, কন্টিকে তার সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে, স্যার হিউকে তার জাত নিচু বলে, ম্যালোরিকে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি প্রদানে ইচ্ছেকৃত অবহেলার মাধ্যমে, আর ইজল্যামকে পুরস্কৃত করার বদলে ধিক্কৃত করে, ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। একা একা আমাদের পক্ষে এতবড় একটা কাজে সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। বোধহয় জানেন, সেইন্ট জর্জকে প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র দিয়েই ড্রাগনদের সাথে লড়াই করতে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি একা ছিলেন বলে সফল হতে পারেননি, বরং ড্রাগনরা তাঁকে উল্টে মাছিতে পরিণত করেছিল।

'বড় শত্রুর সাথে লড়তে উপযুক্ত অস্ত্র চাই, সাহস চাই, বুদ্ধি চাই, অর্থ চাই। এত চাই একজনকে দিয়ে পূরণ হতে পারে না, তাই আমরা পাঁচজন একসঙ্গে হয়েছি। একে আপনারা টেকনিক্যালি ক্রিমিনাল বলতে পারেন, কিন্তু

সমাজ-পৃথিবী আমাদের সাথে যে আচরণ করেছে, সেগুলোকেও আমরা তাই বলেই জানি।

'কম্পিউটরের সাহায্যে ইজল্যামের যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতা ও দক্ষতা রীতিমত অবিশ্বাস্য। ব্যাপারটা জানামাত্র আর সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার জন্যে উঠেপড়ে লাগি আমি। একটু একটু করে এগোতে থাকি। কিছু কিছু মারাত্মক অস্ত্র-মিজাইল সংগ্রহের জন্যে আমি আইআরএর কাছে গিয়েছি, উরুগুয়ে-সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়ার কাছেও গিয়েছি। ওরা কেউ আমাকে হতাশ করেনি। পারমাণবিক ওয়ারহেডের জন্যে গিয়েছি রাশান মাফিয়ার কাছে, যা চেয়েছি তাই জোগাড় করে দিয়েছে ওরা। সময় লেগেছে। কিন্তু হাল ছাড়িনি। বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে, অনেক সময় তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ভাল জিনিস সংগ্রহ করতে হয়েছে আমাদের।

'অবশেষে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছেছি আমরা। তবে ন্যাটো আর ইন্টারপোলের সন্দেহের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে হয়েছে আমাদেরকে, ভেতরের বিষয় সব জানাজানি হয়ে গেছে। বিপদ ঘটতে পারে ভেবে আমরাও তাই খুব দ্রুত সেরে ফেলেছি সমস্ত কাজ। কারও ক্ষমতা নেই এখন আমাদের ঠেকায়।

'ওয়্যারহাউসে যা যা ছিল, তা আজ রাতে সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা এমনিতেই ছিল আমাদের, কিন্তু সেনিয়র মাসুদ রানা বাগড়া দেয়ায় গতরাতেই সে কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের তিন ওয়্যারহাউসের ফ্লোরই আসলে এলিভেটর, প্রয়োজনের সময় ফুল লোডসহ ওঠানো-নামানো যায়। আমাদের ইজল্যামের আরেক অবিশ্বাস্য কীর্তি। ইলেক্ট্রনিক মেকানিজমের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় পৃথিবীতে কেউ আছে, আমাদের মনে হয় না।

'যা হোক, রাতে অবাঞ্ছিত কেউ ওয়্যারহাউসে ঢুকেছে টের পাওয়ামাত্র সব নামিয়ে আনা হয়েছে। কনভেয়র বেল্টে চড়ে যে যার জায়গায় অবস্থান নেয়ার জন্যে রওনা হয়ে গেছে সে-সব। কারণ, আমরা আশঙ্কা করেছিলাম একবার যখন রেইড হয়েছে, হয়তো আবারও হবে। এদেশের ফিলম ইন্ডাস্ট্রিতে কন্টির শত্রুর অভাব নেই, আমারও শত্রুর অভাব নেই। তারা যদি আমাদের ফাঁসাবার জন্যে বস্তা বস্তা টাকা ঢালে, দ্বিতীয়বার হানা দেয়ার অনেক টেকনিক্যাল ছুতো বের করে ফেলবে পুলিস বা আর্মি। তাই ওসব রাখার ঝুঁকি নেইনি, সময় হওয়ার আগেই সরিয়ে ফেলেছি।

'এখন আর কোন ভয় নেই আমাদের। হাজারবার রেইড চালানো হলেও আপত্তিকর কিছু পাবে না ওরা। আপনাদের জন্যে কিছু কিছু ঝামেলা আমাদের পোহাতে হয়েছে, কিন্তু এই চোর পুলিস খেলায় মজাও কম পাইনি আমরা। সব মিলিয়ে ভারি উপভোগ্য ছিল পুরোটা।'

ঘড়ি দেখল সিমকা। 'সন্ধে হয়ে এসেছে। ইজল্যাম বাদে আমরা চারজন এখনই চলে যাব এই জায়গা ছেড়ে। হোটেলে গিয়ে মিস ক্যামিলাসহ ফাইনাল ডিনার করব এর্দেশে। তারপর কন্টির প্রাইভেট জেট নিয়ে চলে যাব আমাদের নতুন আশ্রয়স্থলে। ওটা এমন এক জায়গা, সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও

আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকব। পরিকল্পিত হলোকাস্ট আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবু অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্যে আমাদের বসবাসের যে সুরক্ষিত ভবন আমরা নির্মাণ করেছি, তার পঞ্চাশ ফুট মাটির নিচে আছে সাব-সাব-সাব বেজমেন্ট কোয়ার্টার্স। সেখানে ফিল্টারড্ বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে। বিদ্যুৎ, পানিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছুরই ব্যবস্থা আছে। আয়োজন এতই বিলাসবহুল আর আরামদায়ক, কোন আরব দেশের রাজা-রাজড়ারও তা কল্পনার বাইরে।

'আমাদের সোনা-দানা, টাকা পয়সা সব ওখানে গচ্ছিত আছে। ওসবের পাহারায় আছে এদের মত এক কুড়ি সাড়ে ছয় ফুটী দানবের এক প্রাইভেট বাহিনী। আর কি চাই? টানা তিন মাস ওর মধ্যে থেকে না বের হলেও চলবে আমাদের।'

'ইসলাম কেন যাচ্ছে না তোমাদের সাথে?' কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না রানা।

'প্রোগ্রামিং টেপের শেষ প্রিপারেশন কমপ্লিট হতে এখনও কিছুটা বাকি আছে, তাই। ওগুলো সেরে কাল দুপুরের আগেই রওনা হয়ে যাবে ও। হাতে মাত্র দু'দিন সময়। সোমবার শুরু হবে আমাদের কম্পিউটরচালিত খেলা, ব্রিটিশ...'

'চ্যানেলে এক অয়েলট্যাঙ্কার উড়িয়ে দেয়ার মধ্যে দিয়ে,' বলে উঠল ও। 'তাই না, ডন লুপো?'

বিস্ময় ফুটল সিনেটরের মুখে। অন্য চারজন হতবুদ্ধি হয়ে এর-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। 'আপনি কি করে জানলেন এ খবর?' প্রশ্ন করল সিমকা।

হেসে উঠল রানা। 'তোমরা থাকো ডালে ডালে, সিমকা, আর এখানে আমরা যারা রয়েছি, তারা থাকি পাতায় পাতায়। বুঝলে কিছু?'

কথা বলার জন্যে কয়েকবার মুখ খুলল লোকটা, কিন্তু সফল হলো না। ঝট্ করে সঙ্গীদের দিকে ফিরল এবার। 'তোমরা কেউ বলেছ?' স্যার হিউর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সে।

'আমরা?' অবাক হলো হিউ। সিমকার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে তার বিশাল দেহ একটু যেন কুঁকড়ে গেল। 'নাহ্!'

'তোমাদের মধ্যে কেউ?' অন্য তিনজনের দিকে তাকাল বামুন। একযোগে না সূচক মাথা দোলাল সবাই। এদিকে রানার সঙ্গীরা ওকে দেখছে হাঁ করে।

ওর দিকে ফিরল সিমকা। চোখে সন্দেহের ছায়া। 'কথাটা জানাজানি হয়ে গেছে তাহলে?'

'ছাগলের মত অর্থহীন ডাক ছেড়ো না, সিমকা,' আবার হাসল রানা, তবে এবার নিঃশব্দে। 'না হলে আমি জানলাম কি করে?'

গালিটা গায়ে মাখল না বামুন। চোখ লাল করে তাকিয়ে থাকল। 'কি করে হলো? কে বলেছে?'

'প্রথমে তুমি বলেছ।'

অভিযোগ শোনামাত্র চেহারা থেকে রাগ উবে গেল লোকটার, দুশ্চিন্তা ফুটল। 'আ-আমি বলেছি?'

'হ্যাঁ, সেদিন লাঞ্চ পার্টি শেষে রেস্টুরেন্টে এই নিয়ে তুমি আলাপ করছিলে কন্টি আর লেনের সাথে। একটু একটু শুনেছি। পরে মনযা রুমে বসে হিউ-ম্যালোরিও একই বিষয় নিয়ে কথা বলছিল। তখন জেনেছি পুরোটা। তোমাদের দুর্ভাগ্য যে দু'বারই কথাটা কানে এসেছে আমার।' একটু বিরতি দিল ও। 'সরি, তোমাদের ডি'ডে'র সিগনেচার টিউনের তাল কেটে দিয়েছি আমি। সোমবার কোন অয়েলট্যাঙ্কার চ্যানেলে ঢুকবে না।'

'অ! তা···ঠিক আছে, কষ্ট করে অন্য ব্যবস্থাই না হয় করে নেব,' সঙ্গীদের দিকে ফিরল সিমকা সমর্থনের আশায়। ভুলটা প্রথমে নিজের দ্বারাই হয়েছে বুঝতে পেরে বেকুবের মত হাসল। 'কি বলো তোমরা?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল স্যার হিউ। 'অবশ্যই! ট্যাঙ্কার না হলে না হবে, অন্য টার্গেট ঠিক করে নেব। বড়জোর এক ঘণ্টার ব্যাপার।'

'তাই করতে হবে দেখছি,' চোখ কুঁচকে আনমনে বলল বামুন।

এদিক-ওদিক মাথা দোলাল রানা। 'তাতেও কাজ হবে না, ভায়ারা! তোমাদের মামলা খতম। এই জন্যেই তখন বলছিলাম তোমাদের জন্যে ইলেক্ট্রিক চেয়ার অপেক্ষা করছে।'

'মানে?' সিমকা মুখ খোলার আগে হিউ প্রশ্ন ছুঁড়ল।

'রাতে আমি খালি হাতেই ওয়্যারহাউসে ঢুকেছিলাম ভাবছ বুঝি তোমরা?' বাঁকা হাসি হাসল ও। 'হাওয়া খেতে?'

চেহারা থমথমে হয়ে উঠল বামুনের। অস্থির হয়ে উঠেছে, ডান হাত মুঠো পাকাচ্ছে ঘন ঘন। 'কি বলতে চাও?'

'বলতে চাই তোমাদের সমরাস্ত্রের মধ্যে অন্তত কয়েকটা গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। কারণ ওগুলোর সাথে আমি হোমিঙ ডিভাইস প্ল্যান্ট করে রেখেছিলাম। এতক্ষণে হয়তো সরকারী আর্মি···'

'মিথ্যে কথা!' তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সিমকা। ক্ষীণ আতঙ্কের আভাস চেহারায়। 'মিথ্যে বলছ তুমি!'

'ওঅর মিনিস্ট্রির মনিটরিং মেশিনে ওগুলোর ব্লিপের বিয়ারিং চিহ্নিত করে তবেই এখানে এসেছি আমরা, সিমকা। বিশ্বাস না হয় মেজর মিলিয়ারডোনের কাছে ম্যাপটা আছে, দেখে নিতে পারো।'

ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা। ওদিকে মেজর আর রুশ কর্নেল হোমিং ডিভাইসের ব্যাপারে রানার ডাহা মিথ্যে কথা শুনে হাঁ হয়ে গেছে। মনে মনে অবশ্য। ফু-চুঙ মুখ নিচু করে হাসি ঠেকানোর কসরতে ব্যস্ত। নড়ে উঠল সিমকা। উন্মাদের দৃষ্টিতে তাকাল মেজরের দিকে। 'কোথায় সেই ম্যাপ!' গলায় যতটা জোর সে ফোটাতে চাইল, তার সিকি ভাগও ফুটল না।

ইউনিফর্মের সাইড পকেট দেখাল মিলিয়ারডোন। 'এখানে।'

বামুনের নির্দেশে গার্ডদের একজন বের করে নিল সেটা, তুলে দিল তার হাতে। ফড় ফড় শব্দে ব্যস্ত হয়ে ওটা খুলল সে। 'ভাল করে দেখো,' ফোড়ন কাটল রানা। 'লাইন দুটো যেখানে ক্রস করেছে, ঠিক সেখানেই এই জায়গা।'

পাঁচ উন্মাদ ম্যাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লিউ ফু-চুঙ ফিরল রানার দিকে। হাসল। 'নাচাচ্ছিস্ ভালই, দোস্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত···'

'শাট্ আপ্!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল স্যার হিউ। 'ইউ ডার্টি ইয়েলো স্কিনড্ বাস্টার্ড!'

ছোট ছোট পা ফেলে রানার চার হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল সিমকা। 'কতগুলো হোমার প্ল্যান্ট করেছ?'

সম্বোধন পাল্টে যাওয়ার ব্যাপারটা কান এড়াল না ওর। 'অনেক।'

'কতগুলো!' একঘেয়ে গলায় বলল সে, অজান্তেই আবার এক পা এগোল। 'তাড়াতাড়ি বলো!'

'তুমি মাইন্ড করলে মনে হচ্ছে?' অবাক হওয়ার ভান করল রানা। 'আমার হোটেল রুমে তুমিও তো কয়েকটা পেতেছিলে। কই, আমি তো মাইন্ড করিনি!'

বেখেয়ালে, উত্তেজনায় আরও এক পা এগোল সিমকা। প্রচণ্ড রাগে চেহারা বিকৃত। 'শুয়োরের বা···'

মনের সুখ মিটিয়ে দড়াম করে মারল রানা লাথিটা, একেবারে মোক্ষম জায়গায়। ছোট্ট দেহটা হাত দেড়েক শূন্যে উঠে পড়ল, পিছিয়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল কন্টির পায়ের কাছে। ম্যাপ ছেড়ে দু'হাতে জায়গাটা আঁকড়ে ধরে গোঙাতে থাকল, সেজদার ভঙ্গিতে শুয়ে গাল ঘষছে কার্পেটে। ওর মধ্যেও হুঁশ যোলো আনাই আছে। গার্ডদের একজন ছুটে আসতে যাচ্ছিল দেখে ধমক মেরে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিল সে।

বেশ কিছু সময় পর বন্ধুদের সাহায্যে উঠে দাঁড়াল সিমকা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আবার ওর সামনে এসে দাঁড়াল। তবে এবার দূরত্ব রক্ষার ব্যাপারে সতর্ক। এক গার্ডকে কাছে ডেকে কিছু বলল, মাথা দুলিয়ে অস্ত্রটা ওয়েস্ট ব্যান্ডে গুঁজল লোকটা।

'একে আমি বলে দিয়েছি,' রানাকে বলল সে। 'আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে যতবার অস্বীকার করবে তুমি, ততবার তোমার নাকেমুখে একটা করে ঘুসি মারতে। ওর কব্জি আর মুঠো দেখো। দেখেছ?' রানা মাথা দোলাতে বলল, 'ওর হাতের একটা ঘুসি খেলে ঘিলু জায়গায় থাকবে না তোমার। এবার বলো, কতগুলো হোমার প্ল্যান্ট করেছ?'

'দশটা,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল ও। সঙ্গীরা সবাই রুদ্ধশ্বাসে রানাকে আর দানবটাকে দেখছে। আশঙ্কায় শক্ত হয়ে আছে।

'কোন্ কোন্ ওয়েপনের সাথে?'

'সব মনে নেই। তবে টেবিলের ওপর খোলা একটা টর্পেডো ছিল, ওটার সাথে একটা, আর বাকি সব ট্যাঙ্ক আর মিজাইলের সাথে প্ল্যান্ট করেছি।'

'ওগুলোর সিগন্যাল পিক্ করেছ তোমরা ওয়ার মিনিস্ট্রিতে বসে?' রানা ও মিলিয়ারডোন, দু'জনকে করল সে প্রশ্নটা।

'হ্যাঁ,' বলল ও। অফিসার মাথা দোলাল।

'ওদের কমিউনিকেশনস্ সেল থেকে?'

'কি জ্বালা!' চোখমুখ কুঁচকে তাকাল রানা। 'ওখান থেকে না তো কি ক্লারিক্যাল সেকশন থেকে?'

রাগতে গিয়েও মেজাজ সামাল দিল সিমকা। নিবিড় দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড। 'এতগুলো হোমার···সারাদিন কেটে গেল অথচ আর্মি ফ্রেশ স্টেপ নিল না, এ হতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া পথে যদি ওগুলোকে ঠেকানো হত, অনেক আগেই খবর পেয়ে যেতাম আমরা।'

পিছিয়ে গেল সে। 'ঠিক আছে। এখনই জেনে নিচ্ছি। কন্টি, ফোন লাগাও মিনিস্ট্রিতে। কমিউনিকেশনস্ অফিসারকে বলো আমি কথা বলব।'

এক মিনিটের মধ্যে প্রার্থিত লোকটির সাথে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল প্রযোজক। তাকে জানাল কে কথা বলবে, তারপর রিসিভার তুলে দিল বামুনের হাতে। 'হ্যালো!···সি! আজ কারা নাকি তোমার ওখানে গিয়েছিল তোমার লোকেটর মেশিন ব্যবহার করতে?···আচ্ছা! মিনিস্টার অর্ডার দিয়েছে?···সি!' অনেকক্ষণ চুপচাপ। 'তুমি দেখেছ কতগুলো···'

মাসুদ রানার খেয়াল নেই সেদিকে। বুঝে ফেলেছে চালাকি ধরা পড়ে গেছে। লিউ ফু-চুঙকে দেখল ও, অন্য দু'জনকেও। সবার চেহারায় শঙ্কা।

লাইন কেটে আরেক নম্বরে ফোন করল সিমকা। দ্রুত, চাপা গলায় কিছু নির্দেশ দিল, তারপর ঘুরে দাঁড়াল রিসিভার রেখে। অনেকক্ষণ পর আবার হাসি ফুটেছে মুখে। গার্ডকে নিজের জায়গায় যেতে নির্দেশ করল।

'পাওয়া গেছে, সেনিয়র,' অমায়িক কণ্ঠে বলল সে। সম্বোধন আবার আগের জায়গায় ফিরে গেছে। 'সংখ্যার ব্যাপারে একটু ভুল হয়েছিল আপনার, তাই না? একটা শূন্য ইচ্ছে করে বাড়িয়ে বলেছিলেন আপনি।' সঙ্গীদের উদ্দেশে গাল ভরা হাসি দিল ঘুরে। 'রিল্যাক্স! সেনিয়র ঠাট্টা করছিলেন আমাদের সাথে। একটামাত্র হোমার প্ল্যান্ট করেছিলেন, একটা রুশ মিগ চব্বিশ ফ্লিপার ফাইটারের ককপিটে।'

রানাকে দেখল কৌতুক মাখা দৃষ্টিতে। 'খবর জানিয়ে দিয়েছি জায়গামত। এতক্ষণে হয়তো ওটাকে ডিটাচ্ করা হয়ে গেছে।'

আরেকদিকে তাকিয়ে থাকল ও। মেজাজ খাট্টা। ধাপ্পায় কাজ তো হলোই না, বরং হোমারটা খোয়াতে হলো। ফোনের বেল বেজে উঠতে সেদিক তাকাল রানা। কন্টি ধরল ফোন। দু'তিনবার 'সি! সি!,' করল, তারপর 'গ্র্যাযি!' বলে রেখে দিল। 'ওটা পাওয়া গেছে, সিমকা। নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।'

'গুড!' ফোঁস করে দম ছাড়ল সিনেটর। 'কি লাভ হলো?' অভিযোগের সুরে প্রশ্ন করল রানাকে। 'শুধু শুধু দেরি করিয়ে দিলেন আমাদের! যাক্, কিছু

সময় না হয় গেছে, এ আর তেমন কি? এবার আমাদের শিডিউল্ড্ প্রোগ্রামে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। যাওয়ার আগে আপনাদের···'

'আমাদের মেরে রেখে যাওয়াই তোমার জন্যে ভাল হবে, সিমকা,' বলল কর্নেল পেরেসটফ।

শ্রাগ করল লোকটা। 'আজকাল আর একটা-দুটো হত্যা করে মজা পাই না।'

'রোজানার বেলায় পেয়েছিলে?' প্রশ্ন করল রানা।

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। 'আপনি জানতেন?' একটু বিরতি। 'হ্যাঁ, ওর বেলায় বেশ মজা পেয়েছি। বিশ্বাসঘাতকদের খুন করে মজা পাই আমি।'

'কোন পথে ঢুকেছিলে তুমি আমার স্যুইটে?'

'কেন, যে পথে আপনি দু'দু'বার বেরিয়েছিলেন, সেই পথে? ও আমার যথেষ্ট স্নেহের পাত্রী ছিল, অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছি। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করল। ড্রি-ডে সম্পর্কে আমার দুয়েকটা বেফাঁস মন্তব্য প্রেমিকের কানে তুলল। এরপর কয়েকদিন মহা বিরক্ত করেছে আমাদের ছেলেটা, আমাদের অতীত জানার জন্যে একেবারে উঠেপড়ে লেগেছিল।

'প্রথমে পাত্তা দেইনি। কিন্তু যখন দেখলাম বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তখন প্রতিকার না করে পারলাম না। শেষ করে দিলাম হারামজাদাকে। তারপর রোজানাও বাড়াবাড়ি শুরু করল। ভেতরের খবর নিতে গিয়ে দেখি, ওরে বাবা! বেশ আগে থেকেই ন্যাটোর ইনফর্মার ও, কাজ করে হারামজাদা নরডেনের হয়ে। অল্প-স্বল্প যেটুকু দয়ামায়া ছিল মেয়েটির জন্যে, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিয়ে মনকে শক্ত করলাম, তারপর যখন দেখলাম আপনাকেও আমার বিরুদ্ধে তথ্য জোগাতে এসেছে, দিলাম শেষ করে। ওকে খুন করেছি আমি নিতান্তই প্রয়োজনের তাগিদে, আপনাদের ব্যাপার তো তা নয়। তাছাড়া আপনাদের মেরে রেখে গেলে ইজল্যাম ও ম্যালোরির দর্শকের কি হবে? সে ঘাটতি পূরণ করার মানুষ কোথায়?'

'কঠিন সমস্যা,' বলল রানা।

'না না, সমস্যা কিসের?' উদার হাসি দিল সিমকা। 'সমস্যার কিছু নেই। আপনারা চারজন মহামূল্যবান রত্ন, আমাদের আসন্ন ধ্বংসযজ্ঞের একমাত্র অডিয়েন্স, ড্রি-ডে'র ভেতরের সমস্ত কথা যারা জানে। মেরে ফেলা তো অনেক পরের কথা, আপনাদের শরীরে এমনকি একটা টোকা দিতেও আমি রাজি নই।

'যেখানে ধরা পড়েছিলেন, ক্যাটাকমের সেই জায়গায় আপনাদের ফেরত পাঠাব এখন আমি। টিভির আয়োজন থাকবে, আয়েশ করে শুয়ে-বসে তাতে দেখতে পাবেন সমস্ত ঘটনা। কাগজ-কলমের মজুতও থাকবে, ইচ্ছে হলে টিভিতে যা দেখবেন, সে ব্যাপারে নিজেদের অভিজ্ঞতা লিখে রেখেও যেতে পারবেন ভবিষ্যতের জন্যে। খিদে, তেষ্টায় মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ওখানে আপনাদের আর কিছু করার থাকবেও না আসলে। আমরা তাই আশা করব

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে আমাদের সৃষ্ট ইতিহাস লেখার ব্যাপারে সিরিয়াস থাকবেন আপনারা, যাতে কয়েকশো বছর পর আপনাদের হাড়গোড় আর ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি যখন উদ্ধার হবে, তখন মানুষ সত্যি ঘটনা জানতে পারে।'

ওদের চারজনকে আরেকবার ভাল করে দেখে নিল বামুন। 'এ জন্মের মত বিদায় তাহলে, সেনিয়র মাসুদ রানা। আপনাদের মত টিকটিকিদের সাথে শেষ মুহূর্তগুলো বেশ ভালই কাটল। প্রচুর মজা পেয়েছি আমি বিশেষ করে আপনার বুদ্ধিমত্তা আর স্মার্টনেসের পরিচয় পেয়ে। আপনি একাই যথেষ্ট উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন আমাদের, উপভোগ্য করে তুলেছিলেন শেষ দুটো দিন। তাই একটা ধন্যবাদ অন্তত আপনার প্রাপ্য।'

দানব দুটোর উদ্দেশে কিছু বলে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল বামুন, পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল মেজর মিলিয়ারডোন। 'কুত্তার বাচ্চা! শুয়োরের বাচ্চা! তোকে···তোকে আমি···' কথা শেষ করতে পারল না লোকটা, পিছন থেকে উজির বাঁট দিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে বসল এক গার্ড। মুহূর্তে জ্ঞান হারাল সে।

'আফসোস!' মাথা দোলাল সিমকা। 'বিদায়ের সময়টায় এমন এক অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটাল মানুষটা!' দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেল সে সঙ্গীদের নিয়ে।

পিছন থেকে চেয়ারসুদ্ধ জাপটে ধরে রানাকে তুলে নিল এক গার্ড, অন্যজন লিউকে। নিয়ে চলেছে নিচের ক্যাটাকমে। চোখে চোখে কথা বলল দুই বন্ধু, একযোগে সামনে ঝুঁকল, পরক্ষণে মাথার পিছন দিয়ে দড়াম করে আঘাত করে বসল দানব দুটোর নাকেমুখে। চাপা গোঙানি ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল ওরা, চেয়ার ছেড়ে নাক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চেহারা। যন্ত্রণায় তড়পাচ্ছে।

কাত হয়ে পড়েছিল রানা, পড়েই নিজেকে মুক্ত করার জন্যে মরিয়া হয়ে বাঁধন টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু দুয়েকটা টানের বেশি দিতে পারল না, তার মধ্যেই সামলে নিয়েছে দুই ইন্দোনেশিয়ান, এক হাতে রক্ত মুছতে মুছতে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। ব্যাটাদের ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা অবাক করল রানাকে। শেষ মুহূর্তে ভারী জুতো পরা পা তুলেছিল ও কাছের গার্ডের দুই পায়ের ফাঁকে মারার জন্যে, সুযোগ পেল না। মস্ত মুঠোয় খপ্ করে পায়ের কব্জি ধরে ফেলল লোকটা, এত জোরে মোচড় দিল যে চেঁচিয়ে উঠল ও তীব্র ব্যথায়। পরক্ষণে মাথার পিছনে শক্ত কিছুর বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারাল।

কতক্ষণ পর হুঁশ হলো, জানে না রানা। হাতঘড়ি বন্ধ। বোধহয় আছাড় খাওয়ার সময় ঘটেছে কাজটা। ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে নিজেকে আগের সেই খাঁচায় আবিষ্কার করল ও। চেয়ারে বসা, তবে বাঁধন খোলা। অন্যরাও আছে সঙ্গে। কর্নেল পেরেসটফ ও মিলিয়ারডোন সজাগ। কর্নেল অক্ষত আছে দেখা গেল। ঝুঁকে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম?'

প্রশ্নটা করে নিজেই চমকে উঠল ও গলা দিয়ে কোলা ব্যাঙের শব্দ বের হচ্ছে শুনে।

'ঘণ্টা দেড়েক,' নড়ে বসল পেরেসটভ। 'এখন কেমন বোধ করছেন?'

'ভাল।' নড়তে গিয়ে ককিয়ে উঠল রানা। সারা গায়ে তীব্র যন্ত্রণা।

'ওরা আপনাদের দু'জনকে খুব মেরেছে,' ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল মিলিয়ারডোন। 'খুব মেরেছে।'

ধীরে ধীরে হাত-পা নাড়ল মাসুদ রানা। কষ্ট লাগলেও হাড়গোড় সব আস্তই আছে বুঝে আশ্বস্ত হয়ে চেয়ার ছাড়ল। ফু-চুঙ গুঙিয়ে উঠল এই সময়। সেদিকে সময় নষ্ট না করে গ্রিলের দিকে এগোল রানা, দু'হাতে ধরে ঝাঁকাল। একচুল নড়ল না। জানে কাজ হবে না, তবু টেনে ওপরে তোলার চেষ্টা করল।

'আমরা দেখেছি চেষ্টা করে,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কর্নেল। 'অনেক চেষ্টা করেছি। কিছু করতে পারব না জেনেই আমাদের বাঁধন খুলে দিয়ে গেছে হারামজাদারা।'

খাঁচার চারদিকে নজর বোলাল রানা। টেনিস টেবিলের মত বড় এক টেবিল দেখা গেল, দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে। তার ওপর একটা বত্রিশ ইঞ্চি গ্রুনডিগ কালার টিভি। তার পাশে একগাদা রুল করা প্যাড ও গোটা বিশেক বল পয়েন্ট কলমও আছে দেখতে পেল রানা। কথামত ওদের জন্যে ইতিহাস চাক্ষুষ করা এবং লিখে রাখা, দুটোর ব্যবস্থাই করে রেখে গেছে পিয়েরো সিমকা।

লিউ চেয়ার ছেড়ে হাত নাড়ছে। ব্যথায় চেহারা বিকৃত। মিলিয়ারডোনের চেহারায় হতাশা আর পরাজয়ের কালিমা। 'ক'টা বাজে?' জানতে চাইল রানা।

হাতঘড়ি দেখে নিল কর্নেল। 'প্রায় আটটা।'

মুক্তি পাওয়ার উপায় নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল ও। কোন উপায় পাওয়া গেল না। সবাই মিলে ঘণ্টাখানেক পণ্ডশ্রম করল গেট দুটোর পিছনে, একই হলো ফল। একচুল পরিমাণও নড়ল না। কম্পিউটারাইজড রিমোট কন্ট্রোল গেট, এখান থেকে কিছুই করার উপায় নেই। এক সময় হাল পুরো ছেড়ে দিল রানা, দু'হাতে চুল মুঠো করে ধরে বসে থাকল অসহায়ের মত। মাথার মধ্যে রাজ্যের উল্টোপাল্টা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত এইভাবে মরণ লেখা ছিল কপালে? ইঁদুরের মত খাঁচায় বন্দী অবস্থায়? অস্ত্র নেই ওদের কারও কাছে, প্রথম চোটেই সে সব হাতিয়ে নিয়েছে সিমকা। ওর জুতোর হীল কম্পার্টমেন্টে ছোট্ট একটা চাকু একমাত্র সম্বল এ মুহূর্তে। কিন্তু এরকম কঠিন সময়ে ওটা কোন কাজেরই না। আর কোন উপায় নেই? অন্যমনস্ক চোখে গ্রিলের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। ওপাশে অন্ধকারে হুটোপুটি করছে একদল ধেড়ে ইঁদুর, ওদের ডাকাডাকিতে জ্যান্ত হয়ে আছে ক্যাটাকম।

কি ভেবে এত বিপদেও হাসি পেল। চেষ্টা-চরিত্র করে একটা ইঁদুর ধরলে

কেমন হয়? ভাবছে ও, কাগজ তো আছেই, একটা এসওএস বার্তা লিখে সেটা পায়ে বেঁধে ওটাকে ছেড়ে দিলে···অথবা কাগজগুলোর সাহায্যে কিছু করা সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব। ওগুলো সব এক করে জ্বেলে আগুন পোহানো যায়, অথবা ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায়। কলমগুলো দিয়ে কিছু একটা করা যায় না?

না, ওগুলো ছোট। তাহলে···টিভির কোন পার্টস দিয়ে? ম্যাগনেট বা ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার দিয়ে? টেবিল! টেবিলের পায়াগুলো খুব মোটা, ওগুলো ভেঙে যদি গ্রিলের নিচে ঢুকিয়ে চাড় দেয়া যায়, কাজ হবে? নাহ্! চাড় দেয়ার উপায় নেই, কারণ গ্রিলের শিকগুলো খাড়া। নিচে যে লম্বা লোহার আড়া আছে, সেটা একদম সেঁটে আছে প্যাসেজের ফ্লোরে, অত মোটা কাঠ কিছুতেই ঢোকানো যাবে না তলা দিয়ে।

অনেকক্ষণ পর চিন্তার খৌলস ছেড়ে বের হলো রানা। লিউর দিকে তাকাল। 'ক'টা বাজে রে!'

'একটা।'

সর্বনাশ! ভাবল ও, ঘড়ি কি ঘোড়া হয়ে গেল নাকি আজ? ওরা চার হারামজাদা তো কয়েক ঘণ্টা আগেই পগারপার হয়ে গেছে, বাকিটাও হবে সকালে। ওটাকে যদি বাধা দেয়া যেত···কিন্তু কি করে? কোন উপায় নেই। ওদেরই মাথার ওপরে কোথাও বসে ডি-ডের ফিনিশিং টাচ্ সেরে প্রোগ্রাম ফীড করবে সে কম্পিউটরে, তারপর···

'রানা!' ডাকল লিউ চাপা স্বরে।

ঘুরে তাকাল ও। 'কি?'

'কারও পায়ের আওয়াজ পেলাম যেন।'

'কোন্ দিকে?' ঝট্ করে সোজা হয়ে গেল রানা।

'ওদিকে,' যেদিক থেকে ওরা এসেছে, সেদিকটা দেখাল চিনা।

'দূর! কে আসতে যাবে···' থেমে গেল ও হিরনের ওপর চোখ পড়তে।

'হাসুন সবাই,' বলে নিজেই হাসল যুবক। 'ইউ আর অন ক্যানডিড ক্যামেরা।'

তার পিছনে দেখা গেল তিন চিনা দানবকে। ভেতরে হঠাৎ করে প্রাণ ফিরে পেল যেন সবাই, মহাব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাছে এসে গ্রিল ধরল হিরন, ঝাঁকি দিয়ে দেখল কয়েকটা। কাঁধে বড় এক ব্যাগ ঝুলছে ওর। 'ওরে বাবা, এ যে কারার ওই লৌহকপাট!'

'একটা অ্যাসিটিলিন টর্চ জোগাড় করো, হিরন, কুইক!' বলল রানা।

'সঙ্গে নিয়েই এসেছি,' হাসল সে। ওর কাঁধ থেকে ব্যাগটা নিয়ে চিনাদের একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। টর্চের শোঁ-শোঁ শব্দে আর সব চাপা পড়ে গেল, নীলচে সাদা অত্যুজ্জ্বল শিখার প্রচণ্ড উত্তাপে মাখনের মত গলে যেতে শুরু করল গ্রিল। মাত্র দশ মিনিটে মুক্ত হলো ওরা।

'আমরা এখানে আছি জানলে কি করে?' প্রশ্ন করল রানা বাইরে এসে

'দুপুরের পরও আপনার কোন খবর নেই দেখে মেরিন মিনিস্ট্রিতে গেলাম খোঁজ নিতে।'

'মেরিন মিনিস্ট্রি?'

'হ্যাঁ। কাল রাতে যে বিল্ডিঙে নিয়ে গেলেন মিস্টার চুঙ।'

'তারপর?' বলল রানা।

'ওখানে এদের সাথে দেখা,' তিন চিনাকে দেখাল যুবক। 'এরা বলল কোথায় আপনারা। অপেক্ষা করলাম কয়েক ঘণ্টা। ওদিকে সন্ধে পর্যন্ত আপনারা যে কাজে এসেছিলেন, তা হলো না দেখে ওয়ার মিনিস্টারও হতাশ। তাঁর ইচ্ছে ছিল কিছু করার, কিন্তু সাহস পাননি নতুন ঝামেলা বেধে যেতে পারে ভেবে। এমনিতেই অনেক ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে যাচ্ছে তাঁর ওপর দিয়ে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আটটার দিকে ভাবলাম আর দেরি করা ঠিক হবে না, একটা ম্যাপ জোগাড় করে বেরিয়ে পড়লাম চারজনে মিলে। এসে দেখি যে পথে আপনারা ঢুকেছেন, সেটা সীল করে দিয়েছে সিমকার লোকজন। গার্ড বসে আছে ওখানে। বুঝলাম আপনাদের ভেতরে আটকে রাখা হয়েছে। তখনই পিছিয়ে গিয়ে অনেক দূরের আরেক ওপেনিং দিয়ে ভেতরে এলাম। বহু পথ হাঁটতে হয়েছে বলে দেরি হয়ে গেল।'

'তা হোক,' বলল ও। 'তবু শেষ পর্যন্ত জায়গামত পৌঁছতে পেরেছ, তাই বেশি। তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।'

দল বেঁধে সামনে এগোল ওরা। নিচু কণ্ঠে কথা বলে চলেছে মাসুদ রানা। মিলিয়ারডোন, পেরেসটভ ও ফু-চুঙ শুনে যাচ্ছে চুপ করে। মাঝেমধ্যে এক-আধটা প্রশ্ন আসছে, রানা জবাব দিচ্ছে তার। অবশেষে মাথা ঝাঁকাল তিন শ্রোতা।

'এ ছাড়া আর কোন পথ নেই আসলে,' বলল লিউ ফু চুঙ।

এগারো

'ইয়েস!' নকের শব্দে ভেতর থেকে জানতে চাইল ক্যামিলা ক্যাভোর।

'রুম সার্ভিস।'

'কাম ইন।'

সকাল সাড়ে দশটা। গোসল সেরে একটু আগে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে মেয়েটি। দেরি হয়ে গেছে বলে রুম সার্ভিসকে স্যুইটে ব্রেকফাস্ট পাঠাতে বলে সাজতে বসেছে। আজও যেতে হবে ভয়েস কোচের কাছে। তারপর আবার···। আয়নায় চওড়া গোঁফ ও লাল ফ্রেঞ্চ কাট্ দাড়িওয়ালা এক যুবককে দেখে হাত থেমে গেল তার। 'কে! বেডরুমে কেন···'

'তুমি বেডরুমে,' বলল আগন্তুক। 'তাই আমাকেও আসতে হলো।'

চোখ কুঁচকে উঠল নায়িকার, ঘুরে দাঁড়াল। যুবকের কণ্ঠ, দাঁড়াবার ভঙ্গি খুব চেনা লাগছে, কিন্তু··· বিদ্যুৎ চমকের মত তাকে চিনে ফেলল সে। 'গ্যারি!'

হাসল ফ্রেঞ্চ কাট। 'চিনেছ তাহলে?'

'কিন্তু তুমি··· তুমি এখানে কেন এসেছ?'

'তোমার সাথে জরুরী একটা কাজ আছে, সেটা সারতে।'

'আমার সাথে কি কাজ তোমার?' ঝাঁঝ ফুটল ক্যামিলার কণ্ঠে। চেহারায় খানিকটা আতঙ্কও ফুটল। ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, আত্মরক্ষার জন্যে কিছু খুঁজছে হয়তো। 'কি চাও তুমি আমার কাছে?'

'বলেছি তো,' কয়েক পা এগোল ও।

চট্ করে বেডসাইড টেবিলে রাখা টেলিফোনের ওপর দিয়ে ঘুরে এল মেয়েটির দৃষ্টি। 'চলে যাও, গ্যারি, প্লীজ!' আবার তাকাল ফোনের দিকে। 'নইলে···নইলে আমি পুলিসে খবর দেব···'

'সে-সব কিছুই করবে না তুমি,' থমথমে কণ্ঠে বলল ও। 'করবে আমি যা-যা বলব, ঠিক তাই। নইলে···' একটা পিস্তল দেখা দিল হাতে, ওটা দুলিয়ে যেন ওজন পরীক্ষা করল রানা। কথা শেষ করার প্রয়োজন বোধ করল না।

জিনিসটা দেখামাত্র সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড কাঁপুনি উঠে গেল ক্যামিলার, ফোঁপাতে শুরু করে দিল। 'প্লী-ই-জ, গ্যারি! আমি তো কোন ক্ষতি করিনি তোমার, কেন তাহলে···'

আবার বাধা দিল ও। 'আমিও তোমার কোন ক্ষতি করতে আসিনি। শান্ত হয়ে বোসো। কিছু কথা বলতে এসেছি আমি, মন দিয়ে শোনো।'

বিশেষ কাজ হলো না, আতঙ্কিত চোখে বারবার ওর হাতের দিকে তাকাচ্ছে সে, ঢোঁক গিলছে। 'এটাকে ভয় করছে তোমার?' পিস্তলটা দেখাল ও। 'ঠিক আছে, নাও, তোমার কাছে রাখো এটা। ধরো!' ক্যামিলার চার হাতের মধ্যে এসে ওটা এগিয়ে দিল।

যেন বিষধর সাপের ফণা দেখছে, এমন আতঙ্কিত চোখে নীলচে ধাতব, চকচকে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে থাকল নায়িকা। 'ধরো!' আবার সাধল রানা। 'জিনিসটা হাতে থাকলে ভয় কেটে যাবে,' তবু সে নড়ছে না দেখে নিজেই ওটা জোর করে গুঁজে দিল হাতে। 'এবার নিশ্চিন্ত? বোসো, যা বলি শোনো মন দিয়ে।'

কাঁপাকাঁপি থেমে এল মেয়েটির। ড্রেসারের সিটিতে বসল সে ধীরে ধীরে। মুহূর্তের জন্যেও নজর সরায়নি রানার ওপর থেকে। 'কি-কি কথা?'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত ঘটনা খুলে জানাল ওকে রানা। কথার ফাঁকে ক্যামিলার মুখের রঙ আর অভিব্যক্তি খুব ঘন ঘন বদল হতে দেখল। মনে হলো বেশিরভাগ কথাই বিশ্বাস করেনি মেয়েটি। যখন মুখ খুলল, রানার ধারণাই

সত্যি হলো।

'আমি বিশ্বাস করি না,' ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগল সে। 'এ সব সত্যি হতে পারে না। বানিয়ে বলছ তুমি। সিমকা এমন কাজ করতেই পারে না, অসম্ভব!'

'আমিও আশা করিনি যে তুমি বিশ্বাস করবে,' বলল রানা। 'আমাকে তোমার বিশ্বাস করার প্রয়োজনও নেই। তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাবে কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে।'

খেয়াল করল না ও। আপনমনে বলে চলেছে, 'সিমকা আমাকে ছেড়ে যেতে পারে না। ও আমাকে খুব ভালবাসে। আমার জন্যে ও আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে গিয়েছিল, আর তুমি বলছ কি না···'

'আমি যা বলছি সত্যি বলছি। আমার সাথে চলো, নিজের চোখেই প্রমাণ দেখতে পাবে।'

'ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দিয়ে কন্টি আমাকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছে। আজ কি না···'

ধৈর্য ধরে আরও পাঁচটা মিনিট ব্যয় করল রানা, তারপর ফল ফলল। দশ মিনিট পর একসাথে স্যুইট ত্যাগ করল ওরা। নিচে এসে নিজের জন্যে নির্দিষ্ট লিমুজিনে উঠে বসল ক্যামিলা, রানা বসল পাশে। ছুটে চলল গাড়ি। শহরের প্রান্তে একটা ফিয়াট লাক্সারি লিমুজিন গতিরোধ করল ওদের। শোফারের ইউনিফর্ম পরা লিউ ফু-চুঙ ড্রাইভারের মাথায় পিস্তল ধরে তাকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করল।

ঘটনা দেখে আঁতকে উঠেছিল ক্যামিলা, পরে রানা বুঝিয়ে বলতে শান্ত হলো কিছুটা। ফু-চুঙের সাথে আরেকজন আছে দেখে প্রশ্ন করল, 'এ কে?'

'ইসলামের মত আরেক কম্পিউটর বিশেষজ্ঞ,' ব্যাখ্যা করল ও। 'ওখানে একে প্রয়োজন হতে পারে।'

লোকটার নাম হেইম্যান। মাঝ বয়সী। নিজ লাইনে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং ওস্তাদ। ফু-চুঙের পাশে উঠল সে। ক্যামিলার শোফারের দায়িত্ব নিল হিরন ও ফু-চুঙের এক সঙ্গী। তিন মিনিট পুরো হওয়ার আগেই ফের যাত্রা করল প্রথম লিমুজিন। স্টুডিওর গেটে বিন্দুমাত্র সমস্যা হলো না। গাড়িতে ছবির নায়িকা আছে, গার্ডদের জন্যে তাই যথেষ্ট। ভেতরে ঢুকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের সামনে এসে থামল ওরা।

ক্যামিলাকে তো নয়ই, রানাকেও গেট খোলার কষ্ট করতে হলো না, দুই ডোরম্যান খুলে দিল। হেইম্যানও নামল ওদের সাথে। সত্যি সত্যি রানা ওকে কন্টি স্টুডিওতে নিয়ে এসেছে দেখে ক্যামিলার ভয় আগেই দূর হয়ে গিয়েছিল, এবার সে স্থান দখল করল অজানা এক আশঙ্কা। এটুকু অন্তত বোঝার ক্ষমতা তার আছে যে গ্যারির ওকে হোটেল থেকে বের করে নিয়ে আসার কারণ যখন সত্যি প্রমাণ হয়েছে, তখন অন্যটা মিথ্যে হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। খুবই কম।

নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ডোরম্যানকে জিজ্ঞেস করল সে কে কে আছে ভেতরে। জবাব যা এল, তা ক্যামিলা রানার মুখে শুনেছে। গম্ভীর মুখে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। রানা-হেইম্যানও ঢুকল। আশঙ্কা ছিল ওদের ঢুকতে বাধা দেয়া হবে। হলো না। এখানেও ক্যামিলার জন্যে বিনা প্রশ্নে উৎরে গেল ওরা।

ভেতরে ক্যামিলার পাশাপাশি হাঁটছে রানা, কথা বলছে নিচু কণ্ঠে। 'আমি আগে ঢুকব রুমে। তুমি পিছনে থেকো, ইসলামের রিঅ্যাকশনের দিকে লক্ষ রেখো।'

'হয়েছে, হয়েছে,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল সে। 'বারবার এক কথা বলতে হবে না। আমি কচি খুকি নই।'

আগে এত ভেতরে আসেনি মাসুদ রানা, তাই দু'দিকে দেখতে দেখতে হাঁটছে। হেইম্যান ওদের তিন-চার কদম পিছনে। দীর্ঘ এক করিডর অতিক্রম করে বাঁ দিকে ঘুরতেই টেকনিক্যাল উইং। এখানকার ১৯ নম্বর রুমের বন্ধ দরজায় নক করল ক্যামিলা। সঙ্গে সঙ্গে হাঁক এল ভেতর থেকে। 'কে ওখানে?'

'আমি, ক্যামিলা!'

সামান্য বিরতি। 'ক্যামিলা? এসো, এসো। দরজা খোলা আছে।'

ক্যামিলার ফেরত দেয়া পিস্তল আগেই বেরিয়ে এসেছিল রানার হাতে, অন্যহাতের দুই ক্ষিপ্র টানে নকল দাড়ি-গোঁফ উপড়ে ফেলল ও। এক ঝটকায় দরজা খুলে পুরো মেলে ধরল। ঝুঁকে কিছু করছিল হেদায়েত, হাসিমুখে এদিকে তাকাল। পরক্ষণে জমাট বেঁধে গেল হাসিটা, দুই চোখে নগ্ন আতঙ্ক ফুটল ধীরে ধীরে।

'মা-মাসুদ রানা!'

'হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছ,' বলেই লাফ দিল ও হেদায়েতের ডান হাত টেবিলের আরেক প্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে। বিদ্যুৎবেগে মাঝের দূরত্ব পেরিয়ে গেল রানা, বাঁ হাতে মাঝারি ওজনের এক ঘুসি বসিয়ে দিল লোকটার কানের নিচে। কয়েক হাত ছিটকে সরে গেল সে ডেস্কের কাছ থেকে, কিন্তু তার আগে একটা ভারী ভেনিশিয়ান গ্লাস পেপার ওয়েট তুলে নিয়ে গেল।

নিজেকে সামলে নিয়ে রানার মাথা সই করে গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারল সে জিনিসটা। চট্ করে ঝুঁকে আঘাতটা এড়াল রানা, মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে সাঁ করে উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল দেয়ালে। চুরমার হয়ে গেল। ওদিকে তখন ঘরে ঢুকে পড়েছে ক্যামিলা ও হেইম্যান। ঢুকতে না ঢুকতে সিলিং সমান উঁচু ঘর ভর্তি কম্পিউটর ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি দেখে চোখ কপালে উঠল লোকটার।

ঘাড়ে পিস্তল ধরে হেদায়েতকে তার চেয়ারের কাছে নিয়ে এল রানা, চাকার ওপর বসানো চেয়ারটা মৃদু এক লাথিতে ডেস্কের কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে তাতে বসাল ওকে। হাবার মত রানার দিকে তাকিয়ে থাকল

লোকটা। খানিক পর ক্যামিলার দিকে তাকাল। সবশেষে হেইম্যানের দিকে।

'তোমাকে আমার কিছু প্রশ্ন করার আছে, হেদায়েত,' কঠিন কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'ঝটপট উত্তর দেবে। নইলে এমন হেদায়েত করব যা সারাজীবন স্মৃতি হয়ে থাকবে তোমার শরীরে। কিন্তু তার আগে ক্যামিলাকে তোমাদের আসল প্ল্যান খুলে জানাও। ডি-ডে কি, কেন, সব বলো।'

'তার আগে তুমি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও, গ্যারি,' বলল মেয়েটি। 'তুমি আসলে কে? ও তোমাকে মাসুদ রানা নামে কেন ডাকল, আসল পরিচয় কি তোমার?'

'সে সব পরে। আগে এর কাহিনী শোনো। তোমার এখন নিজের ভবিষ্যৎ জানা জরুরী, আমারটা না জানলেও ক্ষতি নেই।'

'ঠিক বলেছ,' হেদায়েতের দিকে ফিরল সে। 'ডি-ডে সম্পর্কে যা শুনলাম, তা কি সত্যি?'

জবাব দিল না লোকটা। তাকালোই না। মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। ঘাড়ে পিস্তলের নল দিয়ে জোরে এক গুঁতো মারল রানা। 'কি বলা হচ্ছে?'

মুখ তুলল সে। ঘোলাটে চোখে ক্যামিলাকে দেখল। চেহারা দেখে মনে হলো পরিবেশ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, অন্য জগতে আছে। 'সত্যি নাকি, ইজল্যাম?' নরম কণ্ঠে আবার জানতে চাইল মেয়েটি।

'হ্যাঁ।'

চেহারার লাবণ্য সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেল ক্যামিলার, দেখতে দেখতে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। 'সত্যি?' এবার যেন নিজেকেই করল প্রশ্নটা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি!' হঠাৎ খেপে উঠল লোকটা।

'তার মানে আমাকে বোকা বানিয়েছ তোমরা সবাই! সিমকা পর্যন্ত?'

ওদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠল হেদায়েতুল ইসলাম। মাথা পিছনদিকে হেলিয়ে হাসছে সে, হাসির দমকে সারাদেহ নাচছে। 'প্রথম ফীড ইন প্রোগ্রাম পাঞ্চ করে দিয়েছি আমি···হা হা হা! পাঞ্চ করে দিয়েছি! কেউ ঠেকাতে পারবে না· ·হা হা হা!!!'

লোকটা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল কি না ভাবছিল রানা, তখনই আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল সে। হাসতে গিয়ে চোখে পানি এসে পড়েছিল, মুছে নিল হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে। 'কি যেন জানতে চাইছিলে তুমি, ক্যামিলা? বোকা? না, তোমাকে কেন বোকা বানাতে যাব আমরা? আমার সাথে তুমিও তো যাবে আজ···'

'নো মুভি?' পাত্তা না দিয়ে প্রশ্ন করল ক্যামিলা।

থমকে ওকে দেখল লোকটা। 'মুভি? না। সত্যি সত্যি যে সব ছবি এতদিন তৈরি করেছি আমরা, ডি-ডে সেরকম নয়। এটা হচ্ছে···' থেমে গেল সে হঠাৎ।

'সিমকা কোথায়?' গলা ভেঙে গেল মেয়েটির। চেহারা দেখে মনে হলো

বুঝি বুকটাও ভেঙে গেছে। 'আর সবাই কোথায়? স্যার হিউ, কন্টি?'

উত্তর দিতে দেরি করছে দেখে তার ঘাড়ে আরেক খোঁচা লাগাল রানা। 'জলদি বলো। কোথায় গেছে ওরা কাল রাতে?'

'কাল রাতে?' চোখ তুলল ক্যামিলা। 'কিন্তু কাল তো আমরা সবাই একসাথে···'

'ডিনার খেয়েছ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জানি। এবার বলো, হেদায়েত, ওরা সবাই কোথায় গেছে? তোমার আজ কোথায় যাওয়ার কথা?'

জবাব নেই।

'কথা বলো, নইলে গুলি করে ···'

ঝট্ করে মুখ তুলল লোকটা। ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি ফুটল। 'গুলি করবে? করো না, তারপর দেখো মজা! তখন কি বললাম কানে যায়নি? শোনোনি প্রোগ্রাম পাঞ্চ করে দিয়েছি আমি?'

ঘুরে ঘুরে মেশিনপত্র দেখছিল হেইম্যান, কথাটা কানে যেতে সোজা হলো। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোন চিন্তা নেই, আমি দেখছি চেক্ করে। ও যেমন বুনো ওল, আমি তেমনি বাঘা তেঁতুল,' শেষের বাক্যটা বলল নিজেকে শুনিয়ে। অনেকটা আপনমনে।

সেন্ট্রাল কম্পিউটরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। নাকের ওপর চশমা ঝুলিয়ে ঝুঁকে কি যেন দেখতে লাগল। অনেকক্ষণ পর সোজা হলো লোকটা, ওর দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিকই বলেছে ও, প্রোগ্রাম সেট করা আছে। এখন ঘরের মধ্যে বড় ধরনের কোন বিস্ফোরণ হলে সর্বনাশ ঘটে যাবে।'

'শব্দ হবে না,' তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল রানা। 'প্রয়োজন হলে সাইলেন্সার লাগিয়ে নেব।' আসলে হেইম্যানকে আশ্বস্ত করতে নয়, হেদায়েতকে উদ্বিগ্ন করে তুলতে চেয়েছে ও, হলোও তাই। মুখ শুকিয়ে গেল লোকটার।

ওদিকে সেন্ট্রাল প্যানেলের দুটো লাল বোতাম টিপল ইন্টারপোলের হ্যাকার। 'বিল্ট-ইন ব্যাপার-স্যাপার। এই যে, এখানে তিন ইঞ্চি পুরু এক স্টীলের দেয়াল তৈরি করিয়েছে এরা কম্পিউটর সেকশন সীল অফ রাখার জন্যে,' বিড় বিড় করছে লোকটা আপনমনে। দূর থেকে তাকে দেখতে লাগছে মফস্বলের বয়স্ক স্কুল শিক্ষকের মত। ঘন ঘন মাথা ডানে-বাঁয়ে, ওপরে নিচে করছে। প্যানেলের সবকিছু মুখস্থ করছে যেন। এদিকে তার কর্মকাণ্ড দেখে হেদায়েতের চেহারা ক্রমেই আঁধার হয়ে আসছে।

'এই যে,' আরেকটা সুইচ টিপল সে। 'এটা ছিল সীল অফ সেকশনের এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম চালু রাখার।' আরেকটু ঝুঁকল। 'আঠারো ঘণ্টা চালু রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল।'

ঘড়ি দেখল রানা—ঠিক একটা। 'তার মানে কাল ভোর সাতটায় অ্যাকটিভেট হওয়ার কথা ছিল।'

'ছিল,' পর পর আরও কয়েকটা বোতাম টিপে সোজা হলো সে। 'মামলা খালাস! সব প্রোগ্রাম ক্যানসেলড।'

এই সময় ভেতরে ঢুকল লিউ ফু-চুঙ। রানা আর হেদায়েতকে দেখল। 'কি হলো, রানা?' ভুরু নাচাল। 'কবুল করেনি?'

'এবার করবে।' চেয়ারের কাছ থেকে দু'পা পিছিয়ে গেল রানা। 'খারাপ কিছু ঘটার ভয় এখন আর নেই, হেদায়েত। তোমার নামে দুটো ওয়ারেন্ট আছে মহম্মদপুর থানায়। ধরে নিয়ে ওদের হাতে তুলে দেব আমি তোমাকে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি সুস্থ দেহে, হাত-পা আস্ত রেখে খাড়া অবস্থায় ফিরতে চাও? নাকি খোঁড়া হয়ে স্ট্রেচারে শুয়ে?'

চুপ করে থাকল লোকটা। দৃষ্টিতে ভয়।

পিস্তল তুলল রানা তার ডান হাঁটু সই করে। 'বলো! এখনও নিজেকে রক্ষা করার সুযোগ আছে।'

জিনিয়াস অটল। মুখ খোলার নাম নেই।

গুলি করল মাসুদ রানা, বদ্ধ ঘরে আওয়াজ উঠল বোমা বিস্ফোরণের মত। হাউমাউ করে উঠেছিল হেদায়েত, কিন্তু যখন বুঝল গায়ে বেঁধেনি বুলেট, চেয়ারের গদিতে ঢুকেছে, অমনি চুপ হয়ে গেল। বিশেষ করে ক্যামিলার সামনে বেইজ্জত হয়ে লজ্জা পেয়েছে। মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

'এবারের বুলেট সোজা ডান হাঁটুতে ঢুকবে,' বলে খানিক বিরতি দিল রানা। 'মুখ খুলতে চাও?'

নতমুখে কয়েকবার মাথা দোলাল হেদায়েতুল ইসলাম।

বারো

মেঘের বুক চিরে বিদ্যুৎবেগে ধেয়ে চলেছে ন্যাটোর এক ফোর সীটার MATS। ওটার পিছনের দুই আসন দখল করে বসে আছে মাসুদ রানা ও লিউ ফু-চুঙ। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের উত্তরের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ভারা লেনুভিকি চলেছে ওরা। ওখানেই নিজেদের অল প্রুফ প্রাসাদ গড়েছে সিমকা, হিউ, কন্টি ও ম্যালোরি।

হেদায়েতুল ইসলাম মুখ খোলার এক ঘণ্টার মধ্যে রোমের ন্যাটো অগজিলিয়ারি এয়ারপোর্ট থেকে আকাশে উড়েছে MATS। জেনারেল মাসেরাতি ততক্ষণে ফিরে পেয়েছেন তাঁর পদ ও মর্যাদা। তিনি স্বয়ং প্লেনে তুলে দিয়ে গেছেন ওদের দু'জনকে।

এই মুহূর্তে মুচকি মুচকি হাসছে রানা। কারণটা ওর হাতে ধরা ঢাকা থেকে আসা একটা ছোট্ট বার্তার বক্তব্য। ম্যাটসের স্ক্র্যাম্বলার ইন্টারকম টেলিটাইপ মেশিনের মাধ্যমে এইমাত্র এসেছে ওটা, পাঠিয়েছেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। ওটার বক্তব্য এই:

কংগ্রাচুলেশনস্ স্টপ ভেরি ভেরি গুড জব স্টপ এন্ড

—আর. কে

বুড়োর একটা ভেরিই অনেক ভারী, অর্জন করা বড় কঠিন কাজ। সেখানে দুটো ভেরি তো সাঙ্ঘাতিক এক ব্যাপার।

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল ও। পাশে তাকিয়ে ফু-চুঙকে চোখ বুজে থাকতে দেখে নিজেও তাই করল। গত কয়েক রাত ঘুম হয়নি, তারওপর ছিল সার্বক্ষণিক উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। সে-সবের অনেকটা দূর হয়েছে, আর সামান্যই বাকি। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলে মন্দ হয় না এখন। কিন্তু ঘুমের দেখা নেই।

রানা জানে আসবে না। ওই সামান্য কাজটা যতক্ষণে শেষ না হবে, ঘুম আসবে না ওর। এ মুহূর্তে ওদের থেকে বেশ এগিয়ে রয়েছে কন্টির এক্সিকিউটিভ জেট, তবে আর দু'ঘণ্টার মধ্যে পিছিয়ে পড়তে শুরু করবে। ওরা যাচ্ছে কনভেনশনাল রুট ধরে। কলকাতা যাবে প্রথমে চার উন্মাদ, সেখান থেকে নাদি—ফিজির মূল এয়ারস্ট্রিপ, তারপর ভারা লেনুভিকি। পথে কয়েক জায়গায় রিফুয়েলিঙের জন্যে থামতে হবে ওদের। এতে বেশ সময় নষ্ট হবে।

হিসেব কষে দেখা গেছে রবিবার খুব ভোরে জায়গামত পৌঁছবে ওরা, রানা পৌঁছবে তার ঘণ্টা তিনেক আগে—মাঝরাতের পর। ওখানকার ব্রিটিশ-আমেরিকান কম্যান্ড পোস্টকে ন্যাটো জানিয়ে দিয়েছে রানার যাত্রার কথা। তারা প্রস্তুত থাকবে ওখানে। থাকবে লোকাল অথরিটিও।

কয়েক ঘণ্টা আগের কথা ভাবল ও। হেইম্যান হেদায়েতের সমস্ত ফীড-ইন প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়েছিল। পরের কাজ হেদায়েত নিজেই করেছে। লেনুভিকির কথা ফাঁস করে দিয়ে কম্পিউটরে রিভার্সিং টেপ সেট করে উল্টো মেসেজ ফীড-ইন করেছে। নিজে থেকে কাজটা করেছে সে, কেউ বলেনি। তার রিভার্স করার নির্দেশ পেয়ে বিভিন্ন পথে রওনা হয়ে যাওয়া সমস্ত ইউনিট—মিজাইল, ফাইটার, বম্বার, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি সবকিছুর অগ্রযাত্রা থেমে গেছে। সর্বশেষ টেলিটাইপ মেসেজে জানা গেছে, বেশিরভাগ প্লেন এরমধ্যেই ফিরতি পথ ধরেছে। ন্যাটোসহ ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ফ্রান্স এবং ইটালি ওগুলোর ব্যবস্থা করার জন্যে সম্মিলিত পদক্ষেপ নিয়েছে।

ওয়্যারহাউসের এলিভেটর ফ্লোর উদ্ধারে ইটালিয়ান আর্মিকে সাহায্য করেছে হেদায়েত। শুধু গোলাবারুদ ছিল ওটায়। আর কিছু সময় দেরি হলে কনভেয়র বেল্টে চড়ে যাত্রা করত ওগুলোও। রিমোট কন্ট্রোল যানে চড়ে শিপমেন্ট হওয়ার কথা ছিল সে সবের।

ভারা লেনুভিকির সামান্য উত্তরে এলিসি দ্বীপে ব্রিটিশ-আমেরিকান কম্যান্ড পোস্ট এয়ারস্ট্রিপে ল্যান্ড করল MATS। ইউ এস মেরিন করপ্সের এক কর্নেল রিসিভ করল ওদের। একদল ব্রিটিশ ও নিজের মেরিনদের কম্যান্ডের দায়িত্বে রয়েছে সে এ মুহূর্তে—কর্নেল গিলক্রাইস্ট।

মিলিটারি কায়দায় রানা ও ফু-চুঙকে অভ্যর্থনা জানাল মেজর। সবাই মিলে কয়েকটা স্পীডবোট চেপে তখনই রওনা হয়ে গেল তিন মাইল দূরের

লেনুভিকি। স্থানীয় পুলিস ফোর্স তৈরি ছিল, তারাও দলে যোগ দিল। এত সৈন্য-সামন্তের প্রয়োজন ছিল না, তবু ব্যবস্থা করা হয়েছে পিয়েরো সিমকার প্রাইভেট বাহিনীর কথা ভেবে। ওরা যদি বাধা দেয়, এদের প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু বাধা দেয়া দূরের কথা, ওদের কারও টিকিরও দেখা পাওয়া গেল না।

রাত তিনটেয় সিমকার প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপ চারদিক থেকে ঘেরাও করে অবস্থান নিল তিন বাহিনী। তারপর অপেক্ষার পালা। মাসুদ রানা ও ফু-চুঙ আশ্রয় নিল এক ঝোপের আড়ালে। সময় গড়িয়ে যেতে থাকল একটু একটু করে। সাগরের মৃদু হাওয়ায় তন্দ্রামত্ত এসে গিয়েছিল রানার। ছুটে গেল লিউ ফু-চুঙের গুঁতোয়। 'এসে পড়েছে।'

মৃদু একটা গুঞ্জন শুনতে পেল রানা। পুবদিক থেকে আসছে। দিনের আলোর আবছা আভাস ফুটতে কেবল শুরু করেছে তখন। মাথার ওপর দুই চক্কর দিয়ে নেমে পড়ল কন্টির এক্সিকিউটিভ জেট। একটু পর ছোট্ট দৌড় শেষ করে থেমে পড়ল রানার বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে। দরজা খুলে গেল খুদে জেটের, এক এক করে বেরিয়ে এল চার মহারথী। উচ্চস্বরে গল্প করছে তারা, হাসছে। সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে স্যার হিউর হাসি।

এগিয়ে আসছে লোকগুলো, আকাশের গায়ে ছায়া ফুটল চারজনের। ওদের বিশ গজের মধ্যে আসার সুযোগ দিল রানা, তারপর ইশারা করল ফু-চুঙকে, আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল ওরা একযোগে।

হঠাৎ তাদের সমস্ত হাসি আনন্দ হাওয়া হয়ে গেল সামনেই মাসুদ রানা ও ফু-চুঙকে অস্ত্র হাতে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। ওদের পিছনে সেনা ও পুলিসের যৌথবাহিনী দেখে জমে গেল প্রত্যেকে।

'হ্যালো, সিমকা!' দাঁত বের করে হাসল রানা। 'বলেছিলাম না তোমাদের জন্যে ইলেক্ট্রিক চেয়ার অপেক্ষা করছে? দেখলে তো, মিথ্যের দাপট যতই থাক, সত্যেরই জয় হয় শেষ পর্যন্ত।'

'কি হলো, ভায়ারা?' হাসল লিউ ফু-চুঙ। 'অসুস্থ বোধ করছ? নাকি অভিমান করেছ, কথা বলবে না?' ভোরের আবছা আলোয় একে একে সন্ত্রস্ত মুখগুলোর ওপর চোখ বোলাল সে। 'ভারী আশ্চর্য তো! মাত্র একটা রাত আগে বক-বক করে আমাদের কানের পোকা বের করে ফেলার জোগাড় করেছিলে তোমরা, আর আজ স্বরই ফুটছে না! কি আশ্চর্য!'

কেউ নড়ল না। রা নেই মুখে। ভয়ঙ্কর মানসিক আঘাতে স্থবির হয়ে পড়েছে সবাই। না, ভুল দেখেছে ওরা। সবাই হলেও সিমকা হয়নি। সে পুরো সজ্ঞানেই আছে। শুধু তাই নয়, এই পরিস্থিতিতেও কুটিল মাথা খাটাচ্ছে! রানার দিকে এক পা এগোল লোকটা। প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'সেনিয়র! তুমি চাইলে আমরা আমাদের যাবতীয় সম্পদের অর্ধেক দিয়ে দেব তোমাকে। এখানে যতজন রয়েছ তোমরা, সে টাকায় আজীবন রাজার হালে…'

হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল রানা। লেনুভিকির স্থির ভোরের বাতাস চমকে উঠল ওর হাসি শুনে। সদ্য ঘুম ভাঙা পাখিরা বাসা ছেড়ে পালাল।

'না হয় সব দেব,' ফের বলে উঠল বামুন। 'সব দেব। টাকা, সোনা, যা আছে সব নিয়ে যাও তুমি। কিচ্ছু চাই না আমরা, সব নিয়ে যাও। শুধু···শুধু প্রাণটা ভিক্ষে দাও আমাদের।'

উত্তর দেবে কি, হাসতে হাসতে অস্থির রানা। 'নিজের প্রাণের খুব মায়া, না? আমি যদি ঠাণ্ডা মাথার খুনী হতাম, তোমাদের চারজনকে এখানেই খুন করে রেখে যেতাম। কিন্তু আমি যে তা নই, বুঝতেই পারছ। আমি তোমাদের বিচার দেখতে চাই, সিমকা, আগেই বলেছি। তোমাদের সবাইকে ইলেক্ট্রিক চেয়ারে বসা দেখতে চাই। আমি চাই সাদেকের আত্মা শান্তি পাক। রোজানার আত্মা শান্তি পাক।'

পিচ্চি দু'কাঁধ ঝুলে পড়ল লোকটার। মনে হলো এখনই বুঝি কেঁদে উঠবে। অন্য তিনজন আগের মতই অনড়। এখনও ফিরে পায়নি বোধহয় নিজেদের। আলো বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সবার চেহারার অভিব্যক্তি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। একদম পাথর হয়ে গেছে মানুষগুলো।

দেখে মনে হয় না কারও ভেতর প্রাণ আছে।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্ট। রোম। ডিপারচার লাউঞ্জে বসে আছে মাসুদ রানা ও লিউ ফু-চুঙ। আর অল্প সময়ের মধ্যে যার যার পথে চলে যাবে ওরা। রানা লন্ডন, ফু-চুঙ তার বর্তমান স্টেশন, হঙকঙ। বহু বছর পর দেখা হয়েছিল অল্প সময়ের জন্যে, আবার কবে মুখ দেখাদেখির সৌভাগ্য হবে, বা আদৌ হবে কি না, তার ঠিক কি? তাই মন খারাপ ওদের।

প্রশ্ন হাজারটা জমে আছে মনের মধ্যে। একটা করলে একসাথে আরও অনেকগুলো ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে আসতে চাইবে, জানে ওরা। তাই মুখ খুলছে না কেউ। সাহস হচ্ছে না।

ওর ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জারদের ডাকা হচ্ছে শুনে সোফা ছাড়ল মাসুদ রানা। ঝুঁকে ব্রীফকেসটা তুলে নিল। 'চলি, দোস্ত,' হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়াল।

হাতটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল ফু-চুঙ। 'ডাক যখন পড়েছে, যেতে তো হবেই,' বলল সে। 'যা। আবার কোনদিন দেখা হবে, হয়তো।'

হাসির ভঙ্গি করল রানা। 'হয়তো।'

হাত ছাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল ও, ডেকে থামাল ফু-চুঙ।

'কিছু বলবি?' বলল রানা।

'হ্যাঁ। সেদিন রবীন্দ্রনাথের যে পংক্তির সাথে সোহানাদিকে তুলনা করেছিলি, সে তা নয়। কথাটা মনে রাখিস্।'

হেসে উঠল ও। 'রাখব।'

'দেখা হলে তাকে আমার শুভেচ্ছা দিবি।'

'আচ্ছা। আর?'

ভুরু কুঁচকে উঠল সিএসএস এজেন্টের। 'মানে?'

'ওকে বিয়ে করার কথা আরেকবার মনে করিয়ে দিবি না?'

'না,' হেসে ফেলল সে। 'ওটা তোদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওর মধ্যে নাক গলাতে চাই না।'

'সে-ই ভাল। তোদের নাক তো বোঁচা, সবকিছুর মধ্যে···' ঘুসিটা আসতে দেখে চট্ করে নিচু হলো রানা। মাথার ওপর দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল লিউর মুঠো পাকানো হাত।

ছেলেমানুষের মত হেসে উঠল দুই বন্ধু। তারপর হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা, দৃঢ় পায়ে এগোল লাউঞ্জের ও মাথার করিডর লক্ষ্য করে।

পিছন থেকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লিউ ফু-চুঙ।

***

যুদ্ধবাজ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

এক

জাহাজ-বিধ্বংসী উপকূল হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছে তাকরির। লেবাননের এদিকে সাগরতীর অত্যন্ত দুর্গম, ঢেউ আকৃতির সারি সারি পাহাড়ের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা জেলে পাড়াগুলোকে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাকরিরের দুর্নাম সম্পর্কে মাসুদ রানার স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না, এখানে এসে পৌঁছানোর আগে ধরে নিয়েছিল কয়েক শো বছর আগে নির্দয় ষণ্ডামার্কা দুঃসাহসী কিছু লোক ভুল আলোক-সঙ্কেত দেখিয়ে জাহাজগুলোকে ডুবো পাহাড়ের দিকে টেনে আনত, জাহাজডুবির সময় নাবিকদের ছুরি মেরে লুঠ করে নিত সমস্ত কার্গো। বর্তমান যুগে সে-ধরনের লোক ওই একই পেশায় এখনও যে এখানে আছে, এ-সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই ছিল না। তবে ধারণা থাক বা না থাক, যেহেতু বিসিআই-এর নির্দেশ, এখানে ওকে আসতেই হত।

জায়গাটার নাম মুয়াক্কা, ওখানেই থাকছে রানা। পাহাড়ের ঢালু গায়ে কিছু কুঁড়েঘর আছে, পরিচ্ছন্ন নিকানো উঠান, চারপাশে ফুলের বাগান। ঢালের মাথায় চূড়া। সেই চূড়া থেকে উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে খুদে একটা সৈকতে নামা যায়। এদিকের ঢালে একটা মাত্র বাড়ি আছে, মালিক থাকে অনেক দূর—বৈরুত শহরে। বাড়িটা খালিই পড়ে ছিল, মালিকের সঙ্গে দেখা করে ভাড়া নিতে চাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায় সে। ঢালের আরেক দিকের কুঁড়েগুলোয় জেলেরা থাকে, তবে উল্টোদিকের ঢালটা তারা ব্যবহার করে না, কারণ এদিকের সৈকত খুবই ছোট, একসঙ্গে দু'তিনটের বেশি নৌকা ভেড়ানো যায় না।

মুয়াক্কা খাঁড়ির দক্ষিণে 'জলপরীদের আস্তানা' ও 'শয়তানের তাওয়া'-য় সৈকত খুব লম্বা, বছরে দু'পাঁচটা জাহাজডুবির ঘটনা ওদিকটাতেই ঘটে। চলতি শীতে মিশরীয় পণ্যবাহী জাহাজ ক্লিওপেট্রা ডুবেছে, জেলেরা মাছ ধরা ছেড়ে দিয়ে এখনও সেটা থেকে মাল-পত্র সরাতে ব্যস্ত, তবে সবাই নয়। এদিকে জাহাজডুবির কারণ রানা যেটা জানতে পারল, পানিতে ডুবো পাহাড় আর পাথরের স্তূপ আছে। খাঁড়ির বাইরে, খোলা সাগরেও পাহাড় আছে, তবে পানির ওপর দেখা যায়। সেগুলোকে এড়াবার জন্যে শর্টকাট পথ বেছে নিতে খাঁড়ির খানিকটা ভেতরে জাহাজ নিয়ে ঢুকে পড়ে নাবিকরা, আর তখনই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে এটাই একমাত্র কারণ বোধহয় নয়, রাতের বেলা ভুল

আলোক-সঙ্কেত দেখিয়ে জাহাজগুলোকে ফাঁদে ফেলার ঘটনাও ঘটতে পারে।

এ এমন একটা সময় যখন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের আটটা প্রাসাদে জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক টীমকে ঢুকতে না দেয়ার সমস্যা সমাধানের জন্যে বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে ইঙ্গ-মার্কিন সরকার ইরাক আক্রমণ করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ বলছেন, এই বিরোধের সামরিক সমাধান চাইলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারে। তবে এ-ব্যাপারে তাকরির উপকূলের জেলেদের মধ্যে তেমন কোন ভয় বা উত্তেজনা নেই বললেই চলে, বেশিরভাগই তারা ক্লিওপেট্রা লুঠে ব্যস্ত।

মুয়াক্কা ঢালের বাড়িতে যেদিন এল রানা সেদিনই পরিচয় হলো আল হাদীর সঙ্গে। সে-ও জেলে, আকার-আকৃতিতে দৈত্য বললেই হয়। শরীরটা যা-ই হোক, অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক সে, নিজের শক্তি সম্পর্কে তেমন একটা সচেতনও নয়। জাহাজ ডুবলে যারা লুঠপাট করে না তাদের মধ্যে সে-ও একজন। যুবা বয়েসে কিছুদিন নৌ-বাহিনীতে কাজ করেছে, সেজন্যে তার গর্বের সীমা নেই। সাগরে এখন মাছ খুব কমই পাওয়া যায়, তবু বাপ-দাদা জেলে ছিল বলে অন্য কোন পেশায় তার আগ্রহ কম। গ্রামে প্রায় সবার আর্থিক অবস্থাই স্বচ্ছল, শুধু যারা লুঠপাট করে না তাদের অবস্থা কাহিল। রানা যখন হাদীর মাছ ধরার নৌকাটা পনেরো দিনের জন্যে পাঁচশো মার্কিন ডলারে ভাড়া নিতে চাইল, হাদীর মনে হলো পরম করুণাময় তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। প্রস্তাবটা পেয়ে সবেগে মাথা নাড়ল সে, দুই হাতের তিনটে আঙুল তুলে ইঙ্গিতে রানাকে বোঝাতে চাইল, তিনশো ডলারের বেশি নেবে না সে, নিলে তার পাপ হবে। প্রথম দিনেই পরস্পরকে ভাল লেগে গেল ওদের। রানা যখন বলল সে কায়রোর একটা ইংরেজি দৈনিকের রিপোর্টার, ইরাকের ওপর মার্কিন হামলা শুরু হবার আশঙ্কা দেখা দেয়ায় এলাকায় তার কি প্রভাব পড়ে, সাগরে যুদ্ধ প্রস্তুতি কতটা ব্যাপক ইত্যাদি বিষয়ে খবর সংগ্রহ করতে এসেছে, শুনে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল হাদী। সেই থেকে নিষেধ করা সত্ত্বেও রানাকে স্যার বলছে সে, সুযোগ পেলেই জানিয়ে দিচ্ছে হাদীসে নাকি লেখা আছে জ্ঞানী ও শিক্ষিত লোককে সম্মান করা পুণ্যের কাজ।

পাঁচটা দিন মাছ ধরে, রেডিওতে খবর শুনে আর পত্রিকা পড়ে সময় কাটাল রানা। ওর বাড়িতে ডিশের লাইন নেই, তবে জেলেপাড়ায় আছে। হাদীর বাড়িতে বা রেস্তোরাঁয় বসে গভীর রাত পর্যন্ত বিবিসি আর সিএনএন-এর খবর শোনে। যতই দিন যাচ্ছে ততই একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে উঠছে, মুখে কূটনৈতিক সমাধানের কথা বললেও আমেরিকা ও ব্রিটেন ইরাকের ওপর হামলা চালাবার সব প্রস্তুতিই নিয়ে রাখছে।

রানার মনে হলো, শান্তিপ্রিয় ও নিরপেক্ষ কোন মানুষই ইরাকের ওপর মাত্রা ছাড়ানো এই অন্যায় ইঙ্গ-মার্কিন চাপ মেনে নিতে পারে না। একানব্বুই সালে কুয়েত আক্রমণ করে সত্যি গুরুতর অন্যায় করেছিল সাদ্দাম হোসেন,

কিন্তু গত সাত বছরে ইরাকের সাধারণ মানুষকে সেজন্যে কম ভোগান্তি পোহাতে হয়নি। বিদেশে তেল বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূরা পর্যন্ত বাসন-কোসন থেকে শুরু করে পুরানো জুতো আর ছেঁড়া কম্বল নিয়ে রাস্তায় বসে পড়েছেন, আশা এগুলো বিক্রি করে যদি এক-আধ বেলার রুটি কেনা যায়। সবচেয়ে বেশি ভুগছে শিশুরা, পুষ্টির অভাবে হাড্ডিসার কঙ্কালে পরিণত হয়েছে, ওষুধ আর পথ্যের অভাব আরও উঁচু করছে লাশের স্তূপ। আমেরিকা আপত্তি করলেও, বিশ্ব জনমতের চাপে জাতিসংঘ শুধু খাদ্য আমদানীর জন্যে সীমিত পরিমাণে তেল বিক্রি করার অনুমতি দিলে ইরাকীরা অস্তিত্ব রক্ষার একটা সুযোগ পায়। অন্যান্য শাস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞা ও শর্ত অবশ্য ইরাক সরকারকে মেনে নিতে হচ্ছেই, না মেনে উপায় নেই। 'নো ফ্লাই জোন'-এর পরিধি এত বিশাল যে ইরাকের বিমানবাহিনী আকাশে প্রায় উঠতেই পারছে না। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা অস্ত্র পরিদর্শক টীম গঠন করেছে, সেই টীম গোটা দেশের সমস্ত ছোট বড় কারখানা পরিদর্শন করে দেখছে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয় এমন কোন মারণাস্ত্র ইরাক তৈরি করছে কিনা। সামরিক ঘাঁটিগুলোয় যাচ্ছে তারা, মিসাইল পেলে ধ্বংস করে দিচ্ছে। মিসাইল, বায়োলজিকাল ও কেমিকেল উইপন-এর সন্ধানে গোটা ইরাক চষে ফেলা হচ্ছে। গুরুতর একটা অন্যায় করে বোকা বনে গেছে ইরাক, প্রতিবাদ করলেও গলায় জোর আনতে পারছে না। পাল্টা যুক্তি দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু কেউ তাদের কথা শুনছে না—ইসরায়েলও তো প্যালেস্টাইন দখল করে রেখেছে, তাদের কাছেও তো পারমাণবিক মারণাস্ত্র, দূর পাল্লার মিসাইল, বায়োলজিকাল ও কেমিকেল উইপন আছে; কিন্তু কই, নিরাপত্তা পরিষদ তো তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে না! বিশাল সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ায় মস্কো এখন আর সুপারপাওয়ার নয়, গোটা দুনিয়ার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে একা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরাকের জন্যে এটাও একটা দুঃসংবাদ। আমেরিকানদের অনেক নীতি ও সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায় না, তবু ওরা অসন্তুষ্ট হবে ভেবে অনেক রাষ্ট্র চুপ করে থাকে। এই চুপ করে থাকার ফল লক্ষ করা যায় নিরাপত্তা পরিষদ অস্ত্র পরিদর্শক টীম গঠন করার সময়—টীমে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সদস্য সংখ্যা খুব বেশি। মি. বাটলার, টীম প্রধানও একজন আমেরিকান।

বর্তমান সঙ্কট শুরু হয় জাতিসংঘের এই অস্ত্র পরিদর্শক টীম প্রেসিডেন্ট প্রাসাদগুলো পরীক্ষা করতে চাওয়ায়। পরীক্ষা মানে শুধু ঘুরেফিরে দেখা হলে আলাদা কথা ছিল। টীমের সঙ্গে মেশিন ও যন্ত্রপাতি আছে, সন্দেহ হলে তারা প্রাসাদের যে-কোন অংশ খনন করতে পারবে, যত ইচ্ছা তত গভীর পর্যন্ত, লুকিয়ে রাখা কেমিকেল ও বায়োলজিকাল উইপনের খোঁজে। ইরাকী হিসেবে সব মিলিয়ে আটটা প্রাসাদ। আমেরিকানরা বলছে উনিশটা। প্রাসাদগুলো ইরাকের মর্যাদা আর সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং এর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত, কাজেই ইরাক কোন প্রাসাদেই

পরিদর্শক টীমকে ঢুকতে দিতে রাজি নয়। তাদের আসল ভয়, প্রাসাদগুলোয় ঢুকে পরিদর্শক টীম ভাঙচুর তো যা করার করবেই, মি. বাটলার প্রাসাদগুলোর ভেতর কোথায় কি আছে তার মানচিত্রও তৈরি করবেন, ফলে ইরাক আক্রান্ত হলে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন সহ সামরিক বেসামরিক নেতৃবৃন্দকে বাঁচানো যাবে না, কারণ যুদ্ধের সময় ওই প্রাসাদগুলোর ভেতর থেকেই তাঁরা যুদ্ধ পরিচালনা করবেন।

আমেরিকা বলল, কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে অবশ্যই তারা ইরাকের ওপর হামলা চালাবে। পরিবেশ যখন আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠল, ইরাক তখন কিছুটা ছাড় দিয়ে বলল যে ঠিক আছে, পরিদর্শক টীমে আমেরিকান ও ব্রিটিশ সদস্য সংখ্যা কমাও, মি. বাটলারকে টীম থেকে বাদ দাও, তাহলে প্রাসাদগুলোয় ঢুকতে দিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে এর একটা সময়সীমা বেঁধে দিল তারা—দু'মাস। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের নিরাপত্তার কথা ভেবে আরও একটা কথা বলল, প্রাসাদগুলোর বাছাই করা কিছু অংশে পরিদর্শক টীমকে যেতে দেয়া হবে না।

সবাই যখন কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চাইছে, আমেরিকা আর ব্রিটেন তখন অজ্ঞাত কোন আক্রোশবশত ইরাকের ওপর সামরিক হামলা চালাবার সমস্ত প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করে ফেলছে। ভূমধ্য আর লোহিত সাগরে নৌবহর পাঠিয়েছে তারা, তার মধ্যে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারও আছে, সেই সব ক্যারিয়ার থেকে আকাশে মহড়া দিচ্ছে বম্বার আর ফাইটার প্লেন। ব্রিটেনও যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে, পাঠিয়েছে রয়্যাল এয়ারফোর্সের অত্যাধুনিক বম্বার ও ফাইটার। একানব্বুই সালের মত সৌদি আরব তাদের বিমানঘাটিগুলো ব্যবহার করতে দিতে রাজি না হলেও, কুয়েত রাজি হয়েছে, সেখানেও পৌঁছে গেছে আমেরিকানদের বিপুল যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সেনাবাহিনী। গত গালফ ওঅর-এর বিল মেটাতে গিয়ে সৌদি আরব আর কুয়েতের কোষাগার প্রায় খালি হয়ে গেছে; আবার যুদ্ধ বাধলে তার খরচ কে মেটাবে সেটা এখনও অমীমাংসিত প্রশ্ন।

আমেরিকার যুদ্ধংদেহি মনোভাব দেখে রাশিয়া বলেছে, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ক্লিনটনসুলভ আচরণ করছেন না, তাঁর এই আচরণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটাতে পারে। কোন সাড়া না পেয়ে মস্কো থেকে আবার বলা হলো, বিশ্ব জনমত উপেক্ষা করে আমেরিকা যদি ইরাকে হামলা চালায়, আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে সেটা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন হোয়াইট হাউস থেকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, রাশিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও আমেরিকা ইরাকের ওপর আক্রমণ চালাবে, যদি ইরাক সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে প্রাসাদগুলোয় অস্ত্র পরিদর্শক টীমকে ঢুকতে না দেয়। ব্যাপারটা এখন প্রায় দিবালোকের মতই পরিষ্কার, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের অস্ত্র বিক্রির জন্যে এই যুদ্ধটা বাধাতে চাইছে।

নিরাপত্তা পরিষদের দুই স্থায়ী সদস্য আমেরিকা ও ব্রিটেন ইরাকের জন্যে মর্যাদা হানিকর ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী শর্ত দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে চাইছে, তা না হলে তারা ইরাককে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে বলে হুমকি দিচ্ছে। বাকি তিন সদস্য আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে আগ্রহী—তারা হলো রাশিয়া, ফ্রান্স আর চীন। নিরাপত্তা পরিষদের প্রায় সব শর্তই ইরাক মেনে নিয়েছে, কাজেই বিশ্ব জনমতও কূটনৈতিক সমাধানে আগ্রহী। সেজন্যেই বার কয়েক সফর বাতিল করার পরও জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান নতুন করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বাগদাদে যাবেন তিনি, আপস রফার একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখবেন। কিন্তু তিনি শুধু যদি একটা বার্তা নিয়ে বাগদাদে যান তাহলে সমাধানের আশা করা বোকামি হবে। আর যদি সহযোগিতা ও আলোচনার অধিকার ও ক্ষমতা নিয়ে যান এবং সেটা প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হতেও পারে।

এরকম পরিস্থিতিতে দরিদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর তেমন কিছু করার থাকে না, মুখ বুজে সব কিছু নীরবে সহ্য করা ছাড়া। এই দলে বাংলাদেশও পড়ে। তবে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর কথা আলাদা।

মহৎ উদ্দেশ্য, আন্তরিকতা আর নিষ্ঠা থাকলে যে-কোন উদ্যোগ অনন্ত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে পারে; বিস্ময়কর হলেও বিসিআই-এর ক্ষেত্রে ঠিক তা-ই ঘটেছে। বিসিআই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেশের স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার জন্যে, জাতির বিরুদ্ধে কোথাও কোন ষড়যন্ত্র হলে তা ব্যর্থ করে দেয়াই ছিল প্রধানতম দায়িত্ব। বিসিআই প্রধান মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা আর মানবকল্যাণের প্রতি আত্মনিবেদন প্রতিষ্ঠানটাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এমন এক সুনামের আসনে এনে বসিয়ে দিয়েছে যে শুধু এসপিওনাজ জগতেই নয়, দুনিয়ার যে-কোন বড় ধরনের কর্মকাণ্ড বা সঙ্কটে বিসিআই এজেন্টদেরকে ভূমিকা রাখার জন্যে ডাকা হয়। বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানাকে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগদান করা হয়েছে। জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন-এর কমান্ডারের পদটাও দেয়া হয়েছে ওকে। স্নায়ুযুদ্ধের সময় আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ মীমাংসায় অনেক দায়িত্বও পালন করতে হয়েছে বিসিআইকে। মাসুদ রানা আমেরিকার ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির (নুমা)-ও প্রজেক্ট ডিরেক্টর। আলোচনা চলছে, নুমার এসপিওনাজ বিভাগটা রানা এজেন্সির হাতে তুলে দেয়া যায় কিনা। এছাড়াও, বিশ্বব্যাপী অসংখ্য সংগঠন আর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত বিসিআই ও তার কাভার প্রতিষ্ঠান রানা এজেন্সি।

যদিও ইরাক ও জাতিসংঘের মধ্যে চলতি সঙ্কটে বিসিআই কি করবে বা করতে পারবে সেটা এখনও পরিষ্কার নয়, তবে এরচেয়েও বড় সঙ্কটে ভূমিকা রেখে সফল হতে দেখা গেছে রাহাত খানকে। সেজন্যেই কেউ কোন সাহায্য না চাইলেও ঢাকা হেডকোয়ার্টারের ওপর একটা দায়িত্ব বর্তায়। ব্যাপারটা

এখনও রানার কাছে স্পষ্ট নয়, তবে ওর ধারণা মানবতা ও বিশ্বশান্তির পক্ষে কল্যাণকর কোন ভূমিকা রাখার জন্যেই লেবাননের এই দুর্গম উপকূল তাকরিরে পাঠানো হয়েছে ওকে। পাঠানো হয়েছে কোন রকম ব্রিফিং না করেই, মিশরীয় একটা ইংরেজি দৈনিকের রিপোর্টার হিসেবে কাভার গছিয়ে দিয়ে। ওর ওপর নির্দেশ আছে, লেবাননে করার মত কোন কাজ না পেলে আরব আমিরাতে চলে যেতে হবে, তারপর আরব জাহানেরই অন্য কোথাও।

প্রতিদিন গাড়ি চালিয়ে মুয়াক্কা রেস্তোরাঁয় আসতে হয় রানাকে পত্রিকা পড়ার জন্যে। এলাকায় মুসলমান, খ্রিস্টান আর ইহুদি, সব ধর্মের লোকই আছে, অন্তত আপাতত তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও অটুট। রেস্তোরাঁটায় আরবী, ইংরেজি ও হিব্রু ভাষায় প্রকাশিত প্রায় সব পত্রিকাই পাওয়া যায়। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে গাড়ি চালিয়ে ওখানে যাবার সময় উপত্যকার ঢালে কিছু লোককে ফসল কাটতে দেখল রানা। ছোট শহরটায় ঢুকে রাস্তা-ঘাট একদম ফাঁকা দেখে একটু অবাক হলো ও। রেস্তোরাঁর সামনে পাঁচ-সাতটা গাড়ি সব সময় দাঁড়িয়ে থাকে, আজ একটাও নেই। গতকালের কথা মনে পড়ে গেল রানার। ওর বাড়ির নিচে খুদে সৈকতে যখন হাঁটাহাঁটি করছিল, খোলা সাগরে কয়েকটা যুদ্ধ জাহাজকে আসা-যাওয়া করতে দেখেছে। ইরাক আক্রান্ত হলে যুদ্ধটা কোনদিকে গড়ায় কেউ তা বলতে পারে না, কাজেই এলাকার সব রাষ্ট্রই সাধ্যমত প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে। অনেক দূর থেকে দেখায় সবগুলো জাহাজকে চিনতে পারেনি ও, তবে ওগুলোর মধ্যে যে মিশরীয় আর লেবাননী জাহাজ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। চেনা গেছে শুধু কাছাকাছি থেকে দেখা যুক্তরাষ্ট্রের পতাকাবাহী এক জোড়া ডেস্ট্রয়ার আর জাতিসংঘের পীস মিশনের একটা পর্যবেক্ষক জাহাজকে।

রেস্তোরাঁতেও ভিড় জমেনি। দু'কাপ কফি খেয়ে কাগজ পড়া শেষ করল রানা। নিঃসঙ্গ আর একঘেয়ে লাগায় কাছাকাছি লম্বা সৈকত থেকে একবার ঘুরে এল। হাঁটার সময় ইচ্ছে হলো গোসলটা সেরে নেয়। গোসল সারার পর রেস্তোরাঁয় ফেরার আগে একজন মাত্র লোকের সঙ্গে ওর দেখা হলো। ছোটখাট মানুষটা, মাথায় পানামা হ্যাট। কাছাকাছি হতে মাথা নাড়ল আরবীতে বলল, 'অবস্থা ভাল নয়, ভাই। দেখছেন না সৈকত কেমন খালি হয়ে গেছে। যুদ্ধ একটা লাগবেই।'

সায় দিয়ে রানাও বলল, 'হ্যাঁ, রেস্তোরাঁর মালিক বলল, রেডিওতে ঘোষণা করা হয়েছে তরুণদের সেনাবাহিনীতে নাম লেখাতে হবে।'

রেস্তোরাঁয় ফিরে মালিকের বাথরুমে শাওয়ার সারল রানা, লাঞ্চ সেরে রেডিও শুনল কিছুক্ষণ, তারপর গাড়ি না নিয়েই রওনা হলো জেলেদের সবচেয়ে বড় গ্রামটার দিকে, আল হাদীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

বিশ মিনিট হেঁটে 'শয়তানের তাওয়া'-য় পৌঁছুল রানা। বিশাল বৃত্তাকার ইনলেটটাকে ঘুরে আসতে হলো ওকে, ঘাসে ঢাকা পাথরের পাঁচিল ঘিরে

রেখেছে ওটাকে। এদিকের খেতেও ফসল কাটা চলছে। এটা 'জলপরীদের আস্তানা'-র মধ্যে পড়েছে। খাঁড়ির মুখে কৃষকদের বসবাস। জেলেদের গ্রামটা আরও একটু দূরে।

সৈকতে পৌঁছে নৌকার বহর দেখতে পেল রানা, মাথার ওপর গাঙচিলেরা চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। জেলে পাড়ার কুঁড়েগুলো সবই খড় আর খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি। বাতাসে মাছের গন্ধ পেল ও। কিন্তু নৌকা বহরের আশপাশে বা গ্রামের ভেতর প্রাণচাঞ্চল্য চোখেই পড়ে না।

রাস্তা মানে সরু একটা ঢাল, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গ্রামে ঢুকে কয়েকটা প্রাইভেট কার দেখতে পেল রানা। একটা গাড়ির পাশে লাইফবোট রয়েছে, বনেটে কয়েকটা ম্যাকারেল মাছ বাঁধা। পাশেই একটা বেঞ্চ, তাতে জেলেরা বসে সিগারেট ফুঁকছে। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে ইব্রাহিমের রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল ও।

জেলেরা অনেকেই ভিড় করেছে এখানে। ব্যবসা মন্দা, এটাই সবার আলোচনার বিষয়। সৌখিন মৎস শিকারী ট্যুরিস্টরা এখন আর আসছে না, অথচ দুই হপ্তা আগেও জেলে পাড়ায় প্রাইভেট কারের লম্বা লাইন দেখা গেছে। খালি একটা টেবিলে গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে হাদী, রানাকে দেখে ম্লান হাসল। পাঁচ দিন হলো তার বোট ভাড়া নিয়েছে রানা, অথচ মাত্র একদিন মাছ ধরতে গেছে ওরা।

কাউন্টারে কফির অর্ডার দিয়ে হাদীর সামনের খালি চেয়ারটায় বসল রানা। 'মাছ ধরতে যা-ই বা না যা-ই, তোমার পাওনা তুমি ঠিকই পেয়ে যাবে,' প্রথমেই তাকে আশ্বস্ত করল ও। তারপর জানতে চাইল, 'আর সব খবর কি?'

হাদী কিছু বলার আগেই ঝড়ের বেগে এক তরুণ ঢুকল রেস্তোরাঁয়। তার দুই সমবয়েসী বন্ধু একটা টেবিলে বসে আছে, সেখানে থেমে হাতের টেলিগ্রামটার ভাঁজ খুলল সে। 'কালকের প্রোগ্রাম থেকে আমাকে বাদ দে তোরা,' বলল। 'জাহাজে চড়ার জন্যে কাল আমাকে বৈরুতে যেতে হচ্ছে।'

আলোচনার মোড় ঘুরে গেল, সবাই এখন আসন্ন যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছে। একজন বলল, কাল সারাদিন সাগরে যুদ্ধ জাহাজের আনাগোনা লক্ষ করেছে সে।

'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি,' গম্ভীর সুরে সায় দিল কোস্টগার্ড শমসের লিবান।

রানাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ মুখ খুলল হাদী, 'স্যার, মাছ ধরতে বেরুবেন না, অথচ আপনার কাছ থেকে আমি টাকা নেব, এ হতে পারে না। হপ্তায় অন্তত চারদিন যদি না বেরোন, চুক্তিটা বাতিল হয়ে যাবে।'

হেসে ফেলে রানা বলল, 'তুমি দেখছি সমস্যাতেই ফেললে। ঠিক আছে, চলো, এখুনি বেরিয়ে পড়ি।'

এক গাল হেসে দাঁড়িয়ে পড়ল হাদী। 'চলুন।'

সৈকতে এসে বোটে চড়ল ওরা। আধ ঘণ্টা পর খোলা সাগরে বেরুবার মুখে পৌঁছুতেই একঘেয়েমি আর যুদ্ধের আশঙ্কা মন থেকে মুছে গেল; বোট থেকে নেমে যাওয়া দুটো লাইন আর এঞ্জিনের আওয়াজ ওর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। হাল ধরেছে হাদী, বসেছে ওর দিকে মুখ করে। একটু পর গুন-গুন করে গানও ধরল। মাঝে মধ্যে লাইন টানছে রানা, রূপালি মাছের আকার পছন্দ না হলে ছেড়ে দিচ্ছে পানিতে। ডায়নোসর হেড পর্যন্ত এল ওরা। শেষ বিকেলের দিকে আকাশে মেঘ করল। বোট ঘুরিয়ে নিল ওরা, তাসত্ত্বেও ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে।

রেস্তোরাঁর মালিক ইব্রাহিমের সঙ্গে আলাপ করে হাদী সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছে রানা, এই মুহূর্তে কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। জেলে পাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে সাবরিনাকে বিয়ে করেছিল হাদী। লেবাননে খ্রিস্টান বা ইহুদি মেয়েকে বিয়ে করা মুসলমানদের জন্যে কোন সমস্যা নয়। সাবরিনা খ্রিস্টান ছিল, কলমা পড়িয়ে তাকে মুসলমান করিয়ে নেয় হাদী। বিয়ের আগে সাবরিনা কথা দিয়েছিল, আর সে মদ খাবে না। কিছুদিন খায়ওনি। তারপর লুকিয়ে খেতে শুরু করে। হাদী একটু রগচটা টাইপের লোক, স্ত্রীর অপরাধ হালকা ভাবে নিতে পারেনি। ধমক তো দেয়ই, স্ত্রীর ওপর নজর রাখার জন্যে বুড়ি এক বিধবাকে বাড়িতে রাখে চাকরানী হিসেবে। কিন্তু সাবরিনার মদ খাওয়া তাতেও থামেনি। বুড়িকে যেভাবেই হোক হাত করে ফেলে সে, হাদীকে লুকিয়ে আবার খেতে শুরু করে। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল মদ বিক্রেতা ডেভিড ডাকরান যখন হাদীর কাছে অভিযোগ করল যে সে তার স্ত্রীর কাছে বেশ কিছু টাকা পায়, দিই-দিচ্ছি করেও দিচ্ছে না।

বাড়িতে ফিরে প্রথমে চাকরানীকে বিদায় করল হাদী, তারপর মারধর করল স্ত্রীকে।

পরদিন এক মিশরীয় ট্যুরিস্টের সঙ্গে পালিয়ে গেল সাবরিনা।

সে আজ দশ-বারো বছর আগের কথা। তারপর থেকে একাই আছে হাদী, ভুলেও কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকায় না।

সন্ধে হতেই বাতাসের গতি বেড়ে গেল। হাদী বলল, 'বৃষ্টি হবেই।' বোটটাকে সে পাহাড়-প্রাচীরের দিকে সরিয়ে নিচ্ছে। 'স্যার, পলাক মাছ ধরার এটাই সুযোগ।'

স্টারবোর্ড বো থেকে খানিক দূরে সাগর ফুলে-ফেঁপে উঠছে, জলমগ্ন পাথরে বাধা পাচ্ছে ঢেউগুলো। 'তুমি তো এদিকের কোস্ট খুব ভালই চেনো, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বাধ্য হয়ে চিনতে হয়েছে, তা না হলে জেলে হতে পারতাম না। এ বড় হারামী কোস্ট, স্যার, চারদিকে ডোবা পাথর ছড়িয়ে আছে। মুশকিল হলো, এদিকের পাথরগুলো সুরত কোভের পাথরের মত গোল নয়, এবড়োখেবড়ো। চার বছর আগে এখানে একটা ইসরায়েলি জাহাজ ডুবেছিল। পাথরে বাড়ি খেয়ে এমন ভাঙনই শুরু হয়, তিন দিনের মধ্যে স্টার্নের একটা আয়রন পোস্ট

ছাড়া পানির ওপর আর কিছু ছিল না।'

পাহাড়-প্রাচীরের কাছাকাছি মিনিট দশেক কাটাল ওরা, একটা শিশু সোর্ডফিশ আর একটা আড়াই হাত লম্বা ঈল ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। অবশেষে আবার খোলা সাগরের দিকে বোট ঘোরাল হাদী। সাগর ইতিমধ্যে উত্তাল হয়ে উঠেছে। বোট যেভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে, রানার ভয় হতে লাগল ছিটকে না পানিতে পড়ে যায়। কিন্তু হাদীর চোখে-মুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। সে তার সামান্য ফাঁক করা প্যাহেলওয়ানি পা দুটো পাটাতনের ওপর এমন ভঙ্গিতে চেপে রেখেছে, যেন তাতেই বোট সিধে থাকবে।

কায়দা খাঁড়ির সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চলে এল বোট, খাঁড়ির মুখ থেকে এখনও আধ মাইল বাইরে রয়েছে ওরা। এই সময় অকস্মাৎ টান পড়ল একটা লাইনে। কিন্তু তারপরই শিথিল হয়ে গেল ওটা। টেনে লাইনটা তুলে ফেলল রানা। ম্যাকারেলই, তবে মাঝারি আকৃতির। এগুলোর স্বভাবই এরকম, টোপ খাবার পর নেতিয়ে পড়ে। হুক থেকে মাছটাকে ছাড়াবার দায়িত্ব হাদীকে দিয়ে দ্বিতীয় লাইনটার দিকে মনোযোগ দিল রানা। এটাতেও টান পড়ল, সম্ভবত আরও একটা ম্যাকারেল। লাইন টানছে ও। আচমকা ঢেউয়ের মাথায় পানিতে প্রবল আলোড়ন উঠল, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল রানা। বোটের পাশ ঘেঁষে নিরেট কি যেন একটা ছুটে গেল। অসম্ভব উথলে উঠছে পানি, কিন্তু জিনিসটা কি দেখার সময় পাওয়া গেল না, হ্যাঁচকা টান পড়ল লাইনে, সেই টানে বোট থেকে পানিতে ছিটকে পড়ল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে বুদ্বুদের মত পানির ওপর উঠে আসার বদলে মনে হলো সাগর ওকে নিচের দিকে টেনে নিচ্ছে। আকস্মিক আতঙ্ক গ্রাস করল রানাকে। ঝাঁক ঝাঁক বুদ্বুদ হয়ে সমস্ত নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল, হঠাৎ করেই খালি হয়ে গেল ফুসফুস। ডুবে যাবার এরকম অনুভূতি জীবনে আগে কখনও হয়নি ওর। বুকে তীব্র ব্যথা নিয়ে ওপরে ওঠার জন্যে পানির সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করল। যখন মনে হলো ফুসফুস দুটোকে স্বাভাবিক কাজে কখনোই আর ফিরিয়ে আনা যাবে না, এই সময় পানির ওপর উঠে এল মাথা, হাঁ করে বাতাস খেতে শুরু করল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাদী ওকে তুলে নিল বোটে। এতক্ষণ ওটা চক্কর দিচ্ছিল ওকে ঘিরে। বোটের তলায় শুয়ে হাঁপাচ্ছে রানা, মাথার পাশে তড়পাচ্ছে একটা মাছ। পাশ ফিরে মাছটার মুখোমুখি হলো, এটাকেই ও হুক থেকে খোলার দায়িত্ব দিয়েছিল হাদীকে। মাছটার কষ্ট উপলব্ধি করতে পেরে দু'হাতে ধরে সেটাকে পানিতে ফেলে দিল রানা। তারপর উঠে বসে হাদীর দিকে তাকাল।

মাথা নাড়ল সে, বলল, 'হঠাৎ বোটটা ঝাঁকি খাওয়ায় তাকাই আমি, দেখি বোট থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছেন আপনি। আপনার হাতে লাইনটা টান টান হয়ে ছিল। টোপটা নিশ্চয়ই বড় কিছুতে খেয়েছিল। আপনাকে টেনে নিয়ে গেছে বললে ভুল হবে, উড়িয়ে নিয়ে গেছে। আর লাইনটা এমনভাবে ছিঁড়ে

গেল, যেন ছুরি দিয়ে কেটে ফেলল কেউ।'

বোট এখন 'জলপরীদের আস্তানা'-র দিকে যাচ্ছে। সাবধানে নিজের পায়ে দাঁড়াল রানা। বোটের কিনারায় বা শেষ প্রান্তে বসতে ভয় করছে ওর। 'এরকম কি প্রায়ই ঘটে?' চোখ তুলে তাকাতে অবাক হয়ে গেল ও।

হাদীকে হতভম্ব দেখাচ্ছে। 'আগে কখনোই এরকম ঘটতে দেখিনি, স্যার।'

'কি ছিল ওটা? বিশাল কোন পলাক? নাকি টার্নি বা শার্ক?'

'টার্নি বা শার্ক যে হতে পারে না তা নয়,' বলল হাদী, গলায় সন্দেহ। 'কিন্তু আপনার লাইনে তো ম্যাকারেল ছিল, স্যার।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'পানি আসলে আগে থেকেই ফুলে উঠেছিল, চোখের কোণ দিয়ে দেখে ওটাকে আমি ঢেউ বলে মনে করেছিলাম। বোটের পাশে পানির ওপর কিছু একটা ভেসে উঠতেও দেখেছি, লাইনের উল্টো দিকে যাচ্ছিল। সেটা কি কোন শার্কের ফিন হতে পারে? এদিকের উপকূলে শার্ক তোমরা দেখো?'

'মাঝে মধ্যে। সব কোস্টেই দেখা যায়। শার্ক যদি হয়ও, প্রকাণ্ডই বলতে হবে,' বিড়বিড় করছে হাদী। 'আপনি ডুবে যাবার পর সাগরের অবস্থা দেখলে বুঝতেন—মনে হলো একটা তিমি লাফ দিয়েছে।'

সিগারেট ধরাল হাদী, সাধতে রানাও একটা ধরাল। শুধু যে ভয় পেয়েছে তা নয়, রহস্যটা বুঝতে না পারায় মনটাকে স্থির রাখতে পারছে না। 'জলপরীদের আস্তানা'-য় না পৌঁছুনো পর্যন্ত কোন কথা হলো না। ইতিমধ্যে শীতে কাঁপ ধরে গেছে রানার। তীরে বোট ভিড়িয়েই রানাকে নিয়ে টম যোসেফের বার-এ চলে এল হাদী। যোসেফ মধ্যবয়স্ক খ্রিস্টান, তার স্ত্রী লিজা অল্প বয়স্কা ইহুদী তরুণী। হাতে স্বামীর ট্রাউজার ও শার্ট ধরিয়ে দিয়ে খালি একটা ঘরে রানাকে ঠেলে দিল লিজা। ভিজে কাপড় ছেড়ে আবার যখন বার-এ বেরিয়ে এল ও, দেখা গেল ঘটনাটা নিয়ে উপস্থিত সবাই আলোচনা করছে। সবারই ধারণা, হাঙরই ছিল ওটা। রানা বিয়ার বা হুইস্কি খাবে না শুনে কফি তৈরি করে আনল লিজা। কফি শেষ হতে হাদী প্রস্তাব দিল রানাকে সে বোটে করে মুয়াক্কায় পৌঁছে দেবে। মাথা নেড়ে রানা জানাল, 'আমি হেঁটে ফিরব।' লিজার দিকে তাকাল ও। 'তোমার স্বামীর কাপড়গুলো কাল ফিরিয়ে দিলে চলবে তো?'

কাউন্টার থেকে কৌতুক করল যোসেফ, 'আজ আমার কাপড় দিয়েছে, কাল না নিজেরগুলো খুলে দেয়!' নিজের রসিকতায় নিজেই গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

বিল মিটিয়ে তাড়াতাড়ি বার থেকে বেরিয়ে এল রানা। পিছন থেকে শুনতে পেল বার-এর দু'জন কর্মচারীকে ডাকছে হাদী, বোটটাকে ডাঙায় টেনে তোলার জন্যে সাহায্য দরকার তার।

মুয়াক্কায় ফেরার পথে অনেকটা পথ হাঁটতে হলো রানাকে। দ্রুত হাঁটছে

বলে শরীরটা গরম হয়ে উঠল, তবে জুতো জোড়া এখনও ভিজে থাকায় হেঁটে আরাম পাচ্ছে না। খেতগুলোকে পিছনে ফেলে এল ও, তারপর পাথুরে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সরু পথ ধরে ঢালের মাথায় উঠতে শুরু করল, 'শয়তানের তাওয়া'-টাকে ঘিরে রেখেছে এই প্রাচীর। উপকূল বরাবর দূরে দেখা যাচ্ছে লাইটহাউসের আলোর ঝলকানি। মেঘ থাকায় মাথার ওপর আকাশ নেই, অন্ধকারে পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছে। পাহাড়-প্রাচীরের মাথা থেকে পড়ে যাবার ভয়ে খুব সাবধানে পা ফেলছে রানা।

হেডল্যান্ডে বড় একটা সাদা চুনকাম করা বাড়ি আছে, সেটাকে পাশ কাটিয়ে এল রানা। তারপর সামনে পড়ল আংশিক কাঠ দিয়ে খাড়া করা বাংলোটা, এক লোক ওটাকে কাফে বানিয়েছে। কমলা রঙের জানালার পর্দাগুলো অর্ধেক আলোকিত, বাকি অর্ধেক ব্রাউন-পেপার দিয়ে কালো করে রাখা হয়েছে। হঠাৎ করেই রানা উপলব্ধি করল, প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা হলো যুদ্ধের আশঙ্কা নিয়ে কিছুই চিন্তা করেনি। মনটা আবার বিষণ্ন হয়ে উঠল। প্রাচীর ঘেরা আরেকটা পথ পেরুতে হলো ওকে। সামনে লম্বা একটা গর্ত থাকায় সেটাকে ঘুরে এগোতে হচ্ছে।

কেন ওকে লেবাননের তাকরির উপকূলে পাঠানো হয়েছে, প্রশ্নটা আবার ফিরে এল মনে। অন্যমনস্কই ছিল, হঠাৎ এক লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেতে চমকে তো উঠলই, চোখের পলকে আক্রমণের একটা ভঙ্গিও নিয়ে ফেলল।

'সত্যি দুঃখিত,' ইংরেজিতে কে যেন বলল, হাতের টর্চটা জ্বেলেই আবার নিভিয়ে ফেলল। 'আমি বোধহয় আপনাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি।'

রানার মনে প্রথমেই প্রশ্ন জাগল, সঙ্গে টর্চ থাকা সত্ত্বেও ভদ্রলোক অন্ধকারে হাঁটছিল কেন? 'না-না, একটু চমকে উঠেছিলাম, এই যা। আমি আসলে অন্যমনস্ক ছিলাম।'

'আচ্ছা, ভাই, বলতে পারেন মুয়াক্কা খাঁড়ির ঢালে জেলেদের পাড়াটা কোনদিকে?' জানতে চাইলেন ভদ্রলোক। 'আপনাকে আমি বাড়িটার নামও বলতে পারব, চিনবেন কি?' ইংরেজি বললেও, বাচনভঙ্গিতেই টের পাওয়া যায় তার মাতৃভাষা ইংরেজি নয়।

'বলুন।'

'দোস্তানা।'

'দোস্তানা?' বিড়বিড় করল রানা। হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল কোথায় দেখেছে নামটা। 'মুয়াক্কা খাঁড়ির উল্টোদিকের ঢালে বাড়িটা, তাই না?'

উত্তর দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল ভদ্রলোক। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই।'

'আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন, বাড়িটা কোনদিকে দেখিয়ে দিতে পারব,' বলল রানা। 'এই পথেই যেতে হবে, আধ মাইলটাক দূরে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে রানার পিছু নিল লোকটা। রানা ভাবল, সম্ভবত ব্যাটারি খরচ হবার ভয়ে টর্চ জ্বালছে না। তবু বলতে বাধ্য হলো, 'মাঝে মধ্যে হাতের ওটা জ্বালুন, তা না হলে হোঁচট খেতে হবে যে।'

ভদ্রলোক টর্চ জ্বালতেই ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। আলোটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেলেও ও দেখল, তার পরনের ওয়াটারপ্রুফ প্রায় কোমর পর্যন্ত ভেজা। 'আপনি ভিজে গেছেন,' বলল ও।

এবারও উত্তর পেতে এক সেকেন্ড দেরি হলো। 'হ্যাঁ, আর বলবেন না। বোট নিয়ে বেরিয়েছিলাম, তীরে ভিড়তে জান বেরিয়ে যাবার অবস্থা হয়েছে। না দেখলে বুঝবেন না সাগর কিরকম ফুঁসছে।'

'অদ্ভুত!' হাসল রানা। 'আমিও তো ভিজে গিয়েছিলাম।' তারপর জানাল মাছ ধরতে গিয়ে কি ঘটেছে।

ভদ্রলোক হাসল না, ব্যাপারটাকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই নিল। রানা থামতে জিজ্ঞেস করল, 'জিনিসটা কি হতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

'হাঙরই হবে, তাছাড়া কি,' জবাব দিল রানা।

রাস্তাটা চওড়া হতে রানার পাশে চলে এল ভদ্রলোক। অন্ধকার, তবু তার মাথা ঝাঁকানোটা লক্ষ করল রানা। 'এদিকের পানিতে হাঙর তো আছেই। জানেন, আমিও আপনার মত ম্যাকারেল ধরতে বেরিয়েছিলাম।' এরপর প্রসঙ্গ বদলে যুদ্ধের হুমকি নিয়ে কথা বলল, জানতে চাইল, সমস্যাটার কূটনৈতিক কোন সমাধান কি সম্ভব নয়? তারপর জিজ্ঞেস করল, রানা কোন যুদ্ধ জাহাজের বহরকে সাগরে দেখেছে কিনা। জবাবে রানা বলল, 'বেশ কয়েকটা ডেস্ট্রয়ারকে দেখা গেছে। কয়েকটা গানবোটও চোখে পড়েছে। আর একটা সাবমেরিন—কোন দেশের বলতে পারব না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক বলল, 'যুদ্ধ তাহলে বাধবেই।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'সেনাবাহিনীতে আপনার ডাক পড়েনি?'

'পড়েনি, তবে পড়তে বাধ্য।'

'কোন ট্রেনিং নেয়া আছে?'

'হ্যাঁ, নৌ-বাহিনীতে একবার নাম লিখিয়েছিলাম। বাজেটের অভাবে ছাঁটাই হয়ে যাই।'

'নেভী তবু ভাল,' বলল রানা। 'ট্রেঞ্চে ঢুকতে হয় না।'

'আপনি আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছেন,' হালকা সুরে বলল লোকটা। 'যুদ্ধের মধ্যে ভাল বলে কিছু নেই।'

বেশ কিছুক্ষণ আর কেউ কোন কথা বলছে না। যুদ্ধের ভয়াবহতা ভোলার জন্যে এক সময় রানাই নিস্তব্ধতা ভাঙল। তাকরির উপকূল, জলমগ্ন পাহাড়, জাহাজডুবি ইত্যাদি নিয়ে কথা বলছে ও।

ভদ্রলোক মন্তব্য করল, 'এদিকে আমি আগেও এসেছি, সবই জানা আছে। তাকরির খুব বিপজ্জনক কোস্ট। বিপজ্জনক এই কারণে যে পানিতে ডোবা পাথরগুলো চার্টে দেখানো হয়নি।'

রানা বলল, 'তবে স্থানীয় জেলেরা জানে কোথায় কি আছে।'

'তা হয়তো জানে।'

'হয়তো নয়, সত্যি জানে,' বলল রানা। 'পাথরগুলোর মাঝখানে ঠিক কোথায় ডুব দিলে সাগরের তল আর বালি পাওয়া যাবে, একবারে মুখস্থ বলে দেবে ওরা। পানির নিচের রক ফরমেশন সম্পর্কে এই জ্ঞান, আমার ধারণা, পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে পায়।' ইতিমধ্যে হেডল্যান্ডের মাথায় উঠে এসেছে ওরা, একটা পথ ডান দিকে ঘুরে গেছে, ছোট এক মাঠকে ঘিরে। 'আপনি ওই রাস্তা ধরে চলে যান। কটেজটা, দোস্তানা, আপনার ডান দিকে পড়বে।'

আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে নিজের পথ ধরল ভদ্রলোক। তার ঋজু কাঠামোটা একটু পরই হারিয়ে গেল অন্ধকারে। ঢাল বেয়ে নিজের বাড়ির দিকে এগোল রানা।

দুই

পরদিন সকালে মুয়াক্কা রেস্তোরাঁর সামনে থেকে গাড়িতে চড়ল রানা, চলে এল হাদীদের জেলে পাড়ায়। লিজার কাছ থেকে নিজের কাপড়-চোপড়ের প্যাকেটটা নিল, ফিরিয়ে দিল তার স্বামীর ট্রাউজার আর শার্ট। গাড়িটা ওখানেই থাকল, সৈকতে এসে দেখে সাগরে বেরুবার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে হাদী। ওকে দেখে সিধে হলো, জানতে চাইল, 'কাল ভিজে গেলেন, ঠাণ্ডা লাগেনি তো, স্যার?'

'আরে না!' বলল রানা। 'অদ্ভুত ব্যাপার হলো, মুয়াক্কায় ফেরার পথে এক ট্যুরিস্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো আমার, তিনিও মাছ ধরতে গিয়ে ভিজে গেছেন।'

'মুয়াক্কার ওদিকে দেখা হলো? মুয়াক্কার কোথায় থেকে মাছ ধরতে যাবে?' হাদী বিস্মিত।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তা কি করে বলি। কাফেটা ছাড়িয়ে খানিক এগিয়েছি, এই সময় তাঁর সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগে।'

'মুয়াক্কার ওদিকটায় শুধু আপনার বাড়ির নিচে ছোট্ট একটু সৈকত আছে,' বলল হাদী। 'ওখানে কখনোই কোন বোট ভেড়ে না।'

'হয়তো আরও দক্ষিণের কোন তীরে ভিড়েছে।'

'বাধ্য না হলে কেন কেউ ওদিকে বোট ভেড়াবে? ওদিকটা তো ডোবা পাথরে ভর্তি।'

'কি জানি। তবে তাঁর কোমর পর্যন্ত ভেজা দেখলাম। সে যা-ই হোক, কি আসে যায় তাতে?' হাদীকে অবাক হতে দেখে অস্বস্তি বোধ করছে রানা।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাল হাদী। খানিক ইতস্তত করার পর বলল, 'না,

কাল রাতের কথা ভাবছিলাম। আমরা কি সত্যি-সত্যিই জানি যে ওটা একটা মাছ ছিল?'

'মাছ ছাড়া আর কি হতে পারে?'

ভুরু কুঁচকে হাদী বলল, 'স্যার, হাসবেন না—যদি বলি ওটা একটা সাবমেরিন ছিল?'

হাদীর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'সাবমেরিন?' হঠাৎ হেসে উঠল ও। 'নিরীহ একটা ম্যাকারেলকে ধাওয়া করার জন্যে কেন একটা সাবমেরিন লাফ দিয়ে পানির ওপর অর্ধেকটা উঠে আসবে?'

'লাফ দিয়ে পানির ওপর অর্ধেকটা উঠে এসেছিল?' 'জিজ্ঞেস করল হাদী, রীতিমত সিরিয়াস হয়ে উঠছে। 'স্যার, আপনি ঠিক জানেন, ম্যাকারেলটাকেই ধাওয়া করেছিল ওটা?'

'পানির ওপর উঠে পড়া বলাটা একটু হয়তো অতিরঞ্জিত হয়ে যাচ্ছে,' স্বীকার করল রানা। 'তবে ফিন বা ওই ধরনের কিছু একটা দেখেছি আমি।'

'পেরিস্কোপ নয় তো, স্যার?'

এবার জবাব দেয়ার আগে দু'সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'স্বীকার করছি, অসম্ভব নয়। কিন্তু আমার লাইন কেন ছিঁড়বে?'

'লাইনটা হয়তো পেরিস্কোপে জড়িয়ে গিয়েছিল।'

মাথা নাড়ল রানা। 'বিশ্বাস হয় না।'

'স্যার, আপনি তলিয়ে যাবার পর পানির অবস্থা দেখেননি, রীতিমত টগবগ করে ফুটছিল। হাঙর হলে এতটা আলোড়ন উঠত না।'

'তাহলে আমার প্রশ্নের জবাব দাও, একটা সাবমেরিন তীরের এত কাছাকাছি কেন আসবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বিশেষ করে ওদিকের ওই বিপজ্জনক তীরে?'

'সেটাই তো ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে আমাকে, স্যার,' বলল হাদী। 'তবে আপনার মুখে ভেজা লোকটার কথা শুনে আমার মাথায় একটা আশঙ্কা জাগছে। ওরা হয়তো কাউকে সাবমেরিন থেকে তীরে নামাতে এসেছিল।'

সম্ভাবনাটা নিয়ে চিন্তা করল রানা। একেবারে অসম্ভব, তা মনে হচ্ছে না। অথচ বিশ্বাস করতে মন চায় না।

'লোকটার সঙ্গে আপনার কোনও কথা হলো?' জানতে চাইল হাদী।

'হ্যাঁ। একটা বাড়ির খোঁজ চাইলেন। দোস্তানা।' ভদ্রলোকের সঙ্গে কি কি কথা হয়েছে, সব মনে পড়ে গেল ওর। শোনালও হাদীকে।

হাদী উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'এদিকে সে আগেও এসেছে, এ-কথা বলার মানে হলো, লোকটা ট্যুরিস্ট বা অস্থানীয়। তাহলে জানল কিভাবে ওদিকের কোস্ট বিপজ্জনক?'

'বললেন, আগেও এসেছেন।'

'তাহলে বলুন, সে জানল কিভাবে পানিতে ডোবা পাথরগুলো চার্টে দেখানো হয়নি?'

হাদী যতই উত্তেজিত হোক, নিজেকে রানা বিশ্বাস করাতে পারছে না যে ভদ্রলোক স্পাই।

'স্যার, ব্যাপারটা স্বভাবিক বলে মনে হচ্ছে না,' বলল হাদী। 'আমাদের যোসেফের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। তাকরিরের সবাইকে সে চেনে। দোস্তানা কটেজটা কার, সে বলতে পারবে।'

হাদীর পিছু পিছু বার-এ ফিরে এল রানা। রেডিওর খবর শুনছে সবাই। জাতিসংঘের মহা সচিব কফি আনানের বাগদাদ সফর অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ছ'হাজার মার্কিন সৈন্যের তৃতীয় দলটা পৌঁছে গেছে কুয়েতে। জাতিসংঘের বিভিন্ন মিশনের লোকজনকে ইরাক ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

যুদ্ধের আশঙ্কা আরও বাড়ছে, সন্দেহ নেই। দুই তরুণ বার থেকে বেরিয়ে গেল, একজন বলে গেল সে তার ভাইকে টেলিফোন করতে যাচ্ছে। রেডিও বন্ধ হতে যোসেফকে হাদী জিজ্ঞেস করল, 'মুয়াক্কার জেলে পাড়ায় দোস্তানা নামে একটা বাড়ি আছে। ওখানে কে থাকে বলতে পারো?'

'বছর তিন হলো বাড়িটা এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ভাড়া নিয়েছেন। রিটায়ার্ড এক বুড়ো, নামটা বোধহয় জামালু দীন। কেন?'

ইতস্তত করে হাদী বলল, 'না, এমনি—আমার স্যার জানতে চাইছেন আর কি। তা রিটায়ার্ড ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছে খুব বেশি লোকজন আসে কিনা বলতে পারো?'

যোসেফকে কৌতূহলী দেখাল। 'তা আমি কিভাবে জানব?'

বার থেকে বেরিয়ে এসে হাদী বলল, 'স্যার, তেমন কিছুই তো জানা গেল না। চলুন আমরা শমসের লিবানের সঙ্গে কথা বলি।' শমসের লিবান একজন কোস্টগার্ড, জানে রানা। জেলে পাড়ার সবাই তাকে নিজেদের অভিভাবক হিসেবে মান্য করে।

কোস্টগার্ড শমসের লিবানকে পাওয়া গেল মাছ ব্যবসায়ী সমিতির অফিস কামরায়। অফিসটা পাহাড়ের ঢালে। পুরো ঘটনাটা তাকে শোনাল হাদী। পা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে সে, দু'হাতের আঙুল লেদার ওয়েস্টবেল্টে গোঁজা, দেখে মনে হচ্ছে তার বিশাল কাঠামো গোটা কামরাটাকে ভরাট করে রেখেছে। তুলনায় শমসের লিবান লিলিপুটিয়ান, ডেস্কের ওপর টেলিস্কোপের সামনে বসে আছে। হাদীর কথা শেষ হতে ডেস্কের ওপর আঙুলের গিঁট দিয়ে ড্রাম বাজাতে শুরু করল। 'সম্ভব,' বলল সে। 'কালই তো আমি নিজে দেখলাম কোস্ট থেকে মাত্র ছ'মাইল দূরে ভুস করে একটা সাবমেরিন ভেসে উঠল। তারপরই অবশ্য ডুব দেয়। কিন্তু লোকটা বোট নিয়ে নামবে কোথায়?'

'মুয়াক্কার ছোট্ট সৈকতে,' বলল হাদী।

'ওখানে পানির নিচে কত পাথর আছে জানো না? বোট তো ভেঙে

যাবে।'

'ওদের সঙ্গে, ইসরায়েলি নাবিকদের সঙ্গে, কলাপসিবল বোট থাকে,' জবাব দিল হাদী। 'রাবারের তৈরি।'

'ঠিক আছে, ধরা যাক সাবমেরিন থেকে একজন ইসরায়েলি নাবিক বা একজন স্পাই মুয়াক্কা সৈকতে নেমেছে। তার উদ্দেশ্য কি হতে পারে?'

কাঁধ ঝাঁকাল হাদী। 'বুড়ো জামালু দীন একজন স্পাই হতে পারে। সাবমেরিনের একজন অফিসার কিংবা হয়তো কমান্ডার নিজেই তার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিতে এসেছিল।'

শমসের লিবান এখনও ড্রাম বাজাচ্ছে। 'কি জানো, হাদী, এদিকের কোস্টে কিন্তু হাঙর খুব কম নয়।'

এক হাতের তালুতে অপর হাতে ঘুসি মারল হাদী, বোমা ফাটার মত আওয়াজ হলো। 'পানির আলোড়ন দেখলে তুমিও বলতে ওটা হাঙর ছিল না!'

শমসের লিবান এবার রানার দিকে তাকাল। 'আপনার কি ধারণা, স্যার?'

বিপদেই পড়ল রানা। হাদীর সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারছে না ও। 'আমি মনে করি ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখা উচিত।'

হাদীর দিকে ফিরল শমসের লিবান। 'তুমি আমাকে কি করতে বলো? পুলিসকে জানাব?'

'পুলিসকে জানিয়ে কি লাভ! নৌ-বাহিনীর সদর দফতরে ফোন করো।' রাগে লালচে হয়ে উঠল হাদীর মুখ। 'আর তুমি যদি কিছু করতে না চাও, আমরা নিজেরা যা পারি করব।'

'যেমন?'

'লোকটা ইসরায়েলি হলে নিশ্চয়ই তথ্য নিতে এসেছিল। আর তথ্য নিতে এসে থাকলে সাবমেরিনে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে। আমাদের কাজ হবে তাকে ফিরে যেতে না দেয়া।'

'সে হয়তো এরইমধ্যে বোটে ফিরে গেছে,' বলল রানা।

'কি? কাল রাতে? না, স্যার!' মাথা নাড়ল হাদী। 'কাল রাতে মাতাল ছিল সাগর, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাতলামিও বেড়েছে। ওদিকের সৈকত থেকে বোট নিয়ে কোথাও যাওয়া সম্ভবই ছিল না। আমি কি চাই বলছি—চলুন যাই, লোকটার ফেরার পথে ওত পেতে অপেক্ষা করি। পেলে ধরব। না পেলে…' কথা শেষ না করে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল।

কোস্টগার্ড প্রস্তাবটা নিয়ে চিন্তা করল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, হাদী। স্যারকে নিয়ে তুমি সৈকতের ওপর ঢালে অপেক্ষা করবে। আমি দু'জনকে নিয়ে পাহারায় থাকব হেডল্যান্ডে, দক্ষিণ দিকটায়। তোমার বোটটা আমরা নিতে পারি তো?'

মাথা ঝাঁকাল হাদী। 'অবশ্যই। আর, লিবান, সার্ভিস রিভলবারটা সঙ্গে নিতে ভুলো না যেন।'

ডেস্কের দেরাজ খুলে রিভলবারটা বের করল কোস্টগার্ড। 'ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ,' বিড়বিড় করে বলল সে।

রাত বাজে সাড়ে ন'টা, মুয়াক্কা খাঁড়ির ঢালে হাদীকে নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা। লোকটা স্পাই হলে সন্ধের আগে বেরুবে না, এটা ধরে নিয়ে সন্ধে থেকে এখানে ওত পেতে আছে ওরা। মশার কামড় তো আছেই, আজ শীতটাও যেন বেশি লাগছে। সিগারেটের আগুন অনেক দূর থেকে দেখা যায়, সেই ভয়ে ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে হাদীকে। আর রানা তাকে কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছে।

কোস্টগার্ড শমসের লিবানের কথা ভাবছে রানা। হাদীর সন্দেহ খুব একটা প্রভাব ফেলেনি তার মনে। তা পড়লে নৌ-বাহিনীর সদর দফতর বৈরুতে ফোন করত। লেবানন ছোট্ট দেশ বটে, তবু রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খুব দুর্বল বলা চলে না। লেবানীজ নৌ-বাহিনীর হাতে কোন সাবমেরিন না থাকলেও, ডেস্ট্রয়ার আর গানবোট আছে। টর্পেডো বোট থেকে একটা সাবমেরিনকেও আক্রমণ করতে পারবে। লিবান ফোন না করায় একটু অবাকই হয়েছে রানা।

নিজের কথা ভাবতে গিয়ে মনে মনে হাসিও পাচ্ছে রানার। ক্ষীণ সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে পাথুরে ঢালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে অপেক্ষা করা ওকে যেন ঠিক মানাচ্ছে না। এ যেন অনেকটা নেই কাজ তো খৈ ভাজ। কাল সকালের মধ্যে জেলে পাড়ার সবাই ওদের এই ব্যর্থ অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কে জেনে যাবে, হাদীর সঙ্গে ও-ও হাসির খোরাকে পরিণত হবে।

রাস্তার ধারে একটা পাথরের ওপর বসে আছে ওরা। রাত যত বাড়ছে ততই দৃঢ় হচ্ছে বিশ্বাসটা, হাদীর সন্দেহ অমূলক। আজও আকাশে মেঘ আছে, তবে বাতাস খুব কম। অন্ধকার আলকাতরার মত ঘন। বুদ্ধি করে কিছু চকলেট নিয়ে এসেছে রানা, দু'জন ভাগাভাগি করে খাচ্ছে। ধীরে ধীরে চুষছে, যাতে তাড়াতাড়ি শেষ না হয়। ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নেয়াতেই বোধহয়, এক সময় ঘুম পেয়ে গেল রানার। রাত এখন দুটোর মত। শরীরটা ঠাণ্ডা আর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। হাদীর ওপর রাগ হচ্ছে, যদিও কিছু বলতে পারছে না। নিজেকে বোকাও মনে হচ্ছে। ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু সফল হলো না।

মনে হলো মাত্র এক সেকেন্ড ঘুমিয়েছে, ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠল। কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবে, কে যেন হাত চাপা দিয়ে থামিয়ে দিল, কানে ফিসফিস করল হাদী, 'স্যার, চুপ! সাগরের দিকে তাকান!'

আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা। অন্ধকার এত গাঢ় যে নিজেকে অন্ধ মনে হলো। তারপর হঠাৎ একটা আলো দেখা গেল সাগরের পানিতে। সরাসরি আলো দেখল, না কি আলোর প্রতিফলন, ঠিক বোঝা গেল না। তারপর আবার সব ঘন কালো। সন্দেহ হলো, চোখের ভুল নয় তো?

হাদী নড়ছে না। তার আড়ষ্টতা অনুভব করতে পারছে রানা। মাত্র কয়েক ফুট দূরে তার মাথা, অস্পষ্টভাবে আঁচ করা যায়। একদিকে একটু কাত হয়ে আছে, কান পেতে কিছু শোনার ভঙ্গিতে, দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে সাগরের যেখানে আলোটা এইমাত্র দেখা গেছে। রানা ধারণা করল, আলোটা দেখা গেছে 'শয়তানের তাওয়া' খাঁড়ির মুখ থেকে বেশি দূরে নয়।

এক সময় সিধে হলো হাদী। রানাও দাঁড়াল, তবে ও কিছু শুনতে পায়নি। হাদী ওর বাহু খামচে ধরল, দু'জন একসঙ্গে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পথটার দিকে এগোল। পথটা পার হলো ওরা, পাঁচিলে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। 'সাবমেরিন পৌঁছে গেছে,' ফিসফিস করল হাদী। 'শয়তানের তাওয়ায় রয়েছে। আর ঢালের মাথায় আপনার বন্ধুর টর্চ জ্বলতে দেখেছি আমি, সাবমেরিনকে সঙ্কেত দেয়ার সময়।'

মনে হলো কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর সামনের পথ থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। আসলে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াবার পর খুব বেশি হলে মিনিট দশেক পেরিয়েছে। শব্দটা কাছে সরে আসছে। রানা অনুভব করল লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হলো হাদী। অকস্মাৎ পায়ের আওয়াজ থেমে গেল। প্রায় সেই মুহূর্তেই টর্চের আলো দেখা গেল, কাঁচে হাত চেপে রাখায় লাল আভাটুকুই শুধু দেখতে পেল ওরা। সেই আভাতেও ওয়াটারপ্রুফ পরা ঋজু কাঠামোটা পরিষ্কার চেনা গেল। পথ ছেড়ে সরে গেছে লোকটা, দাঁড়িয়ে আছে ঠিক একটু আগে ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল। ওখান থেকে ঢালের ওপর ধাপ কাটা আছে, নেমে গেছে খুদে সৈকতে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল সে।

বিশাল দেহ, তাসত্ত্বেও বিদ্যুৎ খেলে গেল হাদীর শরীরে। কালো অন্ধকারে আরও কালো একটা ছায়ার মত লাগল তাকে, অস্পষ্ট, ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে; রানা তখনও পথটা পেরুতেও পারেনি। পথ পেরিয়ে ঢালে যখন পা দিল, হাদীকে ধস্তাধস্তি করতে দেখল ও। হাদী একটু পিছিয়ে এসেছে, সম্ভবত সে আক্রমণ করার আগেই লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিল। রানার ভয় লাগল, লোকটার কাছে রিভলবার থাকতে পারে। তবে থাকলেও ব্যবহার করার সুযোগ তার নেই বললেই চলে। ঢালের ওপর দিকে রয়েছে হাদী, এটা তার একটা বাড়তি সুবিধে; তাছাড়া প্রকাণ্ড শরীরের ভারও ওকে সাহায্য করছে। ধস্তাধস্তি চলছে, এক সময় দু'জনেই পড়ে গেল। কাছাকাছি এসে রানা দেখল লোকটার বুকে ভারী বস্তার মত বসে রয়েছে হাদী, মুখ চেপে ধরেছে এক হাতে। 'স্যার, সার্চ করুন!'

বলার দরকার ছিল না, তার আগেই ঝুঁকে পড়েছে রানা। ওয়াটারপ্রুফের পকেটে একটা অটোমেটিকের অস্তিত্ব অনুভব করল ও। পকেটে হাত ভরতে যাবে, এই সময় গোটা দৃশ্যটা আলোকিত হয়ে উঠল। চোখ তুলতেই টর্চের আলোয় ধাঁধিয়ে গেল রানার চোখ। টর্চ ধরা হাতটা একটুও কাঁপছে না, সোজা এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল দীর্ঘদেহী এক

ইউনিফর্ম পরা লোক। টর্চ ধরা হাতের সামনে দ্বিতীয় হাতটা আনল সে, সেই হাতে বড় একটা সার্ভিস রিভলবার দেখা যাচ্ছে। একটু ঝুঁকে হাদীর মাথায় রিভলবারের ব্যারেল দিয়ে প্রচণ্ড বাড়ি মারল লোকটা। রোমহর্ষক আওয়াজ হলো, নেতিয়ে পড়ল হাদী। বুক থেকে হাদীকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ওয়াটারপ্রুফ পরা লোকটা সিধে হলো, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। শক্ত ও ঠাণ্ডা কি যেন একটা চেপে ধরা হলো রানার মাথার পিছনে। জিনিসটা কি জানে ও, ভাবল হাদীর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস না করায় এখন না ওকে প্রাণটা হারাতে হয়। আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল, তবে এখন আর নিজেকে তিরস্কার করে কোন লাভ নেই। দ্বিতীয় লোকটা টর্চ নেভায়নি, সেটার আলোয় দেখা গেল একটা পাথরের ওপর হাদীর মাথাটা নড়বড় করছে, খুলি থেকে রক্ত গড়াচ্ছে দাড়িতে। হাদী কি তাহলে মারা গেছে?

প্রথম লোকটা কথা বলছে হিব্রু ভাষায়। ওদেরকে মেরে ফেলার কথা ভাবছে না ওরা, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইছে—কারণটাও পরিষ্কার, এখানে ল্যান্ড করার কোন প্রমাণ রাখতে চায় না, নষ্ট করতে চায় না দোস্তানায় বসবাসরত স্পাই লোকটার কাভার।

প্রথম ভদ্রলোক রানাকে ইংরেজিতে বলল, 'আপনি নিজেকে আমাদের বন্দী বলে মেনে নিন। আমাদের দেড় গজ আগে থাকবেন। পালাবার বা কারও দৃষ্টি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে দেখলে গুলি করা হবে।' অটোমেটিক নেড়ে আগে বাড়ার নির্দেশ দিল। তারপর দু'জন মিলে দাঁড় করাল হাদীকে। টর্চটা নিভে গেল, অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা। ধাপ বেয়ে সাবধানে নামছে, পিছন থেকে ভেসে আসছে ধাপের ওপর হাদীর পা আঁচড়ানোর আওয়াজ। ইসরায়েলি দু'জন মাঝে মধ্যেই থামতে বাধ্য হলো, হাদীর ভার বহন করতে কষ্ট হচ্ছে খুব।

ধাপ থেকে নেমে সৈকতে পা দিল রানা। অন্ধকার এতই গাঢ়, পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা এক লোকের বাড়ানো বাহুর ভেতর সেঁধিয়ে গেল, তার আগে কিছুই টের পায়নি। 'কে তুমি?' হিব্রু ভাষায় ধমক দিল লোকটা।

'উনি আমাদের বন্দী, কালাহান,' পিছন থেকে ওয়াটারপ্রুফ পরা লোকটা জবাব দিল। 'এখানে আরও একজন আছে।'

'ভাগ্যকে ধন্যবাদ আপনি নিরাপদে ফিরে এসেছেন, কমান্ডার!'

তারমানে হাদীর ধারণাই ঠিক। সাবমেরিনের কমান্ডার স্বয়ং সৈকতে নেমেছিল। রানা ভাবছে, এত ঝুঁকি নিয়ে তীরে নামার পিছনে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোন উদ্দেশ্য আছে। নিজেকে আরেকবার তিরস্কার করতে ইচ্ছে হলো ওর। এরকম ভুল করেছে শুনলে বস্ ওকে নিঃসন্দেহে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে মানসিক চিকিৎসার জন্যে পাঠাবেন। লোকটা একা ফিরবে না, এটা ওর অন্তত আন্দাজ করা উচিত ছিল। আর নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া উচিত ছিল সৈকতে বোট নিয়ে কেউ একজন অপেক্ষা করবে।

এখন ওদের একমাত্র আশা কোস্টগার্ড, যে কিনা হেডল্যান্ডে অপেক্ষা করছে। নাকি এরইমধ্যে তার ব্যবস্থাও করে এসেছে ওরা? সেজন্যেই কি সৈকতে ফেরত আসার সময় এত সতর্ক ছিল?

তৃতীয় লোকটা রানাকে ছেড়ে দিয়ে পানিতে নামল, টেনে আরও কাছে আনল বোটটাকে। কলাপসিবলই, দুটো বৈঠা, হাদীর অসাড় শরীরটা তোলার পর মনে হলো না বাকি চারজনের জায়গা হবে। তবু উঠল ওরা, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল। পানিতে খুব বেশি ডেবে গেল বোট। কমান্ডার বসেছে রানার সামনে, হাতের অটোমেটিক ওর দিকে তাক করা। বাকি দু'জন বৈঠা ধরল।

মুয়াক্কা খাঁড়ির প্রবেশপথ খিলান আকৃতির, সেটার নিচ দিয়ে খোলা সাগরে বেরিয়ে এল ওরা, বোট ঢেউয়ের তালে দুলতে দুলতে শয়তানের তাওয়া, অর্থাৎ আরেকটা খাঁড়ির দিকে এগোচ্ছে। খোলা সাগরে অন্ধকার তত গাঢ় নয়, ওদের ওপর ঝুঁকে থাকা পাহাড়-প্রাচীরগুলোকে অস্পষ্টভাবে হলেও চেনা যাচ্ছে। তবে খানিক পর তা-ও আর দেখা গেল না, রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। রানা ভাবছে, এই অন্ধকারে ওরা সাবমেরিনটাকে খুঁজে পাবে কিভাবে?

কয়েক মিনিট পর নাক বরাবর সামনে আলোর একটা বিন্দু দেখতে পেল রানা। দৃষ্টি টেনে এনে কমান্ডারের দিকে তাকাল ও। ওকেই লক্ষ করছে কমান্ডার, অটোমেটিকের মাজল ওর দিকে হাঁ করে আছে। দু'জনের মাঝখানে পড়ে আছে হাদী, এক চুলও নড়ছে না। আশপাশে কোথাও কোস্টগার্ড বোটের সাড়া-শব্দ নেই। রানা ভাবল, কমান্ডার লোকটা কি ধরনের তথ্য নিয়ে সাবমেরিনে ফিরছে? বাণিজ্যিক জাহাজের আসা-যাওয়ার হার, যুদ্ধ জাহাজের গতিবিধি? নাকি লেবানীজ নৌ-বাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতি? যুদ্ধ যদি বাধেই, এই তথ্য হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, ও যদি তথ্যটা সাবমেরিন পৌঁছুতে বাধা না দেয়। নড়েচড়ে বসল রানা। বোট বিপজ্জনক ভঙ্গিতে কাত হয়ে গেল, প্রথমে একদিকে, তারপর আরেকদিকে। 'নড়বেন না!' ধমক দিল কমান্ডার। অটোমেটিক ধরা হাতটা লম্বা করল রানার দিকে।

কমান্ডারের ঝুঁকি নেয়ার বহর দেখেই উপলব্ধি করতে পারছে রানা, তথ্যটা যাই হোক, অসংখ্য মানুষের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর হতে বাধ্য। ক্ষতিকর মানে, হাজার হাজার মানুষ মারাও যেতে পারে। মানুষ মানুষই, তা সে স্বদেশীই হোক বা লেবানীজ। হাজার হাজার বা শত শত মানুষ মারা যাবার আশঙ্কা দেখা দিলে, তাদেরকে যদি বাঁচাবার কোন উপায় থাকে, নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও সে উপায় কাজে লাগানোর নামই মাসুদ রানার মানবিকতা। একটা দায়িত্ব অনুভব করছে ও। ও মারা যাবে, হাদী মারা যাবে, কিন্তু ওদের প্রাণের বিনিময়ে যদি বহু লোক বেঁচে যায়? না, সিদ্ধান্ত নিল রানা, এই পরিস্থিতিতে প্রাণের মায়া করা চলে না। ঠিক করল, লাফ দেবে পানিতে। সঙ্গে সঙ্গে বোটটা উল্টে যেতে বাধ্য। তারপর বহু কিছু ঘটতে

পারে। লাফ দেয়ার জন্যে পেশী শক্ত করল রানা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে শক্তিশালী একটা এঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল। পানির ওপর সাদা পেন্সিলের মত বিস্তৃত হলো একটা উজ্জ্বল আলো—দ্রুত বৃত্ত তৈরি করছে, স্থির হলো রাবার বোটে, তীব্রতা প্রায় অন্ধকার করে দিল ওদেরকে। এঞ্জিনের গর্জন ক্রমশ বাড়ছে, সেই গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল মেশিন গানের একটানা আওয়াজ। বোটের চারপাশে ফুটতে শুরু করল পানি। বৈঠা হাতে এক লোক বোটের তলায় ঢলে পড়ল। বোটও প্রায় কাত হয়ে যায় যায় অবস্থা।

সার্চ লাইট দ্রুত ছুটে আসছে ওদের দিকে। বোটটা কি করতে চায় তা পরিষ্কার, ওদেরকে গুঁতো মারবে। ওটার পিছন থেকে অকস্মাৎ কান ফাটানো একটা বিস্ফোরণ ঘটল। ছলকে উঠল বিপুল পানি, সার্চ লাইটের আলোয় সাদা দেখাচ্ছে। বোটটার সামনেও আরেকবার ছলকে উঠল পানি। নাক ঘুরিয়ে দিক বদল করল ওটা। ছাই রঙা একটা লেবানীজ টর্পেডো বোটকে দেখতে পেল রানা, তীরবেগে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কিন্তু ও যে কিছু করবে, তার আর সময় পাওয়া গেল না, হঠাৎ করেই দেখা গেল রাবার বোটের গায়ে পাশে একটা সাবমেরিনের স্টীল বো নাক ঘষছে।

লাফ দিয়ে ডেকে নামলেন কমান্ডার, অগভীর পানিতে ডুবে আছে সেটা। কয়েকজন লোক রানাকে টেনে-হিঁচড়ে বোট থেকে তুলে আনল, ঠেলে দিল কনিং টাওয়ারের দিকে। ফরওয়ার্ড গানটাকে পাশ কাটাচ্ছে, আবার ওটা গর্জে উঠল, ফলে পুরোপুরি কালা হয়ে গেল রানা। কনিং টাওয়ারের হ্যাচে ফেলে দেয়া হলো ওকে, তার আগে মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল বিশাল একটা বৃত্ত তৈরি করে ওদের দিকে ফিরে আসছে টর্পেডো বোট—হঠাৎ করে ওটার সার্চলাইট নিভে গেল, সেই সঙ্গে আবার সব ঢাকা পড়ল ঘন কালো অন্ধকারে। লাফ দিয়ে নিচে, রানার পাশে নামলেন কমান্ডার, এক নিঃশ্বাসে এত দ্রুত অনেকগুলো নির্দেশ দিলেন, কোনটাই বুঝতে পারা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে সাবমেরিনের এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল, দ্রুত বেগে পোর্টসাইডের দিকে ঘুরে যাচ্ছে। রানা উপলব্ধি করল, কমান্ডার ভয় পাচ্ছেন টর্পেডো আঘাত হানবে। অকস্মাৎ নিজের ভেতর একটা শূন্যতা অনুভব করল ও।

হাদীর বিশাল দেহটা হ্যাচের মুখ থেকে নিচে ফেলে দেয়া হলো, প্রায় রানার গায়ের ওপরই পড়ল সেটা। নিচে নামছে ক্রুরা, দু'জন আহত হওয়ায় তাদেরকে বয়ে আনতে হচ্ছে। ধাতব শব্দের সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচ। এঞ্জিনের আওয়াজ ভারী ও গম্ভীর হয়ে উঠল। সাবমেরিনের ভেতরটা খুব গরম, বাতাসে তেলের গন্ধ। ওদের দু'জনকে আসা-যাওয়ার পথ থেকে সরিয়ে দুটো বাঙ্কে তুলে দেয়া হলো। বাকি সব লোকজন যার যার অ্যাকশন স্টেশনে দায়িত্ব পালন করছে।

স্পীড বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকি খেতে শুরু করল সাবমেরিন। একটা বেল বাজল, কয়েক সেকেন্ড পর কাত হয়ে পড়ল মেঝে। সাবমেরিন ডাইভ

দিচ্ছে। নৌ-পরিভাষায় এটাকে ক্র্যাশ ডাইভ বলে, ডিজেল এঞ্জিনের পরিবর্তে জ্যান্ত হয়ে উঠল ইলেকট্রিক মোটর। খোল তখনও পুরোপুরি সিধে হয়নি, রানা অনুভব করল সাবমেরিন বাঁক ঘুরছে। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারল, টর্পেডো এড়াবার চেষ্টা করছেন কমান্ডার। উত্তেজনা আর আতঙ্কে ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠল ওর মুখের পেশী, হাতের মুঠো এত শক্ত হয়ে উঠেছে যে তালুর ভেতর নখ ঢুকে যাচ্ছে।

এক সেকেন্ড পরই আঘাতটা লাগল। প্রচণ্ড সংঘর্ষই বলতে হবে। সাবমেরিন যেন সরাসরি একটা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছে। তৈজস-পত্র ভাঙচুরের আওয়াজ শোনা গেল। আলো নিভে যাওয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল ভেতরটা, থেমে গেল ইলেকট্রিক মোটর। আচমকা ভৌতিক নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। সব কিছু স্থির, কোথাও কিছু নড়ছে না। সেই স্থিরতার মধ্যে টর্পেডো বোটের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। তারপর ইমার্জেন্সী লাইট জ্বলে উঠল। ডেপথ চার্জের ঝাঁকি খেয়ে বাঙ্ক থেকে খসে পড়েছে হাদী, গড়িয়ে চলে গেছে গ্যাঙওয়ের গোড়ায়। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সে, ধীরে ধীরে উঠে বসল। ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখতে পেয়েই হাসতে গেল, অমনি ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা। 'আল্লাহকে হাজারো শোকর, আপনি বেঁচে আছেন, স্যার! আপনি অতিথি, তার ওপর আমার মক্কেল, আপনার কিছু হলে সারাজীবন নিজেকে ক্ষমা করতে পারতাম না।'

'আরে বোকা,' নরম গলায় ধমক দিল রানা, 'আগে বলো তুমি কেমন আছ। আমার ভয় হচ্ছিল···'

'মাথায় রক্ত, স্যার। ভেতরে যেন ছোট ছোট বিস্ফোরণ ঘটছে। খুলিটা না ফেটে চার টুকরো হয়ে যায়।'

কি ঘটেছে বলতে যাচ্ছিল রানা, দ্বিতীয় ডেপথ চার্জ বিস্ফারিত হলো। আগেরটার মত কাছাকাছি নয়, তাসত্ত্বেও সাবমেরিন খুব জোরে ঝাঁকি খেলো। বো নিচের দিকে নেমে গেল, কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আরেকবার কেঁপে উঠল। দ্রুত একবার চারদিক চোখ বুলিয়ে কোথায় রয়েছে বুঝে নিল হাদী। এতক্ষণ মাতালের মত লাগছিল তাকে, বিপদের মাত্রা উপলব্ধি করতে পেরে এখন যেন নেশাটা ছুটে গেছে। দৃষ্টি থেকে ঝাপসা ভাবটা কেটে গেল। চেহারায় ফুটল সতর্কতা। রানা তাকে সাবধান করে দিল—ওদেরকে হিব্রু না বোঝার ভান করতে হবে।

চিৎকার করে অর্ডার দিচ্ছেন কমান্ডার। গ্যাঙওয়ে ধরে ছুটল দু'জন নাবিক, ধাক্কা দিয়ে পথ থেকে সরিয়ে দিল হাদীকে। ওদের পিছু নিল আরেকজন লোক, এই লোকটাই রিভলবার দিয়ে বাড়ি মেরেছিল হাদীর মাথায়। লোকটার ইউনিফর্ম দেখে রানা বুঝতে পেরেছে, ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট। বেশ কিছুক্ষণ পরিবেশে একটা বিশৃঙ্খল ভাব লক্ষ করল ওরা, সবাই ছুটোছুটি করছে। কে যে কাকে কি নির্দেশ দিচ্ছে বোঝা মুশকিল। তবে বেশিরভাগ লোক সাবমেরিনের সামনের দিকে ছুটছে। তারপর সব শান্ত হয়ে গেল।

কন্ট্রোল রুম থেকে পানি বেরুচ্ছে। সব রকম শব্দ বন্ধ রাখার জন্যে হ্যান্ড গিয়ার ব্যবহার করছে ক্রুরা।

রেগুলেটিং ট্যাঙ্কে পানি ভরা হয়েছে, সাবমেরিনের খোল এখন কাত হয়ে নেই। রাঙ্ক থেকে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এল রানা। গ্যাঙওয়ে ধরে ফিরে এল নাম্বার ওয়ান, চিৎকার করে বলল, 'স্টার্ন কমপার্টমেন্ট ডুবে গেছে, পানি ঢুকছে এঞ্জিন রুমে।'

পরবর্তী রিপোর্ট এল, কন্ট্রোল রুমের লিক বন্ধ করা গেছে। দূরে আরও দুটো ডেপথ চার্জ বিস্ফোরিত হলো। কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এলো কমান্ডার, বেরুতেই দেখা হয়ে গেল এঞ্জিনিয়ার অফিসারের সঙ্গে। অফিসার রিপোর্ট দিল, এঞ্জিন রুমের লিক বন্ধ করা হয়েছে, তবে পোর্ট মোটর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওয়াচকিপারদের একজন ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে সিক-বেতে ছিল, পা'জামা পরে গ্যাঙওয়েতে বেরিয়ে এসে জানতে চাইল, 'কি ঘটেছে?'

'বলো কি ঘটেনি—তোমার টেমপারেচার একশো দুই,' জবাব এল, 'সিক-বেতে ফিরে যাও।' তারপর এঞ্জিনিয়ারের দিকে ফিরে কমান্ডার বলল, 'স্টারবোর্ড মোটরের কি অবস্থা?'

'প্রপেলার শ্যাফটে ফাটল দেখা দিয়েছে।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখুন পোর্ট মোটর মেরামত করা যায় কিনা।'

কমান্ডার এরপর তার সেকেন্ড অফিসারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করল, কিছু কিছু অংশ রানা শুনতে পেল না। তবে সেকেন্ড অফিসারের দু'একটা কথা শুনে বুঝতে পারল প্রথম ডেপথ চার্জের ফলে কি ধরনের ক্ষতি হয়েছে। বিস্ফোরণটা এঞ্জিন রুমের হ্যাচ উড়িয়ে দেয়, ফলে ভেতরে প্রচুর পানি ঢুকে পড়ে। ওদিকে বাইরে থেকে পানির প্রচণ্ড চাপে হ্যাচটা পুরোপুরি সীল হয়ে যায়। তবে সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো, সাবমেরিন এখন সারফেসের পঞ্চাশ থেকে ষাট ফুট নিচে ভেসে আছে।

'বিল্‌জ্ খালি করতে হবে,' হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল কমান্ডার। 'তাতে যদি তেল আমাদের পজিশন ফাঁস করে দেয়, কিছু করার নেই।'

সেকেন্ড অফিসার নির্দেশ দিল। খানিক পরই বোঝা গেল সাবমেরিন হালকা হয়ে গেছে। কমান্ডার আর সেকেন্ড অফিসার চার্টের ওপর ঝুঁকে পড়ল। বাঙ্কের নিচ থেকে ওদেরকে পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছে রানা। সম্ভবত ওর দৃষ্টিটা অনুভব করতে পেরেই মুখ তুলে তাকাল কমান্ডার। পরমুহূর্তে চোখ রাখল হাদীর ওপর। সিধে হল, গ্যাঙওয়ে ধরে নেমে এলো নিচে। এখনও সাদা পোশাকে রয়েছে, এত গরমের মধ্যে ওয়াটারপ্রুফটাও খোলেনি। হাদীর সামনে থামল কমান্ডার। 'তুমি তো জেলে, তাই না?' আরবীতে জানতে চাইল।

মুখ তুলে মাথা ঝাঁকাল হাদী।

'আমরা যেমন মরতে চাই না, তুমিও তেমনি মরতে চাও না,' বলল কমান্ডার। 'তুমি সাহায্য করলে আমি খুব খুশি হব।'

হাদী নির্লিপ্ত, কথা বলছে না।

'সারফেস থেকে পঞ্চাশ ফুট নিচে ভাসছি আমরা,' বলল কমান্ডার। 'মোটরগুলো অচল হয়ে পড়েছে। তোমাদের টর্পেডো বোটটা আমাদের মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে, অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। কাজেই পানির ওপর আমরা উঠতে পারছি না।'

হাদী এখনও কথা বলছে না।

'তীরের খুব কাছাকাছি রয়েছি আমরা,' আবার বলল কমান্ডার। 'এদিকের স্রোত সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন তথ্য নেই। সাবমেরিন যদি নিচে নামাই, পাথরের জঙ্গলে আটকা পড়ে যেতে পারি। আর যদি না নড়ি, তাহলেও স্রোতের টানে ধাক্কা খেতে পারি পাথরের সঙ্গে। আমার ধারণা, শয়তানের তাওয়া খাঁড়ির মুখ থেকে সিকি মাইল দূরে রয়েছি আমরা।'

খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাচ্ছে হাদী, রানার দিকে একবার তাকাল। হঠাৎ খুব উত্তেজনা বোধ করল রানা। সেটাকে প্রায় উল্লাসও বলা যেতে পারে। ওর এই পরিবর্তন হাদী বোধহয় লক্ষ করল, কমান্ডারের দিকে ফিরে নিঃশব্দে হাসল সে, বলল, 'মাথাটাকে ফাটিয়ে দিয়ে একটা মুড়ির টিনে তুলে এনেছেন, তারপর এখন বিপদে পড়ে আমার সাহায্য চাইছেন?'

'বেশি কথা বলবে না,' ধমক দিল কমান্ডার, তবে কঠিন সুরে নয়। 'বিপদে পড়েছি, সেজন্যে তোমরা দায়ী। হয় তুমি, নয়তো তোমার ওই বন্ধু। লেবানীজ টর্পেডো বোট আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। নিশ্চয়ই কেউ ওদেরকে আগেই খবর দিয়েছে।'

'টর্পেডো বোট, সত্যি?' আবার এক গাল হাসল হাদী। 'তারমানে শমসের লিবান তাহলে আমার কথা বিশ্বাস করেছিল! আমাকে বুঝতে না দিয়ে ঠিকই সে নৌ-বাহিনীর সদর দফতরে ফোন করেছিল!' দুঃসাহসের কোন সীমা নেই, হাত তুলে কমান্ডারের পাঁজরে আঙুলের খোঁচা দিল সে। 'উনি আমার স্যার, সম্মানিত ভদ্রলোক, একজন রিপোর্টার—উনি এর জন্যে দায়ী নন। আমরা মাছ ধরতে বেরিয়েছিলাম, আপনার সাবমেরিন আমার বোটের তলায় চলে আসে।' হঠাৎ হাসতে শুরু করল সে, সে হাসি থামতেই চায় না, চোখে পানি বেরিয়ে আসার অবস্থা হলো।

হাসতে হাসতে দুর্বল হয়ে পড়ল হাদী, তারপর বলল, 'বুঝুন তাহলে, অতি নগণ্য একটা ঘটনা থেকে কি মহা বিপদের সূচনা ঘটতে পারে! ঠিক আছে, এখন আপনি আমার কাছে কি চান? আসুন, একটু দর কষি। সাহায্য করতে পারি, বিনিময়ে কি পাব আমি? দোস্তানায় আপনার বন্ধু আছে, তার কাছ থেকে কিছু একটা এনেছেন আপনি। দিন ওটা আমাকে।'

রানা ভাবল, কমান্ডার হাদীকে ঘুসি মারবে। ভদ্রলোকের বয়েস বেশি নয়, হাদী তাকে খেপিয়ে দিয়েছে। 'তুমি আমার বন্দী,' ঠাণ্ডা, শান্ত সুরে বলল লোকটা। 'তোমাকে যা করতে বলা হবে তা-ই তুমি করবে।'

'তাহলে বলি কি করব আমি? এমন বুদ্ধি দেব, শয়তানের তাওয়ায়

আপনারা যাতে ডুবে মরেন।' আবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল হাদী।

দুম দুম করে দুটো ঘুসি মারল কমান্ডার। একটা লাগল হাদীর নাকে, আরেকটা চোয়ালে। নাক ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। হাদী এক চুল নড়ল না। না নড়ে সে আসলে কমান্ডারকে বুঝতে দিল, পাল্টা আঘাতের কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যে-ই কমান্ডারের পেশীতে ঢিল পড়ল, অমনি তার মুখে একটা ঘুসি মারল সে। ওই এক ঘুসিতেই ছিটকে পড়ে গেল কমান্ডার। সঙ্গে সঙ্গে সেকেন্ড অফিসার তার রিভলবার বের করল। হাদী মারা যাচ্ছে, বুঝতে পেরে লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হলো রানা। কমান্ডার বসল, তারপর টলতে টলতে দাঁড়াল, কাটা ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরছে। বারণ করার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সে। একজন ক্রু পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল হাদীকে। ইতিমধ্যে গ্যাঙওয়ে বেয়ে নিচে নেমে এসেছে নেভিগেটিং অফিসার। সেকেন্ড অফিসারকে সে বলল, 'ওকে মেরে ফেলাটা বোকামি হবে। এই বিপদ থেকে বাঁচতে হলে ওর সাহায্য ছাড়া চলবে না।'

নেভিগেটিং অফিসার হাদীর দিকে ফিরে বলল, 'একা শুধু আমরা মরব না, তোমার স্যার আর তুমিও মারা যাবে। তাহলে সাহায্য করবে না কেন? টর্পেডো বোটটা সারারাত আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। ডোবা কোন পাথরে বা পাহাড়ে বাড়ি না খেয়ে স্রোতের টানে আমরা যদি আধ মাইল এগোতে বা পিছাতে পারি তাহলে পানির ওপর উঠতে পারব। বিপদটাও কেটে যাবে।'

হাদীর জবাব, 'কমান্ডারকে তো বললামই, সাহায্য করতে আমি রাজি আছি, তবে বিনিময়ে দোস্তানা থেকে পাওয়া তথ্যটা আমাকে জানাতে হবে। আর মৃত্যুর কথা যদি বলেন, যে লোক সারাজীবন সাগরে কাটিয়েছে তার আবার সলিল সমাধিতে ভয় কি?'

'আমারও সেই কথা,' বলল রানা। 'দোস্তানা থেকে কোন না কোন ক্ষতিকর তথ্য নিয়ে এসেছেন আপনারা। সেটা কি জানতে হবে আমাদেরকে।'

সেকেন্ড অফিসার রিভলবার হাতে পাহারায় থাকল, নেভিগেটিং অফিসার কমান্ডারের ঠোঁটের ক্ষতটা পরীক্ষা করছে। সিক-বে থেকে ডাক্তার এসে ক্ষতটা পরিষ্কার করল।

হাদীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো রানার। হাদীর চোখে প্রশ্ন। ছোট্ট করে মাথা নাড়ল রানা। যা থাকে কপালে, তথ্যটা না পেলে ইসরায়েলিদের সাহায্য করা যাবে না। উত্তরে মাথা ঝাঁকিয়ে ক্ষীণ একটু হাসল হাদী। গলা চড়িয়ে বলল, 'কাগজগুলো আমি চাই।'

ঝট করে ঘুরে তার দিকে তাকাল কমান্ডার। 'ভুলে যাও। ওগুলো আমরা তোমাকে দেখতে দিতে পারি না।'

'তাহলে আপনার ওপরওয়ালা ওগুলো দেখতে পাবেন না,' ঠাণ্ডা সুরে জবাব দিল হাদী।

কমান্ডার নেভিগেটিং অফিসারের দিকে ফিরে বলল, 'ঠিক আছে, এখানে আমরা আরও আধ ঘণ্টা থাকছি।'

'আশ্চর্য, কমান্ডার!' বলল হাদী। 'আপনি নিজেকে ও নিজের ক্রুদের নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবেন?' রানার দিকে তাকাল সে। 'তাতে অবশ্য আমাদের উদ্দেশ্যই পূরণ হয়, তাই না?'

মিটিমিটি হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা।

চোখে আগুন, একদৃষ্টে হাদীর দিকে তাকিয়ে থাকল কমান্ডার। বোঝা গেল সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল, বলল, 'ঠিক আছে, কাগজগুলো তোমাকে আমি দেখাচ্ছি।' ঘুরল, গ্যাঙওয়ে ধরে দ্রুত পায়ে চলে গেল অফিসার্স কোয়ার্টারের দিকে।

হাদীর দিকে তাকাল রানা, ভাবছে কাগজগুলো দেখে হবেটাই বা কি? ওগুলোর কপি থাকতে পারে, মুখস্থ করাও সম্ভব। 'মুখ বুজে থাকতে অসুবিধে কি? পাথরের সঙ্গে খাক না ধাক্কা,' ফিসফিস করল তার কানে।

'এদিকের স্রোতটা খোলা সাগরের দিকে যাচ্ছে,' গলা খাদে নামিয়ে বলল হাদী। 'পাথরে ধাক্কা খাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, কিন্তু ওরা তা জানে না। আগে কাগজগুলো হাতে পাই, তারপর শর্ত দেব—তথ্যগুলো আমাদের নৌ-বাহিনীর সদর দফতরে ওয়্যায়েরলেসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। সবশেষে অভয় দিয়ে বোঝাতে হবে পানির ওপর উঠলে কোন বিপদ ঘটবে না। যদি ওঠে, আর যদি টর্পেডো বোটটা তখনও আশপাশে থাকে, তাহলেই তো কেল্লা ফতে।'

হাদী নিজের মৃত্যুর পরোয়া করছে না দেখে রানার মত সাহসী ও দেশপ্রেমিক মানুষও অবাক না হয়ে পারল না। সামান্য একজন দরিদ্র জেলে, অথচ দেশের জন্যে কি না করতে পারে—একটা দৃষ্টান্তই বটে।

কমান্ডার ফিরে আসতে একটু দেরি করল। তার হাতে একটা মাত্র কাগজ দেখা গেল। সেটা নেভিগেটিং অফিসারকে দিল সে, নেভিগেটিং অফিসার হাদীকে দিল। 'এবার এদিকে এসে চার্ট দেখে স্রোতটার মতিগতি ব্যাখ্যা করো,' নির্দেশ দিল কমান্ডার।

কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে রানাকে পড়তে দিল হাদী। লেখাগুলো পড়ার সময়ই দু'জনের গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল, বেড়ে গেল পালস রেট। তিনটে জাহাজের অবস্থান, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা ও রঁদেভো উল্লেখ করা হয়েছে। একটা জাহাজ আসছে স্পেন ঘুরে, জিব্রালটার হয়ে—আমেরিকান সৈন্যদের নিয়ে। বাকি দুটো আসছে লোহিত সাগর থেকে, সুয়েজ ক্যানেল হয়ে—একটা জাতিসংঘের চার্টার করা জাহাজ, তাতে আছে ইউএন পীস মিশনের সৈন্যরা, বেশিরভাগই বাংলাদেশী; অপরটা ব্রিটিশ জাহাজ, রয়্যাল নেভীর নাবিকদের নিয়ে ভূমধ্যসাগরে আসছে। অভিন্ন কোন কারণ না-ও থাকতে পারে, জাহাজ তিনটে এক জায়গায় মিলিত হতে যাচ্ছে, অথবা একটা সময় পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি চলে আসবে। কাগজটাকে একটা চার্টই

বলতে হবে, তবে নিচের দিকে কিছু নোট আছে। ওই নোটগুলো না পড়লে ধাঁধাটা রানা ও হাদীর কাছে পরিষ্কার হত না। ধাঁধাটা যখন পরিষ্কার হলো, রানা ও হাদী বিস্ময়ের ধাক্কায় অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না।

নোটগুলোয় পরামর্শ দেয়া হয়েছে, ইসরায়েলিরা যদি তাদের গোপন ঘাঁটি থেকে সাবমেরিন পাঠিয়ে জাতিসংঘ, আমেরিকা আর ব্রিটিশ জাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দিতে পারে, তাহলে এই কুকীর্তির দায় বর্তাবে ইরাকের ওপর। ইরাকের সীমান্তে কোন সাগর নেই, কাজেই ইরাকীদের সাবমেরিন থাকার কথা নয়। এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে—দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় ইসরায়েল যে গোপন সাবমেরিন ঘাঁটি তৈরি করেছে, বাইরে থেকে এসে সেটা যদি কেউ পরীক্ষা করে, তাহলে দেখতে পাবে ওটা ইসরায়েল বাদে যে-কোন আরব রাষ্ট্রেরই হতে পারে। ইরাক বেশিরভাগ অস্ত্র কেনে রাশিয়ার কাছ থেকে, গোপন ঘাঁটিতে ইসরায়েলিরাও রাশিয়ার তৈরি অস্ত্র ব্যবহার করছে—এমনকি আন্তর্জাতিক দালালদের মাধ্যমে তাদের সাবমেরিনগুলোও রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা, সেকেন্ড হ্যান্ড ও পুরানো হলেও। জাহাজ তিনটেকে ডুবিয়ে দেয়ার পর প্রয়োজন মনে করলে গোপন ঘাঁটি থেকে সরে যাবে ইসরায়েলিরা, এবং এমন কিছু তথ্য ছড়িয়ে দেবে যাতে গোপন ঘাঁটির অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে যায়। এই কাজ করা সম্ভব হলে ইরাকের সঙ্গে জাতিসংঘের আলোচনা বাতিল হয়ে যাবে, বিশ্ব জনমত চলে যাবে ইরাকের বিরুদ্ধে, আমেরিকা আর ব্রিটেন কালবিলম্ব না করে ইরাকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারা শুধু ইরাকের সামরিক ঘাঁটি আর প্রাসাদগুলোয় বোমা ফেলে সন্তুষ্ট হবে না, ইরাককে আক্ষরিক অর্থেই ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।

রানার প্রথম প্রতিক্রিয়া, 'আপনারা মানুষ, না পিশাচ? আমেরিকা আর ব্রিটেন আপনাদের পরম বন্ধু, অথচ শুধু ইরাককে ধ্বংস করার জন্যে সেই বন্ধুদের জাহাজ ডুবিয়ে দেয়ার প্ল্যান করেছেন?'

'সেই প্রবাদটা শোনেননি?' নেভিগেটিং অফিসার মুচকি হেসে বলল, 'যুদ্ধ আর প্রেমে কোন নীতি থাকে না?'

কাগজটার ওপর আরেকবার চোখ বুলাল রানা। জাহাজগুলো কাছাকাছি আসার তারিখ দেয়া হয়েছে বাইশে ফেব্রুয়ারি, রবিবার; সময়, ১৩·৩০।

ইসরায়েলি নেভীর ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ঘেমে যাচ্ছে রানা। এর সঙ্গে শুধু বোতাম টিপে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার তুলনা চলতে পারে। এমন পাশবিকতা কল্পনা করাও কঠিন।

বিপদটা যেন ধীরে ধীরে খোলস মুক্ত হচ্ছে। রানা হঠাৎ চিন্তা করল, আমেরিকা ও ব্রিটেনের যা হবার হোক, পীস মিশনের বাংলাদেশীদের কি হবে? 'এ কি সম্ভব?' হাদীকে জিজ্ঞেস করল ও। 'ইসরায়েলিরা তিন-তিনটে জাহাজকে সত্যি ডুবিয়ে দিতে পারবে?'

'পারবে, ওদের গোপন ঘাঁটিতে যদি যথেষ্ট সংখ্যক সাবমেরিন থাকে,' জবাব দিল হাদী।

নেভিগেটিং অফিসার ধমক দিল, 'ফিসফাস বন্ধ করুন! এবার তথ্যগুলো দিন আমাদের।'

গ্যাঙওয়ে ধরে কন্ট্রোল রুমের দিকে পা বাড়াল হাদী। 'অবশ্যই,' বলল সে। 'তবে তার আগে বৈরুতে একটা মেসেজ ট্র্যান্সমিট করার সুযোগ চাই আমি।'

কমান্ডারের চোখ সরু হয়ে গেল। 'আমার কথা আমি রেখেছি। এবার তোমার কথা তুমি রাখো।'

'আপনাদেরকে পথ দেখিয়ে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয়ার আগে কেন এই তথ্য চেয়েছিলাম তা আপনি জানেন,' জবাব দিল হাদী। 'আমি চেয়েছিলাম আমাদের শত্রুপক্ষ যাতে তথ্যটা কাজে লাগাতে না পারে। আপনার কাছে যদি এই কাগজটার কপি থাকে বা তথ্যগুলো মুখস্থ করে রেখে থাকেন···'

বাধা দিল কমান্ডার, 'কপিও রাখিনি, মুখস্থও করিনি।'

'সেক্ষেত্রে মেসেজটা বৈরুতে পাঠাতে দিতে আপনার আপত্তি থাকার কোন কারণ নেই।'

কমান্ডার খেপে গেল। 'তোমার দুঃসাহস আর স্পর্ধা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে! জানো, তোমাকে আমি এই মুহূর্তে নরকে পাঠাতে পারি···'

'জানি, পিছু নিয়ে আপনাকেও সেখানে যেতে হবে।'

নেভিগেটিং অফিসার বলল, 'তোমার কি মরার ভয়ও নেই?'

রানা বলল, 'আপনাদের প্ল্যান দেখলে শয়তানও আঁতকে উঠবে। ওই তিনটে জাহাজে কয়েক হাজার মানুষ আছে, সবাই তারা মারা যাবে। আমরা দু'জন মারা গেলে ওরা যদি বেঁচে যায়, আমাদের মরাই ভাল।'

'তাহলে তাই মরুন!' খেঁকিয়ে উঠল কমান্ডার। কর্কশ গলায় একটা নির্দেশ দিল সে। নির্দেশ দেয়ার পর রানা ও হাদীর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। সাবমেরিনের ট্যাঙ্কে কমপ্রেসড এয়ার ঢোকার জোরাল হিসহিস আওয়াজ ভেসে এল। বাতাস ঢুকে ট্যাঙ্ক থেকে সমস্ত পানি বের করে দিচ্ছে।

'এখনও তথ্যগুলো দেবেন না বলে ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল কমান্ডার, হিংস্র পশুর মত লাগছে তাকে। 'যদি না দেন, সাবমেরিন নিয়ে সারফেসে উঠব আমরা, টর্পেডো বোট আক্রমণ করার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও।' রানা ও হাদী, দু'জনের কেউই যখন কোন উত্তর দিল না, কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'গান ক্রু, স্ট্যান্ড বাই!' হিব্রু ভাষায় নির্দেশ দিল। তারপর কনিং টাওয়ার বেয়ে ওপর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরবর্তী পাঁচ মিনিটকে রানার জীবনের সবচেয়ে অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা বলা যেতে পারে। সাবমেরিনের ভেতর উত্তেজনা আর উদ্বেগ যেন নিরেট কোন বস্তু, ছোঁয়া যায়। পরিবেশ অত্যন্ত গুমোট হয়ে উঠেছে, দরদর করে ঘামছে রানা। কমপ্রেসড এয়ারের হিসহিস আওয়াজ ক্রমশ কমে এল।

সেকেন্ড অফিসার ট্রিম অ্যাডজাস্ট করল। সাবমেরিনের খোল এখন কাত হয়ে নেই, সম্ভবত সারফেসের কাছাকাছি উঠে এসেছে, পেরিস্কোপটা হয়তো এখন পানির ওপর। কমান্ডারকে কল্পনার চোখে দেখতে পেল রানা—পেরিস্কোপে চোখ রেখে টর্পেডো বোটটাকে খুঁজছে। ওর মনে একটা প্রশ্ন জাগল, ডিজেল এঞ্জিনও কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? তা যদি হয়ে থাকে, বাঁচার সত্যি কোন উপায় নেই।

অকস্মাৎ কমান্ডারের চিৎকার ভেসে এল, 'ব্লো অল ট্যাঙ্কস! সারফেস!' এবার প্রবল বেগে কমপ্রেসড এয়ার ঢুকল ট্যাঙ্কে। সাবমেরিন এত দ্রুত ওপরে উঠছে, ডেক থেকে সাগরের পানি নেমে যাবার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ওরা। গান ক্রুরা বাঁদরের মত লাফ দিয়ে কনিং টাওয়ারে ভিড় করল। ধাতব শব্দ তুলে খুলে গেল হ্যাচ, ওদের মাথার ওপর পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তারপর একটা ডিজেল এঞ্জিন জ্যান্ত হলো, বোতে ঢেউ লাগায় কাঁপতে শুরু করল সাবমেরিন।

মনে মনে একটা হিসাব করল রানা। সাবমেরিনটা পুরানো, রাশিয়ার তৈরি—সারফেস স্পীড হবার কথা আঠারো নট। কিন্তু সেটা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে নয় কি দশ নটে, দায়ী স্টারবোর্ডের প্রপেলার শ্যাফট। কিন্তু টর্পেডো বোটের স্পীড চল্লিশ নটেরও বেশি। তারমানে ওদেরকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। এঞ্জিন রুম থেকে বেল বাজার আওয়াজ ভেসে এল। নিঃসঙ্গ এঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে, সেই সঙ্গে গোটা সাবমেরিন ঝাঁকি খাচ্ছে বিরতিহীন। তারপর অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ বিস্ফোরণের শব্দ হলো, ছিটকে প্রায় পড়ে যাবার অবস্থা হলো সবার। প্রথমে রানার মনে হলো টর্পেডো আঘাত করেছে। তাল মাত্র ফিরে পেয়েছে, বিস্ফোরণটা আবার ঘটল। রানা বুঝতে পারল, আফটার গান থেকে ফায়ার করা হচ্ছে। তারমানে টর্পেডো বোট ওদেরকে দেখতে পেয়েছে। ওরা এখন অ্যাকশনে!

কারও মুখে কথা নেই। হাদী গম্ভীর ও নির্লিপ্ত। রানা শান্ত ও ঠাণ্ডা। দু'জনেই জানে, নিয়তি ওদেরকে নিয়ে খেলছে। এক মিনিট, দু'মিনিট করে বিশ মিনিট কেটে গেল। হাদীর নির্লিপ্ত ভাব লক্ষ করে আরেকবার তাজ্জব বনে গেল রানা। যে লোক আগে কখনও সাবমেরিনে চড়েনি, এই অবস্থায় তার তো কেঁদে ফেলার কথা।

একনাগাড়ে নয়, থেমে থেমে ফায়ার করা হচ্ছে। কমান্ডার এক সময় নির্দেশ দিল, 'স্টারবোর্ডের দিকে আট পয়েন্ট ঘোরো।' তারমানে ডান দিকে ঘুরতে বলা হলো। রানা ধরে নিল, এবার শেষ। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাবমেরিনকে ঘোরানোর একটাই অর্থ থাকতে পারে—ওদের দিকে একটা টর্পেডো ছুটে আসছে।

তারপর কনিং টাওয়ারের মাথা থেকে গানারদের উল্লাসধ্বনি ভেসে এল। রানার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল, ধরে নিল টর্পেডো বোট বোধহয় ডুবে যাচ্ছে। আসলে সাবমেরিনের গানাররা তৃতীয় বারের চেষ্টায় লক্ষ্যভেদ করতে

পেরেছে, টর্পেডো বোটের এঞ্জিনের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে, আহত হয়েছে একজন লোক—তবে এ-সব রানা ক্রু আর অফিসারদের আলাপ থেকে পরে জানতে পারবে।

পোর্টসাইডের লুকআউট রিপোর্ট করল, ওদিকে একটা জাহাজের বো দেখা যাচ্ছে। ঠিক বো নয়, সে আসলে সাদা বো ওয়েভ দেখতে পেয়েছে। সাবমেরিনের নিচ থেকে রানা ও হাদী সী বুট পরা লোকজনের ছুটোছুটির আওয়াজ শুনতে পেল, ওদের মাথার দিক থেকে ভেসে আসছে। কনিং টাওয়ার থেকে হুড়মুড় করে নিচে নেমে এল তারা। বিকট আওয়াজ তুলে বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচ। দ্বিতীয়বার ক্র্যাশ ডাইভ দিল সাবমেরিন।

এবার সারফেস আর সাগরের তলার মাঝখানে থামল না ওরা, সরাসরি বালির বিস্তৃতিতে নেমে এসে স্থির হলো সাবমেরিন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ডেপথ চার্জের কুৎসিত আওয়াজ শুনতে পেল ওরা, তবে সবগুলোই ভেসে এল কমবেশি দূর থেকে। খুব কাছে একটাও বিস্ফোরিত হয়নি।

শুরু হলো দীর্ঘ অপেক্ষার পালা।

সময় যখন আর কাটতে চাইছে না, ক্রু আর নাবিকরা তাস খেলতে বসে গেল। রানা আর হাদীর ওপর কমান্ডার খেপে আছে, তবে কি মনে করে কে জানে, ইচ্ছে হলে ওরা খেলতে পারে বলে জানাল। রাত সাড়ে তিনটের সময় শুরু হলো খেলা, বিভিন্ন বাধাবিঘ্ন ও খেলোয়াড় বদলের মধ্য দিয়ে চলল পরদিন মাঝরাত পর্যন্ত। বাঙ্কে কেউ শুয়ে আছে, কেউ হেলান দিয়ে বসে, টেবিল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে স্টোর চেম্বার থেকে আনা কাঠের একটা বাক্স। আলোটা ঠিক ওদের মাথার ওপর, ফলে বাঙ্কের ভেতর পুরোপুরি অন্ধকার থাকায় কারও চেহারা দেখা যাচ্ছে না, এমনকি তাস ফেলার জন্যে কেউ যখন ঝুঁকে পড়ে তখনও শুধু তার চাঁদিটাই দেখা যায়।

নেভিগেটিং অফিসারও এক সময় খেলতে বসে গেল। দোভাষীব দায়িত্বও পালন করল সে। রানা ও হাদী প্রথম থেকেই গোপন করে রেখেছে যে ওরা হিব্রু জানে। ওরা বন্দী হলেও, ক্রু ও নাবিকরা ওদের সঙ্গে ভালই ব্যবহার করল। রানার পকেটে অল্প কিছু মার্কিন ডলার ছিল, হাদীর কাছে কিছুই নেই, ফলে ধার দিতে হলো। ক্রুদের কাছে ইসরায়েলি কারেন্সি ছাড়া আর কিছু নেই, তবে ডলার ভাঙিয়ে দিতে রাজি হলো তারা।

ব্রেকফাস্টের পর ঘুম পাবার অভিনয় করল রানা, বোঝাতে চায় রাত জাগতে অভ্যস্ত নয়। হাদীরও ঘুম পায়নি, খেলায় জিতে আরও বরং তাজা আর প্রাণবন্ত লাগছে তাকে। তবে মাথার ক্ষতটা খুব বিরক্ত করছে বলে অভিযোগ করায় সিক-বের ডাক্তারকে একবার ডাকা হলো। ডাক্তার ওর ক্ষতটা পরীক্ষা করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল, কয়েকটা ট্যাবলেটও দিয়ে গেল। খেলার মধ্যে চিৎকার-চেঁচামেচি সে-ই বেশি করল। মাঝে-মধ্যে কার্ড চুরি নিয়ে হাতাহাতি হবার অবস্থা হলো, তবে বেশিরভাগ সময় হাস্য-কৌতুকের মধ্যেই কাটল। দেখে বোঝার উপায় থাকল না যে ওরা দু'জন ইসরায়েলিদের পরম

শত্রু।

খেলা ভঙ্গ হবার পর দুপুরে কেউ কিছু না খেয়েই যে যার বাঙ্কে নেতিয়ে পড়ল। ঘুমোবার চেষ্টা করলেও রানার ঘুম আসছে না। সাগরের তলায় অচল হয়ে পড়ে থাকার পুরোটা সময় এঞ্জিনিয়াররা পোর্ট ইলেকট্রিক মোটর মেরামতের কাজে ব্যস্ত থাকল। দু'বার স্টার্ট নিল সেটা, কিন্তু প্রতিবারই কর্কশ ধাতব আওয়াজ তুলে বন্ধ হয়ে গেল। বিকেলের দিকে হাল ছেড়ে দিল এঞ্জিনিয়াররা। তারাও একটু ঘুমিয়ে নেয়ার জন্যে যে যার বাঙ্কে উঠল।

ঘুমাল না শুধু একজন, কমান্ডার। শত্রু হলেও, তার দায়িত্ব বোধ লক্ষ করে মুগ্ধ হলো রানা। তবে দুঃসংবাদ হলো, রানাকে লোকটা কেন যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছেন। বারবার দেখে যাচ্ছে রানা জেগে আছে নাকি ঘুমিয়ে পড়েছে।

মাঝরাতের খানিক পর পর্যন্ত সাগরের তলায় থাকল ওরা। ট্যাঙ্কে কমপ্রেসড এয়ার ঢোকাবার নির্দেশ যখন এল, পরিবেশ ইতিমধ্যে এমন গুমোট হয়ে উঠেছে যে শ্বাস নিতে কষ্ট পাচ্ছে সবাই।

পেরিস্কোপ গভীরতায় উঠে এল সাবমেরিন। অল ক্লিয়ার রিপোর্ট দিল কমান্ডার, অবশেষে সারফেসে উঠল ওরা। কনিং টাওয়ারের হ্যাচ খুলে ফেলা হলো, সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকল সাবমেরিনে। তাজা বাতাস যে প্রাণ ধারণের জন্যে কতখানি প্রয়োজন, সবাই তা উপলব্ধি করতে পারল। ডেক অগভীর পানিতে ডুবে আছে, আট নট গতিতে এগোচ্ছে সাবমেরিন। রাতের আকাশ মেঘে ঢাকা, তবে মেঘ ভেদ করে চাঁদের ক্ষীণ আলো নেমে এসেছে।

'আমরা উত্তর দিকে যাচ্ছি,' ফিসফিস করল হাদী।

'কি করে বুঝলে?'

'চাঁদের অবস্থান দেখে।'

'কিন্তু ওরা উত্তর দিকে যাবে কেন? প্রপেলার শ্যাফটে ফাটল দেখা দিয়েছে, একটা মোটর অচল হয়ে পড়েছে, ওরা তো এখন মেরামতের জন্যে ইসরায়েলে ফিরতে চাইবে, আর সেটা দক্ষিণ দিকে।'

'পানির তলা দিয়ে সাবমেরিন চালাতে পারছে না, পানির ওপর দিয়ে তেল আবিবে পৌঁছুতে চাইলে ঝুঁকি নিতে হবে—তার মধ্যে পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার ঝুঁকিও আছে।'

'তুমি বলতে চাইছ ওদের গোপন সাবমেরিন ঘাঁটিটা উত্তর দিকে কোথাও?'

'আমার তো তা-ই ধারণা। সেটা সাইপ্রাসের কোথাও হলেও আমি আশ্চর্য হব না।'

তিনজন গার্ড পাহারা দিচ্ছে ওদেরকে, ওরা যাতে সাগরে লাফিয়ে পড়তে না পারে। 'আর বেশি তাজা বাতাস খাবার দরকার নেই,' বলে ওদেরকে ডেক থেকে নিচে নামিয়ে আনল তারা। ঢেউয়ের আঘাতে দোল খাচ্ছে

সাবমেরিন, কনিং টাওয়ারের মই বেয়ে নিচে নামতে সময় লাগল। বাঙ্কে ফিরে এসে শুলো রানা, শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙার পর রানা বুঝতে পারল এঞ্জিন থেমে গেছে। সাবমেরিনের সামনের দিকে একটা ব্যস্ত ভাব লক্ষ্য করল ও। বাঙ্ক থেকে ঝুঁকে নিচে, হাদীর বাঙ্কে তাকাল, জানতে চাইল, 'কি ঘটেছে?'

'বলতে পারছি না, স্যার,' জবাব দিল হাদী। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আমার ধারণা, তাকরির উপকূল থেকে এখনও আমরা সরতে পারিনি।'

'কি করে বুঝলে?'

জবাবে মুঠো করা একটা হাত রানার চোখের সামনে তুলে খুলল হাদী। তার তালুতে চকচকে একটা সিলভার ওয়াচ দেখতে পেল রানা— পকেট ঘড়ি। 'এখন বাজে মাত্র দুটো। মাঝরাতের খানিক পর রওনা হই আমরা। প্রায় পনেরো মিনিট হলো সাবমেরিন স্থির হয়ে আছে।'

'কি ঘটছে বলে তোমার ধারণা? কমান্ডার কি সেই চার্টটা অন্য কোন বোটে পাচার করছে?'

হাদী কথা বলল না, কারণ গ্যাঙওয়ের কাছাকাছি একটা বাঙ্ক থেকে নেমে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে একজন গার্ড। ওই একজনই, আশপাশে আর কাউকে পাহারায় দেখা যাচ্ছে না। কনিং টাওয়ারের হ্যাচ এখনও খোলা। গার্ডকে কাবু করতে পারলে তার রিভলবারটা ওদের হাতে চলে আসে। হাতে রিভলবার থাকলে ট্যাঙ্কের কন্ট্রোল দখল করা সম্ভব হতে পারে। তখন সাবমেরিনটাকে ডুবিয়ে দেয়া যাবে। কনিং টাওয়ারের হ্যাচ খোলা থাকায় মারা যেতে খুব বেশি সময় লাগবে না। রানার চিন্তা-ভাবনা শেষ হয়নি, কনিং টাওয়ারের মই বেয়ে হুড়মুড় করে নেমে আসতে দেখা গেল ক্রু আর নাবিকদের। সবার শেষে নামল কমান্ডার। হ্যাচ বন্ধ করে দেয়া হলো। ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে নিজেকে তিরস্কার করল রানা। সময় থাকতে প্ল্যানটা নিয়ে চিন্তা করা উচিত ছিল।

তলিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো, ট্যাঙ্কে পানি ঢোকার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেল ওরা। সামনের দিক থেকে ঘষা খাওয়ার কর্কশ একটা শব্দ ভেসে এল, কারণটা রানা বুঝতে পারল না। সাবমেরিন ধীরে ধীরে নিচে নামল। তারপর সব কিছু স্থির হয়ে গেল। কমান্ডার ইতিমধ্যে কনিং টাওয়ারের কাছ থেকে সরে এসেছে, কন্ট্রোল রুমের একটা হুক থেকে এয়ারফোন নামিয়ে কথা বলছে কার সঙ্গে যেন। নিচু স্বরে কথা বলছে, তাই মাত্র দুটো শব্দ ধরতে পারল রানা—'মোটরস' আর 'ফিক্সড'। ঘষা খাওয়ার আওয়াজটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল।

'আমরা পুব দিকে মুখ করে আছি,' ফিসফিস করল হাদী।

'তার মানে লেবানীজ উপকূলের দিকেই,' বলল রানা, গলায় অবিশ্বাস।

মাথা ঝাঁকাল হাদী।

দু'বার মনে হলো সাগরের তলার সঙ্গে বাড়ি খেলো সাবমেরিন। মোটর

চুপ করে থাকলেও, রানার মনে হলো সামনের দিকে এগোচ্ছে ওরা। হঠাৎ ওদের বাঙ্কের ঠিক পিছনে, খোলের সঙ্গে কিছু একটার সংঘর্ষ ঘটল। খুব জোরে ঝাঁকি খেলো সাবমেরিন। আবার স্থির হয়ে গেল ওটা। ট্যাঙ্কে বাতাস ভরা হলো, সাগরের তলা থেকে সামান্য একটু ওপরে উঠল ওরা।

এয়ারফোন হুকে ঝুলিয়ে গ্যাঙওয়েতে বেরিয়ে এলে কমান্ডার। 'সবাইকে অভিনন্দন, ডিয়ার বয়েজ,' বলল সে। 'আমরা পৌঁছে গেছি।'

ক্রু আর নাবিকদের উল্লাস দেখে কে। সবাই হাততালি দিল, তারপর নাচানাচি শুরু হলো। যে যার স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, রানা ও হাদীর গার্ডকে ধাক্কা দিয়ে কনিং টাওয়ারের দিকে ছুটছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে খালি হয়ে গেল সাবমেরিনের ভেতরটা। রিভলবার নেড়ে ওদের দু'জনকে সামনে বাড়ার ইঙ্গিত করল গার্ড। বাঙ্ক থেকে নেমে কনিং টাওয়ারের দিকে এগোল ওরা।

সাবমেরিনের ব্রিজে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে গেল রানা। ওর ধারণা ছিল কোন জাহাজের পাশে ভিড়েছে ওরা। কয়েকটা আইডিয়াই মাথায় ঢোকে। বেসে ফেরার ঝামেলা আর ঝুঁকি এড়াতে হলে সাপ্লাই শিপের সাহায্য নিতেই হবে, জানত ও। কাজেই ধরে নিয়েছিল ইসরায়েলিরা ফলস বটম সহ কোন ধরনের জলযান তৈরি করেছে, তাতেই উঠে এসেছে ওদের সাবমেরিন। সেজন্যেই বোধহয় প্রথমে ওটাকে ডুব দিতে হয়েছে। কিন্তু যা দেখল তার সঙ্গে ওর ধারণার কোন মিল খুঁজে পাওয়া গেল না। আসল ব্যাপারটা যেমন অকল্পনীয় তেমনি চমকপ্রদ।

তিন

সাবমেরিন ভেসে আছে অতিকায় এক গুহার ভেতর। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত প্রায় দেড়শো গজ লম্বা। তবে চওড়ায় খুব বেশি হলে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট। ছাদ প্রকাণ্ড টানেলের মাথার দিকটার মত, খিলান আকৃতির, চল্লিশ ফুট উঁচু, বিশাল সব ইস্পাতের কড়ি দিয়ে শক্ত আর মজবুত করা। পুরো জায়গাটা উজ্জ্বল আর্ক লাইটের আলোয় ভেসে যাচ্ছে, চারদিক থেকে ভেসে আসছে দৈত্যাকার মেশিনারির যান্ত্রিক গুঞ্জন। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য, হতভম্ব হয়ে পড়ল রানা। সাবমেরিনের কমান্ডার সেটা খেয়াল করতে পেরেই ব্রিজে ওর পাশে এসে দাঁড়াল, কথাগুলো ইংরেজিতে রানাকে বলার সময় তার কণ্ঠে গর্ব ও আত্মতৃপ্তির সুরটুকু চাপা থাকল না। 'ইসরায়েলের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে দুনিয়ার কারও কোনও ধারণা নেই। ইসরায়েলকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে শত্রুরা, মুসলিম প্রধান দেশগুলো,

তাদের নৌ-বাহিনীর তৎপরতার ওপর সারাক্ষণ আমরা কড়া নজর রাখছি।'

'কিন্তু লেবাননের পাশেই তো ইসরায়েল,' বলল রানা, 'স্বদেশের নিরাপদ জায়গা ছেড়ে বিদেশের মাটিতে কেন আপনারা ঘাঁটি তৈরি করলেন?'

'উত্তরটা পানির মত সহজ,' বলে হাসল কমান্ডার। 'আমরা দুর্বল প্রতিবেশী চাই। আর প্রতিবেশীকে দুর্বল করতে হলে চাই যুদ্ধ। কিন্তু সে যুদ্ধ আমরা লড়ব না, আমাদের হয়ে লড়বে ব্রিটেন আর আমেরিকা।'

'অথচ আপনারা ব্রিটেন আর আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজ ডুবিয়ে দেয়ার প্ল্যান করেছেন!'

'করেছি, কারণ তা না হলে ইরাক আক্রমণ করার যে সুযোগটা তৈরি হয়েছে সেটা মাঠে মারা যাবে,' জবাব দিল কমান্ডার। 'ব্রিটেন আর আমেরিকা শুধু আমাদের স্বার্থে ইরাক আক্রমণ করতে চাইছে না, তাদের নিজেদের স্বার্থও আছে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী তিন সদস্য চীন, রাশিয়া আর ফ্রান্স মধ্যপ্রাচ্যের অস্ত্রের বাজার দখল করে নিয়েছে, সেই বাজার বাকি দুই স্থায়ী সদস্য পুনর্দখল করতে চাইছে। নতুন তৈরি কিছু সামরিক সরঞ্জাম কেমন কাজ করে সেটাও এই সুযোগে পরীক্ষা করে নিতে চাইছে ওরা।

'স্বভাবতই চীন, রাশিয়া আর ফ্রান্স চাইছে না যুদ্ধটা হোক, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান। জোর কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। আমরা চাইছি না কূটনৈতিক তৎপরতা সফল হোক। এখন ভেবে দেখুন, ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেন, আমেরিকা আর জাতিসংঘের তিনটে জাহাজ যদি অজ্ঞাতপরিচয় সাবমেরিনের হামলায় ডুবে যায়, ফলাফলটা কি হবে? ইসরায়েলের নৌ-বাহিনী দায়ী, এ-কথা কেউ কি বিশ্বাস করবে?'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল কমান্ডার। রানা কথা বলছে না।

'ব্রিলিয়ান্ট প্ল্যান, তাই না?' হাসি থামিয়ে বলল কমান্ডার। 'যুদ্ধ আমরা চাই, চাই ইরাককে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হোক। জাহাজ তিনটেকে ডুবিয়ে দিয়ে প্রতিক্রিয়ার জন্যে অপেক্ষা করব আমরা, যদি দেখি কারা দায়ী তা জানার জন্যে তদন্ত শুরু হয়েছে, এই ঘাঁটি ছেড়ে ইসরায়েলে ফিরে যাব, কয়েকটা সাবমেরিন রেখে। কাছাকাছি সাগরে এমন কিছু প্রমাণ রেখে যাব, এই ঘাঁটিটা খুঁজে বের করতে আমেরিকা বা ব্রিটেনের যাতে কোন অসুবিধে না হয়। এখানে এসে তারা কি দেখবে? দেখবে সাবমেরিন ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম সবই রাশিয়ার তৈরি, গায়ে আরবী হরফে সাঙ্কেতিক পরিচয় লেখা।' মাথা নাড়ল কমান্ডার। 'ইসরায়েলকে দায়ী করার কোন উপায় থাকবে না।'

কমান্ডার কথা বলছে, চোখ ঘুরিয়ে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিচ্ছে রানা।

'এটা একটা কমপ্লিট ন্যাভাল সাবমেরিন বেস। আমাদের এমন কি নিজস্ব ফাউন্ড্রিও আছে।'

সাবমেরিনের ক্রুরা, সব মিলিয়ে প্রায় ষাটজন, ফরওয়ার্ড ডেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। বোর দিকে সামনে তিনজন লোক বড় সিলিন্ডার আকৃতির একটা বয়া নিয়ে ব্যস্ত, ওই বয়ার সঙ্গেই বাঁধা রয়েছে সাবমেরিনটা। বয়াটার সঙ্গে লম্বা চেইন আছে, শক্তিশালী একটা ডাংকি-এঞ্জিনের সঙ্গে কয়েক পাক জড়ানো, অপরপ্রান্তটা পানির তলায় নেমে গেছে। রানা বুঝতে পারল এই চেইনের সাহায্যে টেনেই সাবমেরিনটাকে জলমগ্ন প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢোকানো হয়েছে, তারপর গাইড করা হয়েছে সারফেসে উঠে আসতে।

'ঢোকার বা বেরুবার একটা মাত্র পথ,' বলল রানা। 'শত্রুরাষ্ট্রের কোন ইন্টেলিজেন্স এই হাইড-আউট সম্পর্কে জানতে পারলে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের অবস্থা হবে আপনাদের।'

হেসে উঠল কমান্ডার। 'লেবাননের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ নেই বললেই চলে। ওদের এমন কি সাবমেরিনও নেই। সাগরের তলা দিয়ে আমাদের সাবমেরিন আসা-যাওয়া করছে, কেউ কিছু দেখতেই পাচ্ছে না। তবে যদি ভেবে থাকেন আপনি এখান থেকে বেরিয়ে দুনিয়ার সবাইকে সব কথা বলে দেবেন, ভুলে যান।' হাদীর দিকে তাকালেন তিনি। 'তুমিও ভুলে যাও। এখানে গাধার খাটনি খাটতে হবে তোমাদের। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত।'

'আমি একটা ভবিষ্যদ্বাণী করি? বিশ্বাস করুন, এখানে যারা আছে তাদের সবার নিয়তি আমি পড়তে পারছি। যুদ্ধ হোক বা না হোক, সবাই আমরা মারা যাব।' হাদী গম্ভীর। 'আমিও, আপনিও।'

কমান্ডারের ঘাড়ের পেশীতে টান পড়ল। কি ঘটতে যাচ্ছে আন্দাজ করতে পেরে আড়ষ্ট হয়ে উঠল রানা। কিন্তু কে জানে কি ভেবে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল কমান্ডার, ব্রিজ থেকে ডেকে নেমে গেল।

'ভদ্রলোককে তুমি খেপিয়ে তুলছ,' বলল রানা।

প্রকাণ্ড কাঁধটা ঝাঁকাল হাদী। 'কি আসে যায় তাতে,' জবাব দিল সে। 'ওই ব্যাটা নয়, এই জায়গার চার্জে অন্য কেউ আছে। সাবমেরিন মেরামত হয়ে গেলেই আবার সাগরে ফিরে যেতে হবে ওকে।'

'আমরা শান্ত ও নিরীহ, এটা ওদেরকে বিশ্বাস করাতে হবে,' বলল রানা। 'বিশেষ করে যে ভদ্রলোক চার্জে আছেন তাঁকে চটিয়ো না। ভুলে যেয়ো না এখান থেকে বেরুতে হবে আমাদের।'

রানার দিকে একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল হাদী। 'আমি জানি, আপনি শুধু বেরুবার কথা ভাবছেন না, স্যার। আপনি অন্য আরও কি যেন ভাবছেন। আপনার চোখের দৃষ্টি আমি পড়তে পারছি।'

এই সময় এঞ্জিনের ভট-ভট আওয়াজ শোনা গেল। প্রধান গুহা থেকে বেরিয়ে যাওয়া অনেকগুলো খিলান-পথের একটা থেকে বেরিয়ে এল ছোট বোটটা। এ-ধরনের অনেকগুলো টানেলের ভেতর সাবমেরিনের ধূসর স্টার্ন দেখতে পাচ্ছে রানা। বয়াটাকে ইতিমধ্যে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সাবমেরিন থেকে ভারী এক প্রস্থ রশি ফেলা হলো বোটে, বোটটা এখন টাগ হিসেবে

কাজ করছে। রশি বাঁধার কাজ শেষ হতেই সাবমেরিনটাকে টেনে নিয়ে চলল।

শেষ প্রান্তে গুহাটা হঠাৎ চওড়া হয়ে বিশাল অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে। এই অর্ধবৃত্ত থেকে কম করেও সাতটা গুহায় যাওয়া যায়। প্রতিটি এত বেশি চওড়া যে ভেতরে একটা সাবমেরিন ঢোকার পরও ডকইয়ার্ডের জন্যে প্রশস্ত জায়গা অবশিষ্ট আছে। প্রতিটি গুহা ইংরেজি আর আরবীতে নম্বর দেয়া। ইউ-থারটিফোর, রানারা যে সাবমেরিনে চড়ে এসেছে, পাঁচ নম্বর বার্থে ঢুকল। কয়েকজন লোকের হাতে বোট হুক রয়েছে, ডকের দু'পাশের পাথুরে গায়ে সাবমেরিন যাতে ঘষা না খায় সেটা নিশ্চিত করাই তাদের কাজ। খিলান আকৃতির প্রবেশপথ পেরুচ্ছে কনিং টাওয়ার, রানা একটা মিটার গজ-এর মাথা দেখতে পেল, পানি থেকে উঠে এসেছে। ডকের দুই পাশে ভাঁজ করা শক্তিশালী গেটও দেখা গেল। এখন ভরা জোয়ার বলেই মনে হলো। ভাটার সময় প্রতিটি বেসিন থেকে সমস্ত পানি বের করে দিয়ে গেট লাগিয়ে দেয়া হয় ড্রাই ডক-এর সুবিধে পাবার জন্যে। গোটা আয়োজনটা আরেকবার রানার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হলো।

সাবমেরিনকে বাঁধার কাজ শেষ হতে ডকসাইড ধরে পথ দেখানো হলো ওদেরকে, খানিকটা ঢাল বেয়ে একটা গ্যালারিতে পৌঁছুল ওরা, সেটা সবগুলো ডকের পিছনদিক জুড়ে বিস্তৃত। ডান দিকে ঘুরল ওরা, ছয় ও সাত নম্বর ডককে পাশ কাটাল, একটা লম্বা র‍্যাম্প বেয়ে ওপরে উঠছে। র‍্যাম্পটা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে বাঁ দিকে চলে গেছে। এই পথ ধরে দুটো আপার গ্যালারির প্রথমটায় চলে এল ওরা। এখানে রয়েছে কয়েক শো লোকের স্লীপিং কোয়ার্টার ও রেস্টরুম। বিলিয়ার্ড, ক্যারম, পিং পং ইত্যাদি ইনডোর গেম খেলার জন্যে আলাদা আলাদা কামরা। কিচেন আর টয়লেটও আছে। গোটা জায়গাটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, কোথাও এতটুকু স্যাঁতসেঁতে ভাব নেই।

সাবমেরিনের প্রত্যেক ক্রুকে একটা করে কিউবিকল বরাদ্দ করা হলো, তাতে একটা করে ক্যাম্প বেড। রানা আর হাদীকে একজন পাহারাদারের দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হলো। গার্ড ওদেরকে আপার লেভেল গ্যালারিতে নিয়ে এল, গার্ডরুমে ঢুকিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল সিভিল ড্রেস পরা খর্বকায় এক লোকের সঙ্গে। টেবিলের ওপর রাখা অ্যাশট্রেটা ভরে আছে, লোকটার ঠোঁটেও সিগারেট ঝুলছে। মাথাটা প্রায় চৌকো, মুখের তুলনায় চোয়াল বড়, চোখ দুটো পরস্পরের খুব কাছাকাছি। ওদের সঙ্গে ভালই ব্যবহার করল সে, কিন্তু রানার মস্তিষ্কে বিপদ সঙ্কেত বেজে উঠেছে। ওর সন্দেহ হলো, লোকটা ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স মোসাড-এর এজেন্ট। পরে জানা যাবে সন্দেহটা সত্যি কি না। আসলে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ এমন কি নিজেদের লোককেও বিশ্বাস করে না, এই গোপন সাবমেরিন ঘাঁটিতে কমপক্ষে চারজন মোসাড এজেন্ট কাজ করছে।

রানা জানে না, এই চারজন মোসাড এজেন্ট ছাড়াও প্রতিটি সাবমেরিনে

মোসাডের একজন করে বেতনভুক ইনফর্মার আছে।

মোসাডের চারজন এজেন্টের কাজ হলো ঘাঁটিতে বন্দীদের আনা হলে তাদেরকে ইন্টারোগেট করা। কিন্তু নিজেদের কাজের পরিধি স্বেচ্ছায় বাড়িয়ে নিয়েছে তারা। প্রত্যেকে পালা করে আট ঘন্টা ডিউটি দেয়, গোটা ঘাঁটি ঘুরেফিরে দেখে আসে। এদের ক্ষমতা প্রায় অসীম, এমন কি কমোডরের নির্দেশও অনেক সময় মেনে চলতে চায় না।

রানার ভয় হলো, ও যে বিসিআই এজেন্ট, সেটা না ওরা জেনে ফেলে। ধরা পড়লে টরচার করা হবে, তবে তা নিয়ে এখুনি আতঙ্কিত না হলেও চলে। আর মেরে ফেললে তো সব চুকেই গেল। বন্দী হয়েছে, কিন্তু তবু হাল ছাড়তে রাজি নয় ও। আর শুধু নিজেদের মুক্ত করার কথাও ভাবছে না। ওর উদ্বেগ ব্রিটিশ, মার্কিন আর জাতিসংঘের জাহাজ তিনটেকে নিয়ে—বিশেষ করে জাতিসংঘের যে জাহাজটায় বাংলাদেশী সৈন্যরা আছে, সেটাকে নিয়ে। এতগুলো নিরপরাধ মানুষকে ইসরায়েলিরা মেরে ফেলবে, প্রাণ থাকতে সেটা ঘটতে দেবে না রানা। কতটুকু কি করতে পারবে এখনও কোন ধারণা নেই, তবে চোখ-কান খোলা রেখে সতর্ক থাকবে ও। চেষ্টা থাকলে উপায় একটা হয়ই।

শুধু যে বাংলাদেশী বা অন্য জাহাজগুলোর বাকি সব সৈন্যদের কথা ভেবে বিচলিত বোধ করছে রানা, তা নয়। ইসরায়েলিরা জাহাজ তিনটে ডুবিয়ে দিতে পারলে তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে ভেবেও আতঙ্ক বোধ করছে। জাহাজ ডুবিয়ে দেয়ার পর ইসরায়েলিরা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে সফল হলে আমেরিকা ইরাককে দায়ী না-ও করতে পারে, কারণ ইরাকের সীমান্তে কোন সাগর নেই, কাজেই তার সাবমেরিন না থাকারই কথা। ঘাঁটিটা লেবাননে, লেবাননকে গোপনে রাশিয়া সাবমেরিন সাপ্লাই দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠতে পারে। ইসরায়েলের আরেক পাশে মিশর, মিশরের বিশাল সমুদ্রসীমা আছে, মিশরও রাশিয়া থেকে সাবমেরিন কেনে, তাদেরকেও দায়ী করা হতে পারে। এমন কি ইরাক আক্রমণে রাশিয়া সায় না থাকায় আমেরিকা রাশিয়াকেও সরাসরি অভিযুক্ত করতে পারে। অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ ইত্যাদির মধ্যে পরিস্থিতি কোনদিকে মোড় নেবে কেউ বলতে পারে না। আমেরিকা লেবাননে বোমা ফেলতে পারে। একানব্বুই সালে ইরাক গুরুতর অন্যায় করার পরও আটানব্বুই সালে তার প্রতি আরব বিশ্বের সহানুভূতি কম নয়—নির্দোষ লেবাননের ওপর বোমা ফেলা হলে আমেরিকার ওপর শুধু আরব বিশ্ব নয়, বিশ্বের আরও বহু দেশ খেপে যাবে। শুরু হবে মেরুকরণ। তৈরি হয়ে যাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার পরিবেশ। অর্থাৎ গোটা পৃথিবীর অস্তিত্বই পড়ে যাবে গুরুতর হুমকির মুখে।

কাজেই, কিছু একটা করতেই হবে রানাকে।

একটা কথা ভেবে মনে মনে খানিকটা স্বস্তিবোধ করল ও। হাদী ওর আসল পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানে না। ওর মত হাদীকেও ইন্টারোগেট করা

হবে, তবে কিছু ফাঁস হয়ে যাবার ভয় নেই।

কিন্তু না, ওদেরকে তেমন কিছু জিজ্ঞেস করা হলো না। প্রশ্নগুলো সবই রুটিন। আবার ওদেরকে ডক-লেভেল গ্যালারিতে ফিরিয়ে আনা হলো। ছয় নম্বর ডকের উল্টোদিকে পৌঁছে বাঁক ঘুরল ওরা, এখানে পাথর কেটে বেশ কয়েকটা ছোট গুহা তৈরি করা হয়েছে, প্রতিটির মুখে ইস্পাতের গ্রিল। তারই একটায় ওদেরকে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। ঘুমের চেয়েও জরুরী প্রয়োজনে কষ্ট পাচ্ছে রানা, কিন্তু ঘুরে কিছু ব্যাখ্যা করার আগেই বাইরে থেকে গ্রিলের গেট বন্ধ হয়ে গেল, তালা লাগিয়ে চলে গেল গার্ড।

সেলে ফার্নিচার বলতে দুটো ক্যাম্প বেড, পায়ের দিকে তিনটে কম্বল পড়ে আছে। রানা ভাবল, কে জানে কম্বলগুলো কতদিন ধরে এখানে আছে। ভাবনাটা এল সেলের ভেজা পাথুরে দেয়াল চকচক করছে দেখে, আর খুব ঠাণ্ডা লাগায়। বাইরে, গ্যালারিতে, নগ্ন ইলেকট্রিক বালবটা কেউ নেভাল না। এই আন্ডারগ্রাউন্ড সাবমেরিন বেসে বাতাসের নড়াচড়া প্রায় অসম্ভব বলে মনে হলেও, ডকগুলোর ওদিক থেকে কিভাবে বা কোত্থেকে যেন হিম বাতাস আসছে, সাবমেরিনগুলো যেখানে বাঁধা রয়েছে। ছয় নম্বর ডকে পৌঁছানোর ঢালু টানেলটা সেলের কোণ থেকে কোন রকমে দেখা যায়।

রাতে ঘুম খুব কমই হলো রানার। কম্বলের তলায় ওরা সম্ভবত পাঁচটা বাজার পর ঢুকল। এমনিতে অচেনা জায়গা, তার ওপর কনকনে ঠাণ্ডা আর নগ্ন বালবের সরাসরি অত্যাচার জাগিয়ে রাখল ওকে। তারপরও অবশ্য ঘুম এল চোখে, কিন্তু মনে হলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেশিনের কর্কশ শব্দ আর কর্মব্যস্ত লোকজনের হৈ-চৈ নিদ্রাদেবীর কোল থেকে টেনে তুলে আনল ওকে। লোকজন লোহা ও ইস্পাতে হাতুড়ি পেটাচ্ছে, প্রতিটি শব্দ গুহা আর গ্যালারিতে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে, ধ্বনির চেয়ে প্রতিধ্বনি শতগুণ বেশি শব্দ করছে। নানা ধরনের আওয়াজ এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে, ওয়েল্ডিং মেশিনের আওয়াজটা ছাড়া আর কোনটা রানা চিনতে পারল না।

হাতঘড়ি দেখল। সাড়ে ন'টা বাজে। বেডের নিচে পা দুটো ঝুলে থাকলেও, নাক ডেকে অঘোরে ঘুমাচ্ছে হাদী। এত সব কর্কশ শব্দের মধ্যেও তার নাক ডাকার আওয়াজটা অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে ও। শীত এত বেশি, যেন হাড়ে কামড় বসাচ্ছে, তারপরও আধো ঘুমে বিছানায় পড়ে থাকল। কম্বলগুলো ছেঁড়া, তবু গা থেকে ওটা ফেলে বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

ঠিক দশটার সময় তিনজন লোক এল। একজন পেটি অফিসার, দু'জন রেটিং। প্রত্যেকের কাঁধের সঙ্গে ঝুলছে কারবাইন, অটোমেটিক রাইফেল; হাতে একটা করে রিভলবার। ওদেরকে ওয়াশরুমে নিয়ে আসা হলো। মুখ-হাত ধোয়ার সুযোগ দেয়া হলেও, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম দেয়া হলো না। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে চমকে উঠল রানা, নিজেকে যেন চিনতেই

পারছে না। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। চোখ দুটো সামান্য গর্তে ঢোকা, কিনারায় লালচে ভাব।

রানা আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল হাদী, বলল, 'স্যার, আপনাকে নিয়েই আমার চিন্তা। আরামের শরীর, এত ধকল আপনি সইবেন কিভাবে।'

'সত্যি যদি আমাকে নিয়ে চিন্তিত হও,' বলল রানা, 'তাহলে মোসাড এজেন্টদের সঙ্গে ভুলেও লাগতে যেয়ো না। তাহলে একা শুধু নিজের নয়, আমারও মস্ত উপকার করা হবে।'

মাথা চুলকে বাধ্য ছেলের মত হাদী বলল, 'আমি একটু বদরাগী, তবু আপনার কথা আমার মনে থাকবে, স্যার।'

টয়লেট ব্যবহার করার পর আবার ওদেরকে গার্ড-রুমে নিয়ে আসা হলো। আজ এখানে ওদের সঙ্গে অন্য একজন মোসাড এজেন্টের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। এই লোকটা তালগাছের মত লম্বা, সরু মুখ, চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তাকে দেখে আরও বেশি সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল রানা। কোন কথা না বললেও, ওকে সে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। কিছু সন্দেহ করেছে কিনা বোঝা গেল না, শুধু মুচকি একটু হাসল। ডেস্ক থেকে সবুজ একটা ফর্ম তুলল সে, চোখ বুলাল সেটায়, তারপর ওদেরকে নিয়ে সরু একটা গ্যালারি হয়ে বেস কমান্ড্যান্ট-এর অফিসে চলে এল। কমান্ড্যান্ট হলেন কমোডর আয়ান পেরেজ। শক্ত-সমর্থ কাঠামো, চুলে পাক ধরেছে। ভদ্রলোককে দেখে রানার অপছন্দ হলো না, চেহারায় ও কথাবার্তায় মার্জিত একটা ভাব স্পষ্ট।

দরজার কাছে গার্ডদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা দু'জন, মোসাড এজেন্ট কমোডরের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছে। এক সময় কমোডোর ওদেরকে ডেস্কের সামনে আসার নির্দেশ দিলেন। তারপর হাদীকে আরবীতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তাকরির উপকূল খুব ভালভাবে চেনো, কথাটা কি সত্যি?'

উত্তরে কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল হাদী।

'আমাদের কাছে সমস্ত কোস্টাল ইনফরমেশন সহ চার্ট আছে,' বললেন কমোডর। 'তবে তীর বা সৈকতের কাছাকাছি রক ফরমেশন আর কারেন্ট সম্পর্কে সমস্ত তথ্য নেই। এগুলো আমাদের দরকার। দেবে তো?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল হাদী। চেহারায় এমন বিহ্বল ভাব, যেন একটা কুকুরকে প্রাপ্য হাড় দেয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। 'আমি জানি না,' বলল সে।

'জানো না?' সামনে, ডেস্কে পড়ে থাকা ফর্মটার দিকে আরেকবার তাকালেন কমোডোর, তারপর মুখ তুলে হাদীর দিকে। 'তুমি তো একজন জেলে, তাই না? তাকরির উপকূলে মাছ ধরো, ঠিক?'

হাদীকে এখনও বিহ্বল দেখাচ্ছে। 'ঠিক,' ইতস্তত করে বলল সে।

'বোধহয়... ঠিক জানি না।'

হাদীর দিকে তাকাল রানা, বুঝতে পারছে না হঠাৎ কি হলো তার। প্রথমে ভাবল, নিশ্চয়ই কোন খেলা খেলছে সে। কিন্তু আচরণ বলে না যে অভিনয় করছে। একটা হাত মাথায়, ধীরে ধীরে চাপড় দিচ্ছে; আরেকটা হাত দিয়ে চোখ দুটো ডলছে, যেন এইমাত্র ঘুম থেকে জাগল।

কমোডর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। 'তুমি এখানে বন্দী। এটা বোঝো তো?'

মাথা ঝাঁকাল হাদী, 'জ্বী, হুজুর।'

'বন্দী হিসেবে আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য তুমি,' কমোডর এমন নরম সুরে কথাটা বলছেন, হাদী যেন একটা শিশু।

'জ্বী, হুজুর।'

'তাহলে এদিকে এসো,' বলে হাদীকে নিয়ে একটা কেবিনেট-এর সামনে চলে এলেন কমোডর। কেবিনেটের মাথা কাঁচ দিয়ে ঢাকা, ভেতরে একটা চার্ট। চার্টটা রয়েছে খোলা একটা ফাইলে, পাতা ওল্টাতেই আরেকটা চার্ট দেখা গেল, এটা তাকরির উপকূলের। 'এখানে কায়দা খাঁড়ি,' বললেন তিনি, ম্যাপের ওপর আঙুল রেখে। 'এখন বলো, পানিতে ডোবা সব পাথরই কি চার্ট করা আছে?'

হাদী জবাব দিল না, কেমন যেন দিশেহারা দেখাচ্ছে তাকে।

'আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? পাথরগুলো চার্ট করা আছে, নাকি নেই?' কমোডর অধৈর্য হয়ে উঠছেন।

'থাকতে পারে,' বিড়বিড় করল হাদী, 'আবার না-ও থাকতে পারে।'

'এই ব্যাটা জাউলা, কমোডরের প্রশ্নের জবাব দে। হেঁয়ালি করলে মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলব,' মোসাড এজেন্ট বলল, হাদীর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। গলার আওয়াজটা অত্যন্ত কর্কশ।

সন্ত্রস্ত একটা ভাব ফুটে উঠল হাদীর চেহারায়, কোণঠাসা পশুর মত দেখাচ্ছে তাকে। পিছন দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার কিছু মনে পড়ছে না।' চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে।

'মনে পড়ছে না মানে?' দাঁতে দাঁত চাপল মোসাড এজেন্ট।

'বলতে পারছি না। মনে আসছে না।' হঠাৎ ঘুরে অন্ধের মত দরজার দিকে টলতে টলতে এগোল হাদী, যেন একটা শিশু আতঙ্কে ভুগছে। ফোঁপাচ্ছে সে, চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে, পাশ কাটাবার সময় রানাকে যেন চিনতেই পারল না।

বয়স্ক একজন মানুষকে কাঁদতে দেখা খুবই দুঃখজনক ও বিব্রতকর। কিন্তু হাদীর কান্না এতটাই অবিশ্বাস্য যে স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা।

গার্ডরা ছুটে এসে ধরে ফেলল তাকে, টলতে টলতে এক পাক ঘুরল সে। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, মুখ ঢাকল দু'হাতে। তবে ধীরে ধীরে ফোঁপানোর আওয়াজটা কমে এল।

রানা দেখল কমোডর ও মোসাড এজেন্ট, দু'জনেই হতভম্ব হয়ে পড়েছে। হবারই কথা। ও নিজেও কম বিস্মিত হয়নি। নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপ করল ওরা, তারপর কমোডর হাদীর দিকে ফিরে বললেন, 'এদিকে এসো।'

কমোডর ডেস্কের পিছনে নিজের চেয়ারে বসলেন। তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল হাদী। 'বুঝি, সাবমেরিনে সময়টা তোমার ভাল কাটেনি,' নরম সুরে বললেন কমোডর। 'সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। তবে এই তথ্যটা আমার খুব জরুরী দরকার। হয় তুমি তাড়াতাড়ি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনো, তা না হলে তথ্যগুলো আমরা তোমার কাছ থেকে জোর করে আদায় করব। এইমাত্র তাকরির উপকূলের চার্ট দেখানো হয়েছে তোমাকে। ওটার মধ্যে কায়দা খাঁড়িও আছে। আমি জানতে চাইছি আমাদের এই চার্ট নিখুঁত কিনা।'

জবাবে ডেস্কের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল হাদী। 'আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না!' হিংস্র বাঘের মত গর্জে উঠল সে, সেটা শুধু রোমহর্ষকই নয়, হাদীর গলা বলে চেনাও গেল না। 'আপনারা বুঝতে পারছেন না? আমার কিছু মনে পড়ছে না। মনটা ফাঁকা হয়ে গেছে। আমার কান্না পাচ্ছে।'

কমোডর আর মোসাড এজেন্টের দিকে তাকিয়ে রানার মনে হলো, এরকম বিস্মিত লোক আগে কখনও দেখেনি সে। এতক্ষণ তারা বোধহয় ভাবছিল হাদী কৌতুক করছে বা কোন খেলা খেলছে।

করুণ দৃষ্টিতে হাদীও তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সে যেন আহত বা অবলা একটা পশু। 'দুঃখিত,' বিড়বিড় করল সে। 'আপনাদের আমি ভয় পাইয়ে দিয়েছি। কিন্তু তা আমি চাইনি। সমস্যাটা হলো···এই যে···এই যে, আমি কিছু মনে করতে পারছি না। সত্যি আমার খুব ভয় লাগছে।' হাত তুলে নিজের মাথাটা চেপে ধরল সে।

রানার দিকে তাকালেন কমোডর। 'আপনার বন্ধুর কি হয়েছে?' জানতে চাইলেন তিনি।

রানাকে স্বীকার করতে হলো, ও কিছু জানে না। 'সাবমেরিনে তো সুস্থই ছিল,' বলল ও। 'তবে কাল রাতে ওকে খুব মনমরা দেখেছি।' তারপর হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল। 'আমরা যখন বন্দী হই, ওর মাথায় রিভলবারের ব্যারেল দিয়ে বাড়ি মারা হয়েছিল। তাতে কোন ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে। পরে, সাবমেরিনে, দু'একবার উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ও।'

তথ্যগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন কমোডর। তারপর একজন গার্ডকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'যাও, ওদের সাবমেরিন কমান্ডার আর ডাক্তারকে ডেকে আনো।'

ডাক্তারই আগে পৌঁছুল। হাদীর মাথার ক্ষতটা পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিল, খুলির চামড়া কেটে ও ফুলে গেলেও, কোথাও ফাটেনি। মাথায় জোরাল আঘাতজনিত কারণে হাদী স্মৃতিভ্রংশে ভুগছে কিনা, এ-ব্যাপারে কিছু বলতে

অক্ষমতা প্রকাশ করল। কমোডর একই প্রশ্ন বারবার করায় অবশেষে সে বলল, 'সম্ভাবনা কম, তবে নিশ্চিতভাবে সত্যি কিছু বলা সম্ভব নয়।'

তারপর এল সাবমেরিন কমান্ডার। রিভলবারের ব্যারেল দিয়ে হাদীর মাথায় আঘাত করা হয়েছিল, ঘটনাটা স্বীকার করল সে। তারপর, সাবমেরিনে, হাদীকে স্বাভাবিক আচরণ করতে দেখা গেলেও, মাঝে-মধ্যে তাকে বিষণ্ন ও অন্যমনস্ক দেখা গেছে। দু'একবার বেসামাল হতেও দেখা গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলল, সাবমেরিনের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে তার কাছ থেকে কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছিল, উত্তরে গলা ছেড়ে হেসে উঠেছিল হাদী। তবে হাদী যে তাকে ঘুসি মেরে ফেলে দিয়েছিল, এই কথাটা চেপে গেল সে।

'ওদেরকে সেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও,' গার্ডদের নির্দেশ দিলেন কমোডর। অফিস থেকে বেরিয়ে আসছে ওরা, রানা শুনতে পেল কমোডর ডাক্তারকে নির্দেশ দিচ্ছেন, সে যেন হাদীর ওপর নজর রাখে।

সেলে ফিরে হাদীকে রানা বলল, 'ভাল অভিনয় করছ। তোমার প্রশংসা করতে হয়।'

রানার দিকে তাকাল হাদী। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি।

'তোমার খেলাটা আসলে কি, বলবে আমাকে?'

'স্যার, আপনিও! আপনিও আমার কথা বিশ্বাস করছেন না?'

'হাদী, এটা তোমার উচিত হচ্ছে না। আমাকে তুমি সব কথা বলতে পারো।'

'স্যার, আপনার মাথা যদি পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে যায়, কিছুই যদি মনে করতে না পারেন, আর তখন যদি কেউ বলে আপনি কোন খেলা খেলছেন, আপনার কেমন লাগবে?'

রানার তবু বিশ্বাস হলো না যে হাদীর স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। 'আজ সকালে তো ভালই ছিলে তুমি।'

'তা হয়তো ছিলাম,' বলে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল হাদী। 'কমোডর আমাকে প্রশ্ন করার পর বুঝতে পারলাম কি ঘটে গেছে।'

ব্যাপারটাকে রানা সিরিয়াস হিসেবে নিল আরও অনেক পরে, হাদী যখন দুপুরের খাওয়া আর বিকেলের চা-নাস্তা খেতে অস্বীকার করল। সারাটা দিনই বিছানায় পড়ে থাকল সে। বেশিরভাগ সময় মাথাটাকে ঢেকে রাখল দুই হাত দিয়ে। মাঝে মধ্যে গোঙাল, যেন স্মৃতি ফিরে পাবার চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দুই কি তিনবার উন্মত্ত আক্রোশে বালিশে ঘন-ঘন ঘুসি মারল।

রাতের খাবার দেয়া হলো। কিন্তু হাদী খাবে না। তার প্লেটটা গার্ডকে রেখে যেতে বলল রানা। হাদীর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে নিজের হাতে অল্প-অল্প করে খাওয়াতে চেষ্টা করল ও, এ যেন অসুস্থ কোন শিশুকে খাওয়াতে হচ্ছে। এক সময় প্লেটগুলো ফেরত নিতে এল গার্ড, রানা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারকে একটা খবর দেয়া যায় কি?'

রানা এবার সত্যি ভয় পেয়ে গেছে। এত কষ্ট করে খাওয়াল হাদীকে, অথচ গলায় আঙুল দিয়ে সব বমি করে ফেলে দিয়েছে।

ডাক্তার এল আধ ঘণ্টা পর। উপুড় হয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে রয়েছে হাদী। তবে ঘুমিয়ে পড়েনি। কি কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করল রানা। ডাক্তার হাদীকে জিজ্ঞেস করল, 'বমি করলে কেন?'

'বমি পাচ্ছিল, তাই গলায় আঙুল দিতে বাধ্য হয়েছি,' বলল হাদী।

'এখন তোমার কেমন লাগছে?'

'কিছু ভাল লাগছে না।'

'সারাদিন তো কিছু খাওনি, খিদে পাচ্ছে না?'

'প্রচণ্ড খিদে পাচ্ছে, কিন্তু রুচি নেই। তাছাড়া, মনে হচ্ছে পেটে কিছু দিলেই সব আবার বেরিয়ে আসবে।'

রানার উদ্বেগ লক্ষ করে ডাক্তার নিচু গলায় আশ্বাস দিল, 'ভয় পাবার কিছু নেই।' তারপর ব্যাখ্যা করল, 'স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেললে মানুষ ভয় পায়, তখন খিদে নষ্ট হওয়া বা বমি পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া, ভয় পাবার আরও তো কারণ আছে, তাই না? এখানে সে বন্দী। মৃত্যুভয়েও তো ভুগছে। সেজন্যেই সে কি ছিল বা কি করেছে, কিছুই মনে করতে পারছে না। ব্যাপারটা সত্যি দুঃখজনক। একমাত্র আপনিই ওকে সাহায্য করতে পারেন। ওকে অভয় দিন, সান্ত্বনা দিন। বাড়ির গল্প শোনান, ওর বন্ধুদের কথা, স্ত্রী আর বাচ্চাকাচ্চার কথা বলুন। বলা যায় না, এভাবে চেষ্টা করলে আবার হয়তো সব মনে পড়বে।'

একজোড়া স্লীপিং ট্যাবলেট দিয়ে চলে গেল ডাক্তার। ভদ্রলোক অত্যন্ত সদয়, রানা তাকে ধন্যবাদ জানাতে ভুল করেনি। সেলের গেট বন্ধ হতে হাদীর মেস জ্যাকেটের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল ও, বলল, 'ধরাও, ভাল লাগবে।'

সম্ভবত ডাক্তারের নির্দেশেই ধূমায়িত দু'কাপ কোকো দিয়ে গেল একজন মেইল নার্স, ঘ্রাণটা ভারি চমৎকার। সে যখন ওদের দুই বিছানার মাঝখানের মেঝেতে ওগুলো রাখছে, বাইরে লাফ দিয়ে সিধে হলো সশস্ত্র গার্ড। লম্বা ও একহারা এক লোককে ওদের সেলের দিকে হেঁটে আসতে দেখা গেল। বেশ স্মার্ট মনে হলো, তবে চেহারায় রাগ-রাগ ভাব। 'এসব কি?' কর্কশ সুরে জানতে চাইল সে, আঙুল তুলে কাপ দুটো দেখাল।

পুরুষ নার্স ব্যাখ্যা করল, ডাক্তারের নির্দেশ। লোকটা তাকে বিদায় করে দিয়ে রানা ও হাদীকে হুকুম করল, 'স্ট্যান্ড আপ!'

রানা বিছানা ছেড়ে দাঁড়াল। কিন্তু হাদী শুয়েই থাকল, একচুল নড়ল না। 'শুনতে পাওনি? আমি না তোমাকে দাঁড়াতে বললাম?' আরবীতে গর্জে উঠল লোকটা। তার চেহারায় অকারণ আক্রোশ লক্ষ করে হাদীর কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠল রানা।

হাদী তবু বিছানা ছাড়ছে না দেখে গার্ডের হাত থেকে বেয়োনেটটা নিয়ে

এগিয়ে এল লোকটা, ইচ্ছে করেই দুই বিছানার মাঝখানে রাখা ট্রে-র ওপর পা রাখল, তারপর বেয়োনেটের তীক্ষ্ণ ডগা দিয়ে খোঁচা মারল হাদীর নিতম্বে। লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকায় সেখানে বিকৃত একটা আনন্দের ঝিলিক দেখতে পেল রানা।

ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল হাদী, লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। রানার ভয় হলো, লোকটাকে না মেরে বসে সে। লোকটার দিকে তাকাল, দেখল সে-ও তাই আশা করছে, তাহলে আচ্ছামত টরচার করার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে। কিন্তু হাদী কিছুই করল না, অভিমানী চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকল শুধু। 'আচ্ছা, তুমি তাহলে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছ?' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা।

হাদী কিছু বলছে না।

'তাহলে দেখতে হয় কিভাবে তোমার স্মৃতি ফিরিয়ে আনা যায়,' বলল লোকটা। 'এ-ব্যাপারে আমি একজন বিশেষজ্ঞ। কাল থেকে তুমি কাজে যাবে—তোমরা দু'জনেই।' তারপর হাদীর প্রকাণ্ড শরীরটা খুঁটিয়ে দেখল সে। 'তুমি তো একটা হাতি, একাই দশজনের খাবার খেয়ে ফেলবে, কাজেই কাজও করতে হবে দশজনের সমান।'

রানা বলল, 'ও অসুস্থ।'

ঝট করে রানার দিকে ফিরল লোকটা। 'প্রশ্ন না করলে কথা বলা নিষেধ।' তার পিছু নিয়ে আরেকজন এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে সেলের বাইরে। এই মোসাড এজেন্টই আজ সকালে ওদেরকে কমোডরের অফিসে নিয়ে গিয়েছিল। তাকে হিব্রুতে বলল, 'কাল তুমি ওদেরকে ইউথারটিনাইনের খোলে কাজ দেবে।' সেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কি মনে করে ফিরে এসে রানার সামনে দাঁড়াল। 'নিজের যদি ভাল চাও, তোমার বন্ধুর স্মৃতি ফিরিয়ে এনে সাহায্য করো। তা না হলে এমন ব্যবস্থা করব, তুমিও কিছু মনে করতে পারবে না।'

রানা কিছু বলল না, আড়চোখে একবার শুধু ট্রের ওপর উল্টে পড়া কাপ দুটোর দিকে তাকাল। গ্রিল লাগানো গেট কর্কশ আওয়াজ তুলে বন্ধ হয়ে গেল।

'উনি কে?' চেহারায় বোকা বোকা ভাব, জিজ্ঞেস করল হাদী।

রানা তাকে চেনে, বিসিআই হেডকোয়ার্টারের কমপিউটরে তার ফাইল ও ছবি আছে, তবে হাদীর প্রশ্নের উত্তর শুধু এইটুকু বলল, 'সম্ভবত মোসাডের সিনিয়র কোন অফিসার, এখানকার বেসে ডিউটি দিচ্ছে।'

'মোসাড কি?' জিজ্ঞেস করল হাদী।

রানা বিস্মিত। 'আজ সকালেও তুমি জানতে মোসাড মানে ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স।' তবে স্মৃতি হারিয়ে ফেললে মানুষের মস্তিষ্কে তার কি প্রভাব পড়বে, বলা কঠিন। 'বাদ দাও। ডাক্তার যে ঘুমের ট্যাবলেট দুটো দিয়েছেন, ওগুলো তোমাকে স্মৃতি ফিরে পেতে সাহায্য করবে। মোসাড নিয়ে তোমাকে

কিছু চিন্তা করতে হবে না।' হাদীকে ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল ও, তারপর আধ ভাঙা একটা কাপের তলায় পাওয়া সামান্য একটু কোকোর সঙ্গে ট্যাবলেট দুটো গুঁড়ো করে মিশিয়ে খাইয়ে দিল। কোন প্রশ্ন বা আপত্তি না করেই খেলো হাদী। 'ডাক্তার আমাদেরকে আরও একটা জিনিস দিয়ে গেছেন,' বলল রানা, যদিও কথাটা সত্যি নয়। হাদীর পকেট থেকে পাওয়া সিগারেটের প্যাকেটটাই দেখাল ও, একটা সিগারেট বের করে গুঁজেও দিল ঠোঁটে। নতুন খেলনা পেয়ে একটা বাচ্চা ছেলে যেমন খুশি হয়ে ওঠে, হাদীও সেরকম খুশি হয়ে উঠল।

কিন্তু তারপর দেখা গেল দেশলাই নেই। ওদের কাপড়চোপড় গার্ডরা আগেই নিয়ে গেছে, বদলে পরতে দিয়েছে প্রায় অ্যাপ্রনের মত দেখতে লম্বা ফতুয়া, সঙ্গে নীল ট্রাউজার। গ্রিলের কাছে গার্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা, ইঙ্গিতে দেশলাই চাইল। দু'জন পাহারায় রয়েছে, দু'জনেই একযোগে মাথা নাড়ল। একজন আরবীতে বলল, 'সিগারেট খাওয়া নিষেধ।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর হাদীকে দেখিয়ে বলল, 'কিন্তু, আমার সঙ্গী অসুস্থ। সিগারেট খেলে উপকার হবে।'

গ্যালারির এদিক ওদিক তাকিয়ে কেউ আছে কিনা দেখে নিল একজন গার্ড, তারপর পকেট থেকে একটা দেশলাই বের করে লোহার বারের ফাঁকে গুঁজে দিল।

নিজেদের সিগারেটে ধরিয়ে দেশলাইটা ফেরত দেয়ার সময় রানা গার্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'অফিসার লোক কেমন?'

'মি. হেবা দাহির? জানি না, জিজ্ঞেস করবে না,' বলে দূরে সরে গেল সে, অফিসার প্রসঙ্গে কোন আলাপ করতে চায় না।

নিজের বিছানায় বসল রানা, সিগারেটে টান দেয়ার ফাঁকে দেয়ালের সরু ফাটল চুইয়ে বেরিয়ে আসা পানি দেখছে।

ন'টার সময় গার্ডদের পালা বদল হলো। ইতিমধ্যে হাদী ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর গায়ে কম্বল চাপিয়ে দিল রানা, নিজের বিছানায় ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। আলোটা অসহ্য লাগায় কম্বল দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলল। তবে ঘুম এল আরও অনেক পরে। কম্বলটা কর্কশ, কেমন একটা গন্ধও আছে। শুয়ে শুয়ে ওপরের গ্যালারি থেকে ভেসে আসা পায়ের আওয়াজ শুনছে। সমস্ত ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি ভোঁতা আর ফাঁপা লাগছে কানে, জেনারেটরের শব্দটাই শুধু স্পষ্ট চিনতে পারা যাচ্ছে। রানা ভাবছে, রানা এজেন্সির বৈরুত শাখার সঙ্গে প্রতিদিন টেলিফোনে রুটিন যোগাযোগ রাখছিল ও, আজ সারাদিনে ওর ফোন না পেয়ে শাখা অফিসের লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে। আরও হয়তো একটা দিন অপেক্ষা করবে ওরা, তারপর কি ঘটেছে জানার জন্যে তাকরিরে কাউকে পাঠাবে। বৈরুত শাখা প্রধান হিসেবে কাজ করছে একটা মেয়ে, শায়লা শারমিন। শারমিনের অধীনে কারা কাজ করছে ওর কোন ধারণা নেই, তবে জানে যুদ্ধের প্রবল আশঙ্কা সৃষ্টি হওয়ায় ওর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও বিসিআই-এর

অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ ডিরেক্টর সোহেল আহমেদও মধ্যপ্রাচ্যের কোথাও আছে। ওর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, এই খবরটা শারমিন তাকেই প্রথমে জানাবে। যে-ই তদন্ত করতে আসুক, তার সঙ্গে যদি লেবানীজ কোস্টগার্ড শমসের লিবানের দেখা হয় তাহলে ওর আর হাদীর কপালে কি ঘটেছে জানতে পারবে সে। এখানে একটা সন্দেহ জাগল রানার মনে। শমসের লিবান বেঁচে আছে কিনা। এক বা দু'জন লোককে নিয়ে হেডল্যান্ডে থাকার কথা ছিল তার, কিন্তু তা কি সে ছিল? লেবানীজ টর্পেডো বোট যেভাবে সাবমেরিনটাকে অকস্মাৎ আক্রমণ করে বসল, তাতে তো মনে হয় সাবমেরিনটার জন্যে অপেক্ষা করছিল তারা। লেবানীজ নৌ-বাহিনীকে নিশ্চয়ই লিবানই সতর্ক করে দিয়েছিল। প্রশ্ন হলো, লিবানও কি ওই টর্পেডো বোটে ছিল? বোটটা কি ডুবে গেছে?

লিবান বেঁচে থাকলে বা সে যদি কাউকে কিছু বলে গিয়ে থাকে তাহলে আলাদা কথা, তা না হলে ওর আর হাদীর কপালে কি ঘটেছে সে-সম্পর্কে রানা এজেন্সির অপারেটর প্রায় কিছুই জানতে পারবে না।

নাহ্, বাইরে থেকে সাহায্য পাবার কোন আশাই বলতে গেলে নেই। যা করার ওকে একার চেষ্টায় করতে হবে। হাদী তো কোন সাহায্যে আসবেই না, সে বরং এখন থেকে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। শুধু স্মৃতিশক্তি হারানোটাই সমস্যা নয়। রানার মনে হচ্ছে, তার সম্ভবত মস্তিষ্ক বিকৃতিও ঘটছে। হাদীর প্রতিটি আচরণ এত বেশি শিশুসুলভ হয়ে উঠছে যে তাকে দেখে-শুনে রাখাটা একটা দায়িত্ব হিসেবে চেপে বসছে ওর কাঁধে। মোসাডকে যদি এই অসুস্থতা বিশ্বাস করানো না যায়, হাদীর অবস্থা কি দাঁড়াবে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল রানা। মোসাডের ইন্টারোগেশন আর টরচার সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে ওর। তাদের যদি সন্দেহ হয় হাদী অভিনয় করছে, নির্যাতন চালিয়ে ওকে মেরে ফেলবে।

নিজেকে রানা সাবধান করে দিল, হাদীর ওপর নির্যাতন হলে আপাতত প্রকাশ্যে ওর কোন চরম প্রতিক্রিয়া যেন না হয়। নিজেকে নিরীহ রিপোর্টার ও অসহায় বন্দী হিসেবে প্রমাণ করতে হবে। পানির তলার এই সাবমেরিন ঘাঁটি থেকে পালানো সহজ কাজ হবে না, তবে চোখ-কান খোলা রাখলে দু'একটা সম্ভাবনা ঠিকই বেরিয়ে আসবে। তারপর দরকার হবে নিখুঁত একটা প্ল্যান আর ঝুঁকি নেয়ার সাহস। সে সাহস ওর আছে। আর আছে অটল প্রতিজ্ঞা, জাহাজ তিনটেকে ডুবিয়ে দিয়ে যুদ্ধ বাধাবার ইসরায়েলি ষড়যন্ত্র প্রাণ থাকতে সফল হতে দেবে না সে। এখন শুধু ভাগ্য একটু সহায়তা করলেই হয়, মোসাড এজেন্টরা ওকে যেন চিনে না ফেলে।

পরদিন ভোর ছ'টায় ঘুম ভাঙানো হলো ওদের, কাজ দেয়া হলো ইউ-থারটিনাইনের খোলে। ডকে ভেসে আছে ওটা, গায়ে দাগ আর আবর্জনা। লোকজন যারা ওদের সঙ্গে কাজ করছে তাদের কথাবার্তা থেকে রানা জানতে পারল তুরস্কগামী একটা মিশরীয় বাণিজ্যিক জাহাজকে ডুবিয়ে দিয়ে

কাল রাতেই ঘাঁটিতে ফিরেছে ওটা। গায়ে পুরু হয়ে জমে আছে সামুদ্রিক ঘাস, সেটাই ওদেরকে পরিষ্কার করতে হচ্ছে।

ওদের গার্ড রাত তিনটের দিকে বদল হয়েছিল। আবার বদল হলো ন'টায়। গার্ড বরাদ্দ করে বা গার্ডের ওপর নজর রাখে যে পেটি অফিসার, লোকটার মনে দয়া রহম বলে কিছু নেই। হাদী কাজে একটু ঢিল দিলেই গার্ড তাকে ছুটে মারতে আসছে। অভিযোগের সুরে বলছে পেটি অফিসার যদি দেখে তুমি কাজ করছ না, তোমার তো যা হবার হবেই, আমারও বারোটা বাজবে। রানা ধরে নিল, এতটা নির্দয় হবার নির্দেশ গার্ড পেয়েছে মোসাড এজেন্ট হেবা দাহিরের কাছ থেকে, পেটি অফিসারের মাধ্যমে।

এক সময় দেখা গেল ফাঁকি দেয়া তো দূরের কথা, কাজটা খুব আনন্দের সঙ্গে করছে হাদী। এই কাজের মধ্যে সে হয়তো নিজের স্মৃতি হারানোর দুঃখ আর শোক ভুলে থাকতে পারছে। রানা যেখানে চার ফুট পরিষ্কার করল, হাদী ওই একই সময় করল দশ ফুট। এগারোটার দিকে দম নেয়ার জন্যে একটু থামল রানা, অমনি বেয়োনেট হাতে ছুটে এল গার্ড। নিতম্বে তীক্ষ্ণ খোঁচাটা হুলের মত বিঁধল, তবে অপমানটা আগুন ধরিয়ে দিল সারা শরীরে। প্রতিবাদ না করে আবার কাজ শুরু করল সে।

বারোটার সময় লাঞ্চ খাবার জন্যে বিশ মিনিট বিরতি। তারপর আবার কাজ। দম ফেলার ফুরসত দেয়া না হলে এভাবে একটানা কাজ করা অসম্ভব। ক্রু বা রেটিংদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না, কারণ তারা কাজ যতটুকু করছে তারচেয়ে বেশি করছে গল্প। লাঞ্চের দু'ঘণ্টা পর ব্যথায় হাত আর কাঁধ অবশ হয়ে এল রানার, তবু কাজে এতটুকু ঢিল পড়তে দিল না প্রবল ইচ্ছেশক্তির জোরে, কারণ জানে নিজেকে অনুগত ও পরিশ্রমী গাধা হিসেবে প্রমাণ করতে পারলে ভবিষ্যতে বিশেষ সুবিধে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আর এক ঘণ্টা পর এমন ক্লান্ত হয়ে পড়ল, বুঝতে পারল মিনিট পাঁচেক বিশ্রাম নিতে না পারলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। কত রকম চালাকিই তো করা যায়, এখন যদি মই থেকে পড়ে যায় ও, কার কি বলার থাকবে? ভাগ্য ভালই বলতে হবে, মইটার নিচের ধাপে দাঁড়িয়ে কাজ করছিল, পা হড়কে পড়ে গেল নিচে। ভাগ্য আরও একটু ভাল বলতে হবে, শুধু পাঁজরে অপ্রীতিকর একটা ব্যথা পেল, আর কোথাও লাগেনি। মুখ তুলে তাকাল ও। সাবমেরিনের প্রকাণ্ড খোল ওর ওপর ঝুঁকে আছে। কিন্তু কোথায় ছিল কে জানে, হাতে বেয়োনেট নিয়ে ছুটে এল পেটি অফিসার। যে পাঁজরে রানা ব্যথা পেয়েছে সেটাতেই কষে লাথি মারল লোকটা, হুমকি দিয়ে বলছে এখুনি মইয়ে চড়ে কাজ শুরু না করলে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যাবে।

এই সময় হাদীর প্রকাণ্ড শরীরটা দেখতে পেল রানা। শান্ত ভঙ্গিতে মই বেয়ে নেমে এল সে, আগে থেকে কিছু বুঝতে না দিয়ে দুম করে এক ঘুসি মেরে বসল পেটি অফিসারের নাকে। দূরে ছিটকে পড়ল লোকটা, ভাঙা নাক থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে। তারপর, গার্ড ছুটে আসার আগেই, মই বেয়ে

নিজের কাজে ফিরে গেল সে।

নিজের পায়ে দাঁড়াল রানা। গার্ডকে হতভম্ব দেখাচ্ছে। ক্রু আর রেটিংদের মধ্যে অনেকেই ঘটনাটা ঘটতে দেখেছে, তারা গার্ডকে নিয়ে কৌতুক শুরু করল। একজন বলল, 'তুমি পুলিস ডাকছ না কেন?' হো-হো করে হেসে উঠল সবাই। কোন সন্দেহ নেই, এদের মনে নরম একটা স্থান দখল করে নিয়েছে হাদী। তাদের কথাবার্তা থেকে এ-ও জানা গেল, পেটি অফিসারকে কেউই তেমন সহ্য করতে পারে না।

পেটি অফিসার ছিটকে পড়ার পর আর নড়ছে না। গার্ডদের একজন এক সময় বলল, ডাক্তারকে খবর দিতে যাচ্ছে সে। হাদী নির্বিকার চিত্তে নিজের কাজ করে যাচ্ছে, যেন কিছুই ঘটেনি। ব্যাপারটা এরকম নয় যে ঘটনাটার সঙ্গে জড়িত নয় বলে ভান করছে সে। দেখে মনে হলো, সে যে একজন ইসরায়েলি পেটি অফিসারকে ঘুসি মেরে ফেলে দিয়েছে, এ-সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই। ওদের মাথার ওপর ডকসাইডে কিছু লোক ভিড় জমিয়েছে। সবাই একযোগে কথা বলছে, কারও কথাই বোঝা যাচ্ছে না, চাপা পড়ে যাচ্ছে মেশিনারির গর্জনে। আর সব ডক থেকেও লোকজন দেখতে আসছে কি ঘটেছে। প্রথম সারির লোকজন পিছন থেকে ঠেলা খাচ্ছে দেখে বোঝা গেল প্রতি মুহূর্তে ভিড় আরও বাড়ছে।

পেটি অফিসারের সাহায্যে কেউ এগোচ্ছে না। অগত্যা রানাকেই যেতে হলো। ডকের পাশে, খানিকটা পানির ওপর পড়ে আছে লোকটা। কাপড়চোপড় এরইমধ্যে সব ভিজে গেছে। রানার ভয় লাগল, মরে যায়নি তো? পালস দেখল। না, চলছে, তবে গতি খুব ধীর। শরীরটা পরীক্ষা করল রানা, নাকে বাদে আর কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। ডকের এক পাশে ধাক্কা খেলেও, হাত দুটো উঁচু করে রাখায় মাথাটা শক্ত কিছুর সঙ্গে বাড়ি খায়নি।

বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে আছে, যতটা সম্ভব আরামপ্রদ ভঙ্গিতে শোয়াল তাকে রানা। একটু পরই ডাক্তারকে নিয়ে ফিরে এল গার্ড। ইস্পাতের মই বেয়ে ডকে নামার সময় ডাক্তারের চশমার কাঁচ থেকে ইলেকট্রিক আলো প্রতিফলিত হতে দেখল ও।

পেটি অফিসারকে অল্পক্ষণ পরীক্ষা করল সে, বলল, 'ওর কিছু হয়নি।' দু'জন লোককে নির্দেশ দিয়ে বলল, 'ওকে ওর বার্থে রেখে এসো।'

পেটি অফিসারকে মই বেয়ে তোলা হচ্ছে, রানার দিকে ফিরল ডাক্তার। 'কি ঘটেছে?' ইংরেজিতে জানতে চাইল। বলল রানা। মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'ওর খুব বিপদ।'

ডকসাইডে ভিড় করা লোকজন হঠাৎ চুপ করে গেল, আকস্মিক নিস্তব্ধতা রীতিমত ধাক্কার মত লাগল। মুখ তুলল রানা। মোসাড অফিসার হেবা দাহির পৌঁছে গেছে। লোকজন সব ছায়ার মত মিলিয়ে যেতে লাগল। মই বেয়ে ডকে নেমে এল দাহির। 'কি ঘটেছে? শুনলাম,' ইঙ্গিতে হাদীকে দেখাল, 'ও

নাকি আমাদের একজন গার্ড অফিসারকে ঘুসি মেরে বেহুঁশ করে দিয়েছে? সত্যি নাকি?' হিব্রু ভাষায় কথা বলছে সে, চোখের দৃষ্টিতে ব্যাকুল আগ্রহ অতি মাত্রায় নগ্ন ও স্পষ্ট। তার রেকর্ড জানে রানা, এই মুহূর্তে বুঝতেও পারছে, লোকটা সত্যিকার একজন স্যাডিস্ট।

'ঠিকই শুনেছেন,' জবাব দিল ডাক্তার, 'তবে সে ঠিক বুঝে কাজটা করেনি···'

'বুঝে করেছে, কি না বুঝে করেছে তা আমি জিজ্ঞেস করিনি,' ধমক দিল দাহির। গার্ডের দিকে তাকাল সে। 'এই হাতিটাকে গার্ড-রুমে ধরে নিয়ে যাও। ট্রাইয়্যাঙ্গেলের সঙ্গে বাঁধো। মুসলিম বন্দী ইসরায়েলি অফিসারের গায়ে হাত তোলে, এত স্পর্ধা! ওকে আমি উচিত শাস্তি দেব। মোসলানকে ডাকো। ইস্পাতের কাঁটা বসানো চাবুকটা সঙ্গে করে আনতে বলবে। কয়েক মিনিট পর আসছি আমি।' একটু থেমে রানার দিকে তাকাল, ইঙ্গিতে ওকে দেখিয়ে গার্ডকে আবার বলল, 'একেও সঙ্গে করে নিয়ে যাও, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কাকে বলে চাক্ষুষ করবে।'

স্যালুট করে ঘুরে দাঁড়াল গার্ড, একই সঙ্গে রানাকে ইঙ্গিত করল পিছু নেয়ার। হাদীকে ওরা মই থেকে নামিয়ে আনল, ডক গ্যালারি হয়ে র‍্যাম্প বেয়ে ওপরে তুলল, গার্ড-রুমে নিয়ে যাচ্ছে। সেদিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। এই দৃশ্য কি বিশ্বাস করার মত? অবোধ শিশুর মত মাথা দুলিয়ে আপন মনে হাসছে হাদী।

ওদের পিছু পিছু এল রানা, তলপেটে অসুস্থকর শূন্য একটা ভাব। ডক ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, পিছন থেকে ডাক্তারের গলা ভেসে এল কানে। 'আপনি আসলে ভয় দেখাচ্ছেন, তাই না? আপনি কি আর সত্যি সত্যি অসুস্থ একজন লোককে ইস্পাতের চাবুক দিয়ে মারবেন!'

'মারব মানে? আপনি কি বলছেন ডাক্তার! আমি তো ওকে মেরে ফেলতে চাইছি!' দাহিরের গলা।

'কিন্তু মি. দাহির, ও অসুস্থ। শুধু যে স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তা নয়, ওর মাথায় গণ্ডগোলও দেখা দিয়েছে। অন্যায় করেছে, তা ঠিক, কিন্তু সে-সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই নেই···'

'আরে, থামুন তো! ইচ্ছে হলে টরচার করার সময় আপনি ওখানে থাকতে পারেন,' বলল দাহির। 'আমি প্রমাণ করব, এ-সব ওর অভিনয়। কাজ না করার ফন্দি।'

উত্তরে আরও কিছু বলল ডাক্তার, কিন্তু দূরে সরে আসায় তা আর রানা শুনতে পেল না। ডাক্তারের ভূমিকায় কৃতজ্ঞবোধ করল ও, ভেবে ভাল লাগল যে মানবিক গুণ সম্পন্ন অন্তত একজন মানুষ এখানে আছে।

তবে এ-ও সত্যি যে ডাক্তারের কথায় হাদীকে দাহির ছেড়ে দেবে না। আর সব জায়গার মতই, মোসাডের নির্দেশই এখানে আইন। রানা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছে, হাদীর স্মৃতিভ্রংশ ও মস্তিষ্ক বিকৃতির ব্যাপারটা

দাহির বিশ্বাসই করছে না হাদীর জন্যে ভয়ে বুকটা ওর কাঁপছে, কারণ ইস্পাতের কাঁটা লাগানো চাবুকের বাড়ি হজম করা যে কি কঠিন, সে রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা ওর নিজেরই হয়েছে একবার। পিঠের মাংস ফালি ফালি হয়ে যায়। যে-ক'বার চাবুক মারার কথা, সাধারণত ততবার মারার দরকার হয় না, তার আগেই বন্দী মারা যায়। তেল আবিবে মোসাড হেডকোয়ার্টারে রানার বেঁচে যাওয়ার ঘটনাটা ছিল বিরল ব্যতিক্রম। তাছাড়া, পিঠের পেশী শক্ত করে তুলে এ-ধরনের আঘাতে যতটা সম্ভব কম ক্ষতিগ্রস্ত হবার ট্রেনিং নেয়া ছিল ওর।

রানার গোটা অস্তিত্বের ভেতর থেকে একটা বিষাদ উঠে আসছে। গার্ড-রুমে নিয়ে এসে হাদীর কাপড় খোলা হলো, তারপর ভারী লোহার ট্রাইয়্যাঙ্গেলের সঙ্গে বাঁধা হলো তাকে। ওর মনে হলো, হাদী যতটুকু কষ্ট পাবে, ও তারচেয়ে কম ভুগবে না। যা কিছু ঘটছে, সেজন্যে নিজেকেই সম্পূর্ণ দায়ী করল ও। মনে হলো, এরকম করুণ ও ভয়াবহ দৃশ্য কমই দেখেছে রানা। হাদী এখন হাসছে না, তবে এতটুকু উদ্বিগ্নও সে নয়। অনুগত, অবোধ পশুর সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই। কি ঘটতে চলেছে সে-সম্পর্কে তার কোন ধারণা আছে বলে মনে হলো না। নগ্ন অবস্থায় তার দৈহিক কাঠামো আরও বিশাল দেখাচ্ছে। রানা উপলব্ধি করল, হাদী যদি একবার খেপে ওঠে, খালি হাতে গার্ড-রুমের সবাইকে খুন করতে পারবে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল ওর, হাদী, তা-ই করো! রুখে দাঁড়াও, মেরে ফেলো সবাইকে! কিন্তু না, চেঁচিয়ে কোন লাভ নেই।

লম্বা ও চৌকো একটা বাক্স থেকে ইস্পাতের কাঁটা লাগানো চাবুকটা বের করল একজন নাবিক। লোকটা দীর্ঘদেহী, পেশীবহুল শরীর। সাদা কোট খুলে ফেলল সে, শার্টের আস্তিন গুটাল। তার ঘাড়ের নিচের দিকে ঘামে ভেজা চুল বৈদ্যুতিক আলোয় চকচক করছে। ট্রাইয়্যাঙ্গেলের পজিশন ঠিক করে নিল সে, চাবুকের বাড়ি যাতে দেয়ালে না লাগে। ইতিমধ্যে গার্ডের সংখ্যা বাড়িয়ে ছয়জন করা হয়েছে। প্রথম যে মোসাড এজেন্টের সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছিল, তাকেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। চাবুক হাতে নাবিক নিজের পজিশনে দাঁড়াচ্ছে, গার্ড-রুমের ভেতর পিন-পতন নিস্তব্ধতা নেমে এল। দেয়াল ঘড়িটা টিক-টক-টিক-টক আওয়াজ করছে। ওরা সবাই হেবা দাহিরের জন্যে অপেক্ষায় রয়েছে।

চার

'দরজা বন্ধ করো!' সেলে ঢুকেই গর্জে উঠল দাহির। দৃঢ় পায়ে হেঁটে এসে ট্রাইয়্যাঙ্গেলের এক পাশে দাঁড়াল। সরু মুখ ঘামে চকচক করছে, চোখ দুটো যেন স্বচ্ছ কাচ। 'গার্ডদের অফিসারকে কেন তুমি আঘাত করলে?' হাদীকে

আরবীতে জিজ্ঞেস করল সে।

হাদী জবাব দিল না। সে যেন কথাটা শুনতেই পায়নি।

ঠাস করে তার গালে চড় মারল দাহির। চড়টা সে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মেরেছে, ফলে হীরে বসানো সোনার আঙটি হাদীর গালে গেঁথে গেল। 'জবাব দে, কুত্তার বাচ্চা!' হুঙ্কার ছাড়ল সে।

হাদীর চেহারায় কোন বিকার নেই।

'এর পিঠের ছাল তোলো!' হুকুম করল দাহির। 'চাবুক চালাও! চামড়ার সঙ্গে যেন মাংসও উঠে আসে!' কি এক বিকৃত উত্তেজনায় কাঁপছে সে।

নিজের পজিশন আবার ঠিকঠাক করে নিল নাবিক লোকটা, দূরত্বটুকু আরেকবার দেখে নিল। নিজের অজান্তেই চোখ বুজল রানা। বাতাসে শিস কাটল ইস্পাতের তিন প্রস্থ ফালি, থ্যাচ করে মাংসে আঘাত করার শব্দ হলো। চোখ খুলতেই হাদীর পিঠে তিনটে লাল রেখা দেখতে পেল রানা, প্রতিটি রেখার ওপর এক ইঞ্চি ব্যবধানে একটা করে গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে। রেখা তিনটে আর গর্তগুলো থেকে রক্ত বেরিয়ে এল, ঢাকা পড়ে গেল সব লাল রঙে, সেই রঙ হাদীর নিতম্বে গড়িয়ে নেমে আসছে।

'এবার আমার প্রশ্নের জবাব দেবে তো?' জিজ্ঞেস করল দাহির। 'গার্ডদের অফিসারকে কেন তুমি আঘাত করলে?'

তবু হাদী কথা বলছে না। অসুস্থ বোধ করছে রানা, সেই সঙ্গে মনটার বিদ্রোহ হয়ে ওঠাও দমন করতে পারছে না। হাদী সুস্থ মানুষ হলে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়তো সম্ভব ছিল। কিন্তু অসুস্থ, বোধশক্তিরহিত একজন মানুষকে এভাবে নির্যাতন করা হলে তা মেনে নেয়া পাপ বলে মনে হলো ওর। কি করবে ও, এরকম পরিস্থিতিতে প্রতিবাদ করার জন্যে অপেক্ষায় থাকলে হাদীকে বাঁচানো যাবে না। আবার ঠিক এই মুহূর্তে প্রতিবাদ করলে হাদীর বদলে ওকেই হয়তো ট্রাইয়্যাঙ্গেলে বেঁধে চাবুক মারা হবে।

তা মারে মারুক, তবু মুখ বুজে এই অন্যায় অত্যাচার রানা মেনে নেবে না।

নাবিক লোকটা দাহিরের নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় রয়েছে। আর রানা রয়েছে হাদীর পিঠে আরেকটা চাবুক মারার অপেক্ষায়। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও—আর মাত্র একটা আঘাত পেতে দেবে হাদীকে, তারপর প্রতিবাদ করবে। যদিও মনের ভেতর থেকে তাগাদা আসছে, দেরি কেন, এখুনি প্রতিবাদ করো।

'মারো! আবার মারো!' গর্জে উঠল দাহির।

নাবিক চাবুক তুলল। রানা এক পা সামনে বাড়ল। ওকে নড়তে দেখে দ্রুত কাছে সরে এল দু'জন গার্ড।

রানার ওপর নাবিকের দৃষ্টি পড়েছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রানার দিকে তাকাল দাহির। সে কিছু বলতে যাবে, এই সময় কঠিন ও কর্তৃত্বের সুরে কে যেন বলে উঠল, 'থামো! চাবুক নামাও!'

রানার পেশীতে ঢিল পড়ল।

'কে ওকে চাবুক মারার নির্দেশ দিল?' গার্ড-রুমে ঢুকে ভারী গলায় জানতে চাইলেন ঘাঁটির কমান্ড্যান্ট, কমোডর। তাঁর গলায় রাগ ও ঘৃণা, সবার কানেই সেটা বাজল।

অকস্মাৎ একটা উত্তেজনা বোধ করল রানা।

'আমি নির্দেশ দিয়েছি,' বলল দাহির, পা বাড়িয়ে কমোডরের সামনে এসে দাঁড়াল। 'আপনি আমার নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করছেন?' প্রশ্নটা উচ্চারণ করার মধ্যে নেকড়ের খেঁকিয়ে ওঠার ভাবটুকু স্পষ্ট। নিজের অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন মনে হলো তাকে।

কমোডর তার প্রশ্নের জবাবই দিলেন না। গার্ডদের তিনি বললেন, 'লোকটাকে ট্রাইয়্যাঙ্গেল থেকে খোলো।'

দাহির এক পা সামনে বাড়ল। মুহূর্তের জন্যে রানা ভয় পেল, কমোডরকে না মেরে বসে লোকটা। তার কপালের পাশের একটা শিরা সাংঘাতিক লাফাচ্ছে। 'গার্ড অফিসারদের একজনকে ঘুসি মেরেছে কুত্তাটা!' চিৎকার করার সময় গলার রগ ফুলে উঠল। 'চাবুক তাকে খেতেই হবে। এই ঘাঁটির আইন-শৃঙ্খলা দেখার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে। ইসরায়েল দীর্ঘজীবী হোক!' জার্মান নাৎসীদের মত ডান হাত তুলে লম্বা করল সে।

দেশপ্রেমের এই মহড়া প্রদর্শন কমোডরের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। 'এখানে আমি কমান্ডে আছি,' শান্ত, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললেন তিনি। গার্ডদের দিকে তাকালেন। 'লোকটাকে নামিয়ে আনো।'

'আমি নির্দেশ দিয়েছি ওই কুত্তাটাকে চাবুক মারা হবে!' দাহিরকে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত দেখাচ্ছে।

কমোডর তাকে গ্রাহ্যই করছেন না। গার্ডরা ইতস্তত করছে দেখে কান ফাটানো বোমার মত আওয়াজ বেরুল তাঁর গলা থেকে, 'নামাও লোকটাকে!' জাদুর মত কাজ হলো, গার্ডরা ছুটল ট্রাইয়্যাঙ্গেল থেকে হাদীকে খোলার জন্যে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মুক্ত হয়ে গেল হাদী।

'আপনি নিজের সীমা ছাড়ালেন, কমোডর। আপনি আমাকে অপমান করলেন। আমাকে চ্যালেঞ্জ করলেন।' রাগে ও অপমানে থরথর করে কাঁপছে দাহির। 'এই কুত্তাটা আর ওই শুয়োরটা,' ইঙ্গিতে রানাকে দেখাল সে, 'ইরাকী স্পাই। একজন সব ভুলে যাবার ভান করছে, আরেকজন রিপোর্টারের মিথ্যে অভিনয় করছে।'

কমোডর তার দিকে তাকাচ্ছেনই না।

'আমি আরও সন্দেহ করছি,' বলে চলেছে দাহির, 'ওরা আমাদের এই গোপন ঘাঁটির সন্ধানে ছিল, বন্দীও হয়েছে স্বেচ্ছায় ও কৌশলে। এখন,' বড় করে শ্বাস টানল সে, 'আপনি যদি আমার কাজে বাধা দেন, মোসাড হেডকোয়ার্টারে আপনার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করব আমি। তার ফল কি দাঁড়াবে আপনি জানেন তো?'

ঘুরে দাহিরের মুখোমুখি হলেন কমোডর। 'তিন মাস হলো আপনি আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন, আমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিচ্ছেন। আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে শিশুসুলভ আইডিয়া খাটাতে গিয়ে আমার লোকজনকে আতঙ্কের মধ্যে রেখেছেন আপনি। আপনার দৃষ্টিতে, আপনি নিজে ছাড়া আর সবাই হয় টেরোরিস্ট নয়তো স্পাই। এটা একটা সাবমেরিন বেস, মোসাডের ইন্টারোগেশন সেন্টার নয়। এখন থেকে নিরেট কোন প্রমাণ যোগাড় করতে পারলে তবেই কাউকে আপনি জেরা করতে পারবেন, তা-ও প্রথমে আমার অনুমতি নিতে হবে। আরও একটা কথা, এখন থেকে এই বেস থেকে যে রিপোর্টই যাক, আমাকে না দেখিয়ে তা পাঠানো যাবে না।'

'এর জন্যে আপনাকে পস্তাতে হবে, কমোডর,' দাঁতে দাঁত চাপল দাহির।

'আমি তা মনে করি না।'

'কথা দিলাম, আমি আপনার চাকরি খাব। মোসাড হেডকোয়ার্টারে আপনাকে ইন্টারোগেট করা হবে। আমার বসকে আমি জানাব, আপনি আসলে ইরাকী স্পাই, শয়তান সাদ্দাম হোসেনের টাকা খেয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন।'

'আমাদের হাতে অনেক কাজ, আপনার প্রলাপ শোনার সময় নেই,' বললেন কমোডর। 'তিনটে বোটের মিলিত হবার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে, অথচ প্রস্তুতি চলছে ঢিমে তালে। আমরা কাজ করছি, আর আপনি বাধা দিচ্ছেন। যেহেতু ইসরায়েল একটা যুদ্ধে জড়াতে যাচ্ছে, সবাইকেই কিছু না কিছু কাজ করতে হবে। কিন্তু আপনি তো কোন কাজেরই উপযুক্ত নন। চেষ্টা করলে হয়তো শুধু রান্নাবান্নার কাজটা শিখতে পারবেন। ইউ-টোয়েনটিফোরে রিপোর্ট করুন, আজই। ওদের কুক অসুস্থ, তার কাজটা আপনাকে দেয়া হলো।'

'ঠিক আছে, আমিও দেখে নেব,' বলে আরও অপমান হওয়া থেকে বাঁচার জন্যে গার্ড-রুম ছেড়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল দাহির, সঙ্গী মোসাড এজেন্ট কারমালও পিছু নিল তার।

একজন আর্দালীকে নির্দেশ দিলেন কমান্ডার, 'কমান্ডার হারবিকে ডাকো। মেসে পাবে।'

আর্দালী চলে গেল। কমোডর ডাক্তারকে ডেকে বললেন, 'আমি চাই এই বন্দীর আপনি বিশেষ যত্ন নেবেন।' হাদীকে ইঙ্গিতে দেখালেন। 'ওদের দু'জনকেই এই গ্যালারির আরেক দিকে ট্র্যান্সফার করুন।' ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলাবার সময় ক্ষীণ হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'ভিজে, স্যাঁতসেঁতে সেলগুলো হেবা দাহিরের নির্দেশে তৈরি করা হয়েছিল। দেয়াল থেকে এত বেশি পানি ঝরে, সেলের মেঝে সব সময় ভেজা থাকে। দাহির আর তার সঙ্গীদের আমরা ওই সেলে শুতে দিতে পারি, কারণ তারা সুস্থ-সবল মানুষ। অসুস্থ কোন মানুষকে ওই সেলে কোনমতেই থাকতে দেয়া যায় না। আপনার কি মনে হয়,

ডাক্তার, দাহিরের রান্না কেমন হবে?'

'আমার ধারণা খাবারে ইচ্ছে করে লবণ কম বা বেশি দেবে,' হাসি চেপে বলল ডাক্তার।

'সেক্ষেত্রে কমান্ডার মুসকাকে আমি বলে দেব, তিনি যেন কোন রকম শয়তানি সহ্য না করেন,' বললেন কমান্ডার। 'বেশি বাড়াবাড়ি করলে দাহিরকে আমি অ্যারেস্ট করার নির্দেশ দেব।'

গার্ড-রুমের দরজা খুলে গেল, আর্দালীর পিছু পিছু একজন ন্যাভাল অফিসার ভেতরে ঢুকল। 'এই যে, হারবি,' বললেন কমোডর। 'তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি, আমার বিশ্বাস কাজটা তুমি উপভোগ করবে। হেবা দাহির আর তার তিন সঙ্গীকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, তারা এখন থেকে ক্রুদের মত যখন যে কাজে লাগে সে-ই কাজ করবে। হেবা দাহিরকে ইউ-টোয়েনটিফোরের কুক করা হয়েছে। বাকি তিনজনকে তোমার পছন্দ মত কাজ দাও।'

'ভেরি গুড, কমোডর,' হেসে ফেলে তাড়াতাড়ি ফিরে গেল কমান্ডার হারবি। আর্দালীকে নিয়ে কমোডরও বেরিয়ে গেলেন। এগিয়ে এসে হাদীর একটা হাত ধরল ডাক্তার। তাকে নিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে, রানার দিকে ফিরে ইঙ্গিত করল। রানা ওদেরকে অনুসরণ করল।

প্যালেস্টাইন জবরদখল করার পর ইসরায়েলি নেতারা যতই যুদ্ধংদেহি ভাব দেখাক, গোটা দেশে শান্তিপ্রিয় ইহুদির সংখ্যা কম নয়। আইজাক রবিন আর সিমন পেরেজ সেই দলেই পড়েন। তাঁদের আন্তরিক চেষ্টাতে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সই করা সম্ভব হয়েছিল। সেই চুক্তিতে প্যালেস্টাইনের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হয়েছে, যা প্রকারান্তরে স্বাধীনতারই নামান্তর। কিন্তু চরমপন্থী ইহুদিরা ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। ফলে আততায়ীর গুলিতে আইজাক রবিন নিহত হলেন। শান্তির পক্ষে ছিলেন সিমন পেরেজও। কিন্তু চরমপন্থীদের কাছে নির্বাচনে হেরে গিয়ে তিনি এখন দৃশ্যপট থেকে সরে গেছেন। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এখন নেতানিয়াহু। তাঁর আমলে মোসাড মাত্রা ছাড়িয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। হেবা দাহিরের আচরণ সে-কথাই আরেকবার প্রমাণ করল। এই সব কথা ভাবছে রানা, তবে ইসরায়েলিদের দেশপ্রেম সম্পর্কে ওর মনে কোন সন্দেহও নেই। ডাক্তার, কমোডর, দু'একজন কমান্ডার শান্তিপ্রিয় মানুষ বটে, কিন্তু দেশের স্বার্থে কর্তৃপক্ষের সমস্ত নির্দেশই তাঁদেরকে মেনে চলতে হবে। কমোডর এরই মধ্যে উল্লেখ করেছেন তিনটে বোট মিলিত হবার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে, অথচ প্রস্তুতি চলছে ঢিমে তালে।

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে শত্রুতা বা যুদ্ধের এটাই সবচেয়ে খারাপ দিক, শান্তিপ্রিয় ভাল মানুষকেও দুনিয়াটাকে নরক বানাবার কাজে লাগিয়ে দেয়া যায়। তারাও মানুষ খুন করে, নিজেরাও খুন হয়ে যায়।

এ এমন এক পরিস্থিতি, দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া কারও কিছু করার থাকে

না।

গ্যালারির আরেকদিকে ছোট একটা আরামদায়ক সেলে ওদেরকে নিয়ে এলো ডাক্তার, গার্ড-রুমের দরজার প্রায় উল্টোদিকে সেটা। এক লোককে ডেকে ব্যাগটা আনতে বলল সে। হাদীর পিঠের ক্ষতগুলোয় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল, অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগাবার পর। অ্যান্টি-টিটেনাস ইঞ্জেকশন দেয়ার পর পেইন-কিলার দুটো ট্যাবলেটও খেতে দিল। খানিক পরই হাদীর পিঠের ব্যথা কমে গেল। ডাক্তারকে একবার শুধু সে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে ওরা মারল কেন?'

'ভুল করে মেরেছে বা মেরে ভুল করেছে,' জবাব দিল ডাক্তার। 'তবে এখন থেকে কেউ আর তোমার গায়ে হাত তুলবে না।' চলে গেল সে।

একটু পরই রাতের খাবার নিয়ে এল একজন গার্ড। খেতে বসে রানা বলল, 'তুমি আজ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছ, হাদী। ভাবতেও পারিনি শেষটায় ভাগ্যটা সহায় হবে। এখন কেমন লাগছে তোমার?'

'পিঠে খুব ব্যথা,' বলল হাদী।

'দুঃখিত। তবে আরও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে পারত। ভাল কথা, তোমাকে আমার ধন্যবাদ দেয়া উচিত, কিন্তু দিতে পারছি না। একটু বিশ্রাম পাবার আশায় ইচ্ছে করে মই থেকে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। পেটি অফিসার আমাকে মারছিল, মারতই, তুমি কেন তাকে ঘুসি মারতে গেলে?'

'আনন্দ পাবার জন্যে,' হাদীর সরল জবাব।

হাদীকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করল রানা। চোখ বুজে হাসছে সে। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার লক্ষণগুলো স্পষ্ট। 'কাজটা তোমার বোকামি হয়ে গেছে। এ-ধরনের বিপজ্জনক ঝুঁকি আর কখনও নেবে না, ঠিক আছে? এরপর কাউকে মারলে ওরা তোমাকে ছাড়বে না।'

'সেজন্যেই কি ওরা আমাকে চাবুক মারছিল?'

'তা-ও তোমার মনে নেই?'

'কি জানি,' বলল হাদী। 'আমি ভাবলাম, মজা পাবার জন্যে মারছে।'

তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। বোধশক্তি বা চিন্তাশক্তি আংশিক হলেও হারিয়ে ফেলেছে হাদী। আগের সেই সতর্কতা তার মধ্যে একেবারেই নেই। ভোঁতা হয়ে গেছে লোকটা, এমনকি নড়াচড়ার মধ্যেও হাবাগোবা ভাব।

আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল রানা। সেলটা বেশ গরম, কম্বলগুলোও ছেঁড়া নয়, তাসত্ত্বেও সহজে ঘুম এল না চোখে। সারাটা দিন শরীরটার ওপর প্রচণ্ড ধকল গেছে, দিনের শেষে উদ্বেগ-উত্তেজনাও কম ছিল না। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নির্বোধ হয়ে ওঠা একটা লোক ওর পক্ষ নিয়ে কিছু একটা করতে গিয়ে নিজের প্রাণ খোয়াতে বসেছিল, কথাটা যতবার ভাবছে ততবার দুঃখে কাতর হয়ে পড়ছে ও। নেহাতই ভাগ্যগুণে এ-যাত্রা বেঁচে গেছে সে, অথচ উপলব্ধি করতে পারছে না কি ঘটে গেছে।

হাদী একটা সমস্যাও বটে। চোখ-কান খোলা রেখে ইসরায়েলি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার প্ল্যান তৈরি করতে হলে তাকে নিয়ে ওর ব্যস্ত থাকা চলবে না। এখন পর্যন্ত এমন কিছু ওর চোখে পড়েনি যা দেখে পালাবার সম্ভাবনা উঁকি দেয় মনে। নিজেকে রানা এই বলে সান্ত্বনা দিল, আজ ভাল ঘটনাও একটা ঘটেছে। হেবা দাহির আর তার সঙ্গীরা ওদের ওপর খুব একটা কড়া নজর রাখতে পারবে না। যদিও ওর সম্পর্কে রিপোর্ট চেয়ে দাহির যদি মোসাড হেডকোয়ার্টার তেল আবিবে বার্তা পাঠাতে চায়, কমোডর তাতে বাধা দেবেন বলে মনে হয় না।

দেখা যাক কালকের দিনটা কেমন কাটে।

পরদিন সকাল সাতটা থেকে ইউ-থারটিনাইনের খোলে কাজ শুরু করল ওরা। পিঠের ক্ষতে গায়ের ফতুয়া ঘষা খাওয়ায় ব্যথা পাচ্ছে হাদী, সেটা খুলে ফেলতে হলো। নড়াচড়ায় আড়ষ্টতা থাকলেও, আজও সে নিমগ্ন চিত্তে একাই দশজনের কাজ করছে। এ-ধরনের কাজ করে রানা অভ্যস্ত নয়, তবু গতকালের চেয়ে আজ কাজটা অনেক সহজ লাগছে।

সকাল এক সময় সন্ধ্যা হলো, সন্ধ্যা হলো ভোর। দিনে দশ ঘণ্টা করে কাজ করছে ওরা, মাঝখানে বিশ মিনিট বা আধ ঘণ্টার জন্যে লাঞ্চ খাবার বিরতি। খোল ধোয়ার কাজ থাকে শুধু যখন কোন সাবমেরিন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ঘাঁটিতে ফিরে আসে। জরুরী তাগাদা থাকলে রেটিংদের পুরো দলকে ওদের সঙ্গে লাগিয়ে দেয়া হয়, তাতে সময় লাগে মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তা না হলে কাজটা শুধু ওদের দু'জনকে করতে হয়, সময় লেগে যায় দেড় থেকে দু'দিন। খোল ধোয়ার কাজ না থাকলে ক্যান্টিনে কাজ পায় ওরা—বাসনকোসন ধোয়, আলুর খোসা ছাড়ায়। কোন সাবমেরিন যখন অভিযানে বেরুবার জন্যে তৈরি হয়, স্টোর-রুম থেকে রসদ তুলতে হয় তাতে।

হেবা দাহির আর তার তিন সঙ্গীর বিরুদ্ধে কমোডর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন ঠিকই, তবে ওদের নীরব সমর্থকও আছে। মোসাড এজেন্টরা এখন আর কাউকে সরাসরি বিরক্ত করতে পারছে না, এমন কি খুব কমই তাদেরকে এদিক ওদিক ঘুর-ঘুর করতে দেখা যায়, কিন্তু কয়েকজন ক্রুর আচরণ দেখে রানার সন্দেহ হলো তারা ওদের দু'জনের ওপর নজর রাখছে। স্বভাবতই আরও সতর্ক হয়ে গেল ও।

সারাদিন হাড় ভাঙা পরিশ্রমের পর রাতের খাবার খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে ওরা। সকালে উঠেই কাজে লেগে যায়। দিনের পর দিন এভাবে কাটছে। তারপর রানা লক্ষ করল, লোকগুলো আর আগের মত ওদের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে না। গার্ডের সংখ্যাও কমে গেল, এখন মাত্র একজন লোক ওদেরকে পাহারা দেয়। একজন অফিসার সমস্ত কাজের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে থাকে, ওদেরকে তার দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হয়। আসলে ফেটিগ পার্টির চার্জে

আছে সে। ফেটিগ পার্টি গঠিত হয় ঘাঁটিতে উপস্থিত সাবমেরিনগুলোয় কাজ করার জন্যে কত লোক লাগবে তা জানার পর। প্রতিটি সাবমেরিন থেকেই সদস্য নেয়া হয়। পদ্ধতিটা ভালই, পালা করে সবাইকে ফেটিগ পার্টিতে কাজ করতে হয়, একই বোটের সবার পালা শেষ না হলে কোন লোককে দ্বিতীয়বার বাছাই করা হয় না। ঘাঁটির সাধারণ একটা নিয়ম হলো, সাবমেরিন ক্রুদের যতটা সম্ভব বেশি বিশ্রাম দিতে হবে। কিন্তু তা আসলে সম্ভব হয় না। সাবমেরিনগুলো ক্রুদের জন্যে যেমন আরামদায়ক নয়, তেমনি ঘাঁটির কোয়ার্টারও নয়। আর কাজের তো কোন শেষ নেই। স্নায়ুর ওপর সবচেয়ে বেশি চাপ ফেলে সূর্য বা দিনের আলোর অনুপস্থিতি। গোটা ব্যাপারটাই তো আন্ডারগ্রাউন্ডে। তার ওপর মেশিনারি ও ঠোকাঠুকির বিদঘুটে শব্দ সারাক্ষণ প্রতিধ্বনি তুলছে।

রানা আর হাদী বাদে ফেটিগ পার্টির সব সদস্যই ডিউটির পর যেভাবে তাদের ইচ্ছে সময় কাটাতে পারে। তবে ওদের দু'জনের মত তাদেরকেও ডিউটি দেয়ার জন্যে তৈরি থাকতে হয় যদি কোন সাবমেরিন ঘাঁটিতে ফিরে আসে বা ঘাঁটি থেকে রওনা হয়। এর মানে হলো, ফেটিগ পার্টিকে প্রায়ই রাতের বেলা ঘুম থেকে তুলতে হয়, কারণ শুধু অন্ধকারেই সাবমেরিনগুলো ঘাঁটিতে ঢুকতে বা বেরতে পারে।

ইউ-টোয়েনটিফোর রওনা হবার সময় সেদিন রাতে রানাকেও ঘুম থেকে তোলা হলো। সারাদিন গাধার খাটনি খাটার পর মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে মেজাজের অবস্থা কি হয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে সাবমেরিনে পৌঁছুনোর পর কৌতূহল আর আনন্দে প্রায় নেচে উঠল মনটা। কারণ আর কিছুই নয়, দু'জন গার্ডের পাহারায় মোসাড এজেন্ট হেবা দাহিরকে আসতে দেখা গেল। এর আগে কোন মানুষের চোখে এতটা নির্ভেজাল আতঙ্ক দেখেছে কিনা, রানা মনে করতে পারল না। গার্ডদের সঙ্গে বদ্ধ উন্মাদের মত ধস্তাধস্তি করছে সে। রানা নিশ্চিত, বাবুর্চি হিসেবে পুরোপুরি অযোগ্য বিবেচিত হবে সে, তার হাতের রান্না খেয়ে ইউ-টোয়েনটিফোরের সবাই পেটের পীড়ায় ভুগবে। ক্রুরা লাইন দিয়ে দাঁড়াল তাকে দেখার জন্যে, কোন শব্দ না করলেও সবার মুখে চওড়া হাসি ফুটে উঠেছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সাবমেরিন সার্ভিসে মোসাড কোন ভূমিকা রাখুক, এটা কারও কাম্য নয়। এর পিছনে যথেষ্ট যুক্তিও আছে। হেবা দাহির কমোডর থেকে শুরু করে সবার ওপর খবরদারি করত, তার নিজস্ব আইন মেনে চলতে বাধ্য করত। আর্মিতে বা নেভীর কোন বিশাল যুদ্ধ জাহাজে সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু কোন সাবমেরিন বা সাবমেরিন ঘাঁটিতে এটা কাজ করবে না।

সাবমেরিন সার্ভিস অন্যান্য সার্ভিসের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ ঝুঁকি আর বিপদ এখানে অনেক বেশি। মর্যাদা বা ঐতিহ্য বড় কোন প্রসঙ্গ নয়, এই সার্ভিসে কাজ করার সুযোগ পাওয়া মানেই হলো হিরো বনে যাওয়া। আর একজন হিরো সব সময় শৃঙ্খলা বা ডিসিপ্লিনের উর্ধ্বে। এই সার্ভিসে শুধু দক্ষতা

বিবেচনা করা হয়, অন্য কিছু নয়। প্রশ্নটা অস্তিত্ব রক্ষার। প্রতিটি নাবিক ও ক্রুর হাতে গোটা সাবমেরিনের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে ডিসিপ্লিন স্বতস্ফূর্তভাবে এসে যায়, বাইরে থেকে আরোপ করার দরকার পড়ে না। কিন্তু তারা যখন ঘাঁটিতে ফিরে আসে, বিশেষ করে এ-ধরনের একটা ঘাঁটিতে, ক্রুরা বিশ্রাম পাবে বলে আশা করে, শৃঙ্খলা রক্ষার নামে সস্তা বিধি-নিষেধ মেনে চলতে তারা রাজি নয়।

আর সেজন্যেই ইউ-টোয়েনটিফোরের ক্রুরা দাহিরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। এতদিন সে ওদেরকে গালিগালাজ আর হুকুম করেছে, রুটিন কাজের অজুহাত দেখিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করেছে, উঁচু গলায় বলে বেড়িয়েছে ঘাঁটিতে তার কথামত চলতে হবে সবাইকে। এখন ক্রুরা তাকে হুকুম করবে, রান্না খারাপ হলে গালিগালাজ করবে। দাহির তো আতঙ্কিত হবেই।

ক্রুদের সঙ্গে রানাও লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল দাহির। ব্যাপারটা টের পেয়ে গার্ডরাও ঢিল দিল একটু। সোজা হেঁটে এসে রানার সামনে দাঁড়াল সে। 'কমোডরের এত সাহস নেই যে আমার মেসেজ পাঠানো বন্ধ করতে পারেন। মোসাড হেডকোয়ার্টারে তোমার সম্পর্কে তথ্য চেয়ে মেসেজ পাঠিয়েছি আমি। ফিরে এসেই জবাবটা পেয়ে যাব। তখন জানা যাবে, সত্যি তুমি মিশরীয় কোন দৈনিকের রিপোর্টার, নাকি ইরাকের একজন স্পাই।'

রানার মনে ঝড় উঠল, তবে নিজেকে আশ্বাস দিল এই বলে যে দাহির সম্ভবত মিথ্যে কথা বলছে। কমোডর তার কোন মেসেজ তেল আবিবে পাঠাবেন বলে মনে হয় না। আর যদি পাঠানও, ওর কাভার এত দুর্বল নয় যে তদন্ত করলেই ফাঁস হয়ে যাবে। ও শুধু বোকা-বোকা ভাব করে একটু হাসল, কথা বলল না।

ওরা হয়তো দাহিরের প্রতি খানিকটা অবিচারই করে ফেলেছে। কিংবা সে হয়তো নিজের ভবিষ্যৎ বুঝে ফেলেছে। যেভাবেই ব্যাপারটাকে দেখা হোক, দু'দিন পর একটা মিশরীয় টর্পেডো বোটের আক্রমণে ইউ-টোয়েনটিফোর সাইপ্রাসের কাছাকাছি ডুবে যায়।

পাঁচ

রানা আর হাদীর জীবন একেবারে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, ব্যাপারটা তা নয়। এ-কথা সত্যি যে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে ওদেরকে, তার ওপর ভেন্টিলেশন সিস্টেম থাকা সত্ত্বেও বাতাসের গুণগত মান মোটেও ভাল নয়। তবে সন্ধের দিকে, কাজ থেকে নিজেদের কোয়ার্টারে ফেরার পর, পড়ার জন্যে ইংরেজি ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। ডাক্তার ওদেরকে একটা দাবার বোর্ড

আর ঘুঁটিও যোগাড় করে দিয়েছেন। তবে খেলার প্রতি হাদীর তেমন আগ্রহ নেই। ম্যাগাজিন থেকে গল্প আর ফিচার পড়ে হাদীকে শোনায় রানা। ব্যাপারটা সে উপভোগ করে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, তাকরির উপকূল, কায়দা খাঁড়ি, মুয়াক্কা খাঁড়ি, শয়তানের তাওয়া বা জলপরীদের আস্তানা সম্পর্কে রানা যখন কথা বলে, হাদী কিছুই বুঝতে পারে না। অথচ রানার জানা আছে, এই সব জায়গার প্রতি সত্যিকার ভালবাসা আছে হাদীর মনে। তাকরির উপকূলে জন্মেছে সে, বড় হয়েছে, সারাটা জীবন এই জায়গা ছেড়ে খুব কমই বাইরে গেছে। অথচ এমন ভোলাই ভুলেছে, একটা জায়গার নাম পর্যন্ত তার পরিচিত বলে মনে হয় না। এমন কি রানাকে সে কোন প্রশ্ন পর্যন্ত করে না। তার বেশিরভাগ সময় কাটে সাধারণ একটা টেবিল নাইফ নাড়াচাড়া করে। কাঠের টুকরো চেঁছে খুদে মডেল বোট তৈরি করাতেই তার যত আনন্দ। এ যেন অবচেতন মনের কারসাজি বা কৌতুক, যে জীবন মনে করতে পারে না তারই প্রতিচ্ছবি তৈরি করাচ্ছে ওকে দিয়ে। তার এই কাজে কেউ বাধা দেয় না। ডাক্তার বরং উৎসাহিত করে। তার ধারণা, এর ফলে হাদী তার স্মৃতিশক্তি ফিরেও পেতে পারে। মাঝে মধ্যে হাদী তার ক্যাম্প বেডের পায়ায় নিজের নাম খোদাই করার কাজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়, যেন ভয় পাচ্ছে নামটাও না এক সময় ভুলে যায়।

যত দিন যাচ্ছে লোকজনের সঙ্গে আরও অবাধে মেলামেশার সুযোগ পাচ্ছে ওরা। হাদী তো রীতিমত জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সবাই তাকে নিয়ে কৌতুক করে, হাদী তাতে কিছু মনেও করে না। তার প্রকাণ্ড শরীর আর অবিশ্বাস্য শক্তি বিস্মিত ও মুগ্ধ করে সবাইকে। তারপর যখন জানা গেল সে সরল তো বটেই, বিপজ্জনক বা ক্ষতিকরও নয়, সন্ধের পর ডাক আসতে লাগল মেসে। প্রথম প্রথম হাদীকে একা ডাকা হত। ক'দিন পর রানা ক্রুদের জানাল, ডাক্তারের নির্দেশে সে তার বন্ধু হাদীর ওপর নজর রাখছে, কাজেই সন্ধের পর মেসে ওকে নিয়ে যেতে হলে তাকেও ওর সঙ্গে যেতে হবে। সহজেই রাজি হয়ে গেল তারা, কারণ রানাকেও তারা সোজা-সরল ভালমানুষ হিসেবে জানে। হাদীর মত রানাকেও বিয়ার খেতে দেয়া হলো। রানা নিল না, বদলে কফি চাইল। বিয়ার বা মদ হাদীও স্পর্শ করে না—বলা ভাল করত না—কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে যা দিচ্ছে সব সে গিলে ফেলছে। এ যেন দেখেও বিশ্বাস করার মত ঘটনা নয়। জীবনে যে কখনও মদ খায়নি, ক্যান ক্যান বিয়ার খেয়েও তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল না। এমনকি হুইস্কি খেয়েও নিজেকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে হাদী। ব্যাপারটা বিস্ময়কর বললেও কম বলা হয়। ক্রুরা হাদীকে নিজেদের পয়সায় বিয়ার বা হুইস্কি খাওয়ায় বিনা স্বার্থে নয়, তাকে দিয়ে সার্কাসের ট্রেনিং পাওয়া জানোয়ারের মত খেলিয়ে নেয়। স্রেফ দৈহিক শক্তি প্রদর্শন করে তাদেরকে আনন্দ দেয় সে। দু'জন মাঝারি আকৃতির নাবিককে দুই হাত ধরে শূন্যে তুলে ফেলতে পারে, মুঠোয় থাকে তাদের নিতম্ব ঢাকা ট্রাউজার বা হাফ প্যান্ট। সে বিয়ার ও হুইস্কি খেয়েও মাতলামি করছে না, এটাও তাদেরকে মুগ্ধ করে।

হাদীকে ওরা সার্কাসের জন্তু বানিয়ে ফেলায় রানার মনে ঘৃণার উদ্রেক হলেও, নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে সন্ধের পর সেল থেকে বাইরে বেরুবার যে সুযোগটা হাতে এসেছে সেটাকে কাজে লাগাতে হবে।

এই সুযোগেই ঘাঁটির কোথায় কি আছে জেনে নিতে পারল রানা। তবে শুধু তিনটে গ্যালারিতে আসা-যাওয়া করার স্বাধীনতা পেল ওরা, কোন ডক বা রিপেয়ার ও মিউনিশন ডিপোয় যেতে নিষেধ করে দেয়া হলো। নির্দেশ না পেয়ে ওখানে ঢুকলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। তাসত্ত্বেও ডিউটি দেয়ার সময় সুযোগ বুঝে ঘাঁটির অনেক নিষিদ্ধ এলাকায় অনুপ্রবেশ করল রানা। এক সময় প্রায় পুরো ঘাঁটিটাই দেখা হয়ে গেল ওর। জিজ্ঞেস করলে চোখ বুজে বলে দিতে পারবে কোথায় কি আছে, যা শুধু এসপিওনাজে ট্রেনিং পাওয়া একজন মানুষের পক্ষেই সম্ভব। একদিন একটা গ্যালারির পিছনে বিশাল এক শেড দেখল ও, গেট বন্ধ, কোন জানালা নেই, শুধু হাতুড়ির বাড়ির শব্দ আর মেশিনারির গুঞ্জন ভেসে আসছে। ওই শব্দ শুনেই বুঝতে পারল রানা ভেতরে কি হচ্ছে। মনের পর্দায় যখন পরিষ্কার একটা ছবি ফুটে উঠল, খসড়া একটা নকশা তৈরি করল রানা। পরে, আরও তথ্য পাবার পর, নকশাটায় কিছু পরিবর্তন আনতে হলো।

ইহুদি জাতি দুনিয়ার সেরা সব বিজ্ঞানী উপহার দিয়েছে। এই জাতির প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ আছে রানার মধ্যে। অন্তত বিজ্ঞানে তাদের অবদান অস্বীকার করার কোনোই উপায় নেই। হাজার হাজার বছর ধরে তাদের ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে তা-ও মেনে নেয়ার মত নয়। খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়ে ইহুদিরা তীক্ষ্ণ নজর রাখতে পারে, রানা জানত। কিন্তু এই তীক্ষ্ণ নজর কাকে বলে সেটা সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করতে পারল ঘাঁটিটা সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পাওয়ার পর। গোটা ব্যাপারটা এক কথায় অবিশ্বাস্য। ঘাঁটিটা তৈরি করতে দু'বছর সময় লেগেছে ওদের, খরচ হয়েছে পাঁচ হাজার কোটি টাকা। স্বয়ংসম্পূর্ণ ইকুইপমেন্ট আনা হয়েছে সাবমারসিবল্ বার্জে করে। কাঁচা মালও আনা হয়েছে, ঘাঁটিতে বসে ইকুইপমেন্ট তৈরি করার জন্যে। এগুলোর পরিমাণ ও সংখ্যা এত বেশি যে সাবমারসিবল বার্জের পুরো একটা বহরকে ব্যবহার করতে হয়েছে।

এখানে আসার পরপরই ডক সেকশনটা পরীক্ষা করার সুযোগ পায় রানা। লম্বা একটা গুহার ভেতর সাবমেরিনগুলো মাথাচাড়া দেয়। হেভী হলিজ গিয়ার সাবমেরিনকে টানার কাজে ব্যবহার করা হয়। মেইন গুহার চওড়া অংশটা থেকে বেরিয়ে গেছে সাতটা ডক এরিয়া। হলিজ গিয়ার সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা পেয়েছে রানা আরও পরে, জানতে পেরেছে কিভাবে কাজ করে ওটা।

প্রথম কথা, কোন অবস্থাতেই একটা সাবমেরিন দিনের আলোয় বা চাঁদের আলোয় ঘাঁটিতে ঢুকতে পারবে না। গুহার জলমগ্ন মুখ থেকে বেরিয়ে হলিজ গিয়ার একটা পাইলনকে ঘিরে রেখেছে, তীর থেকে একশো গজ দূরে

সাগরের তলায় শক্ত ভিত নিয়ে খাড়া হয়ে আছে পাইলনটা। অনুকূল পরিস্থিতিতে কাঁচের এক ধরনের একটা বল ওই পাইলন থেকে ছাড়া হয়—এ-ধরনের বল জেলেরা তাদের জালে ব্যবহার করে। বলটায় হালকা ফসফ্যারেসেন্ট পেইন্টের প্রলেপ দেয়া আছে, সাধারণ একটা রশির সাহায্যে পাইলনের সঙ্গে যুক্ত। রশির অপর অংশের সঙ্গে তীরের বৈদ্যুতিক সংযোগ আছে। কাচের বলে জোরাল টান পড়লে—বলের বয়্যান্সি যথেষ্ট নয়—হলিজ গিয়ার কন্ট্রোল রুমে একটা বেল বেজে ওঠে। ঘাঁটিতে ঢুকতে ইচ্ছুক একজন সাবমেরিন কমান্ডারকে বলে টান দিয়ে মোর্স সঙ্কেত পাঠাতে হয়, সঙ্কেতের সাহায্যে তার বোটের সংখ্যা আর নিজের নাম জানাতে হয়। অনুমতি নেই এমন কোন লোক টান দিলে সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করে দেয়া হয় বলটাকে।

সাবমেরিন থেকে পাঠানো সঙ্কেত নির্ভুল হলে ছোট একটা বয়া পানির তলা থেকে ছাড়া হয়, তাতে একটা টেলিফোন থাকে। ঘাঁটির সঙ্গে তখন সরাসরি কথা বলতে পারে সাবমেরিন কমান্ডার। মেইন বয়ার সঙ্গে হুকের সাহায্যে আটকানো হয় সাবমেরিনের বো, তারপর সাবমেরিন পানির তলায় ডুব দেয়। সঠিক পজিশনে ডুব দেয়ার জন্যে সতর্কতা প্রয়োজন—তীরের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় থাকতে হবে সাবমেরিনকে। এর কারণ হলো, যে লোহার ক্রেডলে নামবে সাবমেরিন সেটা একটা রেলপথের শেষ মাথায় তৈরি করা হয়েছে, রেলপথটা নেমে এসেছে জলমগ্ন পাহাড়-প্রাচীরের গা বেয়ে সাগরের তলায়। এই পদ্ধতি বাস্তবায়িত করতে ইসরায়েলি এঞ্জিনিয়ারদের অনেক মেধা খরচ করতে হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাগরের তলায় ছড়িয়ে থাকা পাথর এত বেশি যে রেলপথের সাহায্য নেয়া ছাড়া অক্ষত অবস্থায় একটা সাবমেরিনকে ঘাঁটিতে তুলে আনা সম্ভব হত না।

ঘাঁটিতে তিনটে গ্যালারি। প্রথমটা ডক লেভেলে। ভিজে সেলগুলো এই লেভেলেই। গ্যালারিটা অর্ধবৃত্তাকার, সাবমেরিন ডকগুলোকে ঘিরে আছে। প্রতিটি ডকের উল্টোদিকে একটা টানেল, চলে গেছে আরও চওড়া গুহার দিকে। ওদিকে স্টোর-রুম আছে, ইস্পাতের দরজা লাগানো। গ্যালারির দুই প্রান্ত তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরে ডক থেকে দূরে সরে গেছে, শেষ মাথায় বিশাল আকারের দুটো গুহা, কড়ি দিয়ে মজবুত করা। একটা গুহার পাশেই রয়েছে র‍্যাম্প, উঠে গেছে আপার গ্যালারিতে, ওখানে আছে দৈত্যাকার জেনারেটর, আর সামনে ইলেকট্রিক ফার্নেস সহ একটা ময়ংসম্পূর্ণ ফাউন্ড্রি। আরও খানিকটা এগোলে পাওয়া যাবে সারি সারি ওঅর্কশপ, লেদ আর মেশিন টুলসে ভর্তি। সাবমেরিনের যে-কোন পার্টস প্রয়োজন অনুসারে তৈরি করা হয় এখানে। বাঁকা গ্যালারির অপর প্রান্তের প্রকাণ্ড গুহায় রয়েছে বিরাট ফুয়েল ও মিউনিশন স্টোর। ফুয়েল রাখা হয়েছে বড় আকৃতির ট্যাঙ্কে। তামা-পিতল, ইস্পাৎ, সীসা, জিঙ্ক ও ম্যাঙ্গানিজ সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মেটেরিয়ালও মওজুদ রাখা হয়েছে।

ওপরের গ্যালারি দুটো বাঁকা নয়, সোজা; একটার ওপর আরেকটা।

এগুলো ক্রুদের কোয়ার্টার। রানার হিসেবে, এখানে সাতশো লোকের জায়গা হবে। ঘাঁটিতে কাজ করছে একশোর কিছু বেশি লোক। সাবমেরিনগুলো বেশিরভাগই গভীর সমুদ্রে চলাচলের উপযোগী, কোনটার ক্রুর সংখ্যাই ষাটজনের কম নয়। স্যাতসেঁতে ভাব এড়াবার জন্যে এই গ্যালারিগুলোর মেঝে আর দেয়াল সিমেন্ট করা হয়েছে। ওগুলোর পিছন দিকে আছে ফুড স্টোর।

ঘাঁটিতে কোন ওয়্যায়েরলেস ট্র্যান্সমিটার নেই, ফলে সরাসরি তেল আবিবের সঙ্গে বেতার যোগাযোগ সম্ভব নয়। ওয়্যায়েরলেস ট্র্যান্সমিটার থেকে কোন মেসেজ ব্রডকাস্ট করা হলে লেবানীজ আর্মি বা নৌ-বাহিনী সেটার উৎস খুঁজে বের করে ফেলতে পারে, সম্ভবত এই ভয়েই যোগাযোগের এই মাধ্যম রাখা হয়নি। তেল আবিব থেকে নির্দেশ পাবার জন্যে আলাদা কোন ওয়েভলেংথও নেই। তবে নির্দেশ ঠিকই আসে। সাধারণ ইসরায়েলি দর্শকদের জন্যে তেল আবিব রেডিও স্টেশন থেকে ইংরেজিতে যে খবর পড়া হয় তারই মধ্যে থাকে সেই নির্দেশ। খবরের ভাষা এমনভাবে সাজানো হয়, কোড ল্যাংগুয়েজ-এর ভূমিকা পালন করে সেটা। নিয়ম জানা থাকলে কোড ভাঙা খুবই সহজ। এই পদ্ধতিতে নির্দেশ আসছে, এটা রানা জানতে পারে আকস্মিকভাবে—হিব্রু ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল দু'জন নাবিক, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকায় শুনে ফেলেছিল। পদ্ধতিটা সত্যি ভাল, তবে কোড ভাঙার নিয়মটা এখনও ওর জানার সুযোগ হয়নি।

রানার একটা ধারণা ছিল যে যুদ্ধ বাধলে বা যুদ্ধ বাধাবার জন্যে ইসরায়েলিরা এই আন্ডারগ্রাউন্ড সাবমেরিন বেস ব্যবহার করবে। এখানে আসার ক'দিন পরই ওর এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

ওয়্যায়েরলেস-রুমের আর্দালী যখনই হাতে চক নিয়ে ক্যান্টিনে ঢোকে, ক্রুদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যায়। ক্যান্টিনে একটা ব্ল্যাক-বোর্ড আছে, চক দিয়ে তাতে লেখা হয় ঘাঁটির সাবমেরিনগুলো কোথায় কোন দেশের ক'টা বাণিজ্যিক জাহাজ ডোবাল। এই নিয়ে ক্রুরা বাজিও ধরে। কেউ বাজি ধরে জাহাজের সংখ্যার ওপর, আবার কেউ জাহাজের ওজন বা সেটা কত বড় তার ওপর। রানার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, ইসরায়েলিরা তাদের শত্রু রাষ্ট্রের অর্থনীতি দুর্বল করে দিচ্ছে গভীর সাগরে পণ্যবাহী জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে। ব্ল্যাকবোর্ডে লেবানন, মিশর, সৌদি আরব, লিবিয়া, আলজিরিয়া ও তিউনেশিয়ার জাহাজ তো আছেই, এমনকি ভারতীয়, পাকিস্তানী ও চীনের জাহাজও আছে।

কিন্তু তারপর ঘটনার মোড় একটু ঘুরে গেল। প্রথম হপ্তার শেষ দিক চারটে সাবমেরিন তিন দিন ধরে কোন জাহাজ ডোবাবার ঘটনা রিপোর্ট করল না। রিপোর্ট করল না মানে, তেল আবিব থেকে প্রচারিত ইংরেজি খবরে এ-সম্পর্কিত কোন খবর থাকল না। দশ দিন পর দেখা গেল সাতটা সাবমেরিন তিন বা চারদিন ধরে কোন রিপোর্ট করছে না।

রানা আর হাদী ঘাঁটিতে পৌঁছানোর চারদিন পর ইউ-ফরটিসেভেন ফিরে এল, সরাসরি গুঁতো খাওয়ায় সেটার আফটার ডেক ফাঁক হয়ে গেছে। ভেতরে পানি তো ঢুকেছেই, মারাও গেছে আটজন লোক। তিন দিন পর ইউ-টোয়েনটিওয়ান ডকে ভিড়ল, মোচড় খেয়ে ফালি ফালি হয়ে গেছে ব্রিজ, ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে ফরওয়ার্ড গান ও এ. এ. গান, নিহত হয়েছে বারোজন, আহত হয়েছে নয়জন। ওদের বোট, ইউ-থারটিফোর সহ, তিনটে বোট মেরামত করতে হবে।

এইসব ঘটনায় ঘাঁটির পরিবেশও বদলে গেল। ইসরায়েলি নৌ-কর্তৃপক্ষ এ-ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির জন্যে প্রস্তুত ছিল বলে মনে হয় না। দুই হপ্তার মধ্যে সাতটা সাবমেরিন নিখোঁজ, এটা অস্বাভাবিক ঘটনা। সব মিলিয়ে সতেরোটা সাবমেরিন, তার মধ্যে তিনটে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এ-সব খবর ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না। ক্রুরা বুঝতে পারল, তাদের সময়ও ঘনিয়ে আসছে। তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে ক্যান্টিন থেকে ব্ল্যাকবোর্ডটা নামিয়ে ফেলা হলো।

মোসাড এজেন্ট হেবা দাহিরের বিরুদ্ধে কমোডর আয়ান পেরেজ চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কেন নিয়েছেন, এতদিনে ব্যাপারটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারল রানা। এই ঘাঁটি ইসরায়েলের কোথাও হলে ঘটনাটা ঘটত না। ঘটতে পেরেছে বিদেশের মাটিতে সীমাবদ্ধ একটা জায়গার ভেতর ওরা সবাই আটকা পড়া অবস্থায় থাকতে বাধ্য হওয়ায়। তিন মাসেরও বেশি দিন কমোডরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয় দাহিরকে। বাকি দুনিয়ার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন কমোডর, ঘাঁটিটাকেই তাঁর গোটা জগৎ বলে মেনে নিয়েছেন। ইসরায়েল বা মোসাড তাঁর কাছে এখন আর কোন নিরেট বাস্তবতা নয়।

ব্ল্যাক বা স্কোর বোর্ড সরিয়ে নেয়ার পর থেকে ঘাঁটির পরিবেশে অস্বস্তিকর একটা টেনশন দেখা দিল। ইউ-ফরটিওয়ান রওনা হবে রাতে, রানার মনে হলো ক্রুরা না যেতে অস্বীকার করে বসে। ডকে যখন নেমে এল তারা, প্রায় সবাইকে হতাশ ও ক্লান্ত দেখাল। কিছু লোককে দেখে মনে হলো বিদ্রোহ করবে।

পরিবেশটা সামলে নিল ইউ-ফরটিওয়ানের কমান্ডার। অত্যন্ত শক্ত-সমর্থ কাঠামো, পা দুটো বাঁকা, র‍্যাম্প বেয়ে ডকে নেমে এলো হাসিতে উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে। কমোডরও রয়েছেন পাশে, তাঁকে নিজের বীরত্বের গল্প শোনাচ্ছে কমান্ডার—সুয়েজ ক্যানেল থেকে বেরতেই একটা মিশরীয় জাহাজকে কিভাবে তার ক্রুরা ডোবাল। মিশরীয়দের বোকামি এমন হাস্য-রসাত্মক ভঙ্গিতে বর্ণনা করল, ক্রুরা বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসতে লাগল, তারপর উঠে পড়ল সাবমেরিনে।

এক হপ্তা পর ইউ-ফরটিওয়ানকে ডুবিয়ে দিল মিশরীয় একটা টর্পেডো বোট।

ইউ-ফরটিওয়ানের পর বেশ কিছুদিন আর কোন সাবমেরিন ঘাঁটি ত্যাগ করেনি। সেই থেকে যে-ক'টা বোট ফিরে এল, সবগুলো ডকে ভেসে থাকল, ক্রুদের বলা হলো বিশ্রাম নিতে।

রানার মনে আছে আমেরিকান, ব্রিটিশ আর জাতিসংঘের জাহাজ তিনটে পরস্পরের কাছাকাছি পৌঁছুবে রবিবার বাইশে ফেব্রুয়ারি, ১৩ঃ৩০ ঘণ্টায়। এ-ও ভোলেনি যে জাতিসংঘের জাহাজটায় বাংলাদেশী সৈনিকরা আছে। তবে বাংলাদেশী সৈনিকরা মারা যাক বা না যাক, জাহাজগুলো ইসরায়েলিরা ডুবিয়ে দিতে পারলে যুদ্ধটা শুধু মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিন জোট আর ইরাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বলেই ওর বিশ্বাস। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবার আশঙ্কাটা সত্যি উড়িয়ে দেয়া যায় না। রানা উপলব্ধি করছে, ওর কাঁধে খুব ভারী একটা দায়িত্ব চেপেছে। যেভাবেই হোক সাবমেরিনগুলোকে ঘাঁটি থেকে বেরুতে বাধা দিতে হবে। চিন্তাটা আরেক সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করাল ওকে—নিজের জীবন বিসর্জন দেয়া। বদ্ধ একটা জায়গার ভেতর এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে একা কিছু করতে যাওয়া মানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ ঠিক তাই করতে হবে ওকে।

সেই রাতে রানা ঘুমাতে পারল না। অন্ধকারে শুয়ে চিন্তা করছে। রাত তিনটের দিকে গার্ড বদল হবার আওয়াজ পেল। খুবই ক্লান্ত বোধ করছে, তবু একটা প্ল্যান তৈরি না করে ঘুমাতে চাইছে না। একবার ভাবল হাদীর সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে পারলে হত, কিন্তু নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে সে। তাছাড়া, তার যে মানসিক অবস্থা, ধরে নেয়াই ভাল সে কোন সাহায্যে আসবে না। বরং তাকে কিছু না জানানোই উচিত হবে। যে লোক প্রায় পাগল হয়ে গেছে তার মুখ থেকে কখন কি বেরোয় কে বলতে পারে। আবার এ-ও সত্যি, রানা যখন যা করতে বলেছে, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেছে হাদী, একটি বারও আপত্তি বা অমান্য করেনি।

স্বভাবতই হাই এক্সপ্লোসিভের কথা ভাবছে রানা। ঘাঁটিতে ওগুলো প্রচুর পরিমাণে আছে। প্রশ্ন হলো, ওগুলোর কাছে যাবার উপায় কি। আচ্ছা, ওগুলো যদি নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়, তখন কি করবে ও? দুটো সম্ভাবনার কথা ভাবছে—এক, মিউনিশন স্টোরে আগুন ধরিয়ে গোটা ঘাঁটি উড়িয়ে দেয়া; দুই, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ঘাঁটিতে প্রবেশ করার পথটা বন্ধ করা। দুটোর মধ্যে শেষটাই বেশি পছন্দ হলো। তাতে করে, যত ক্ষীণই হোক, বেঁচে যাবার একটা আশা থাকে। তবে এটার খারাপ দিক হলো, সাবমেরিনগুলো অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেয়ে যাবে।

তারপর রানা ভাবল, এটাকে খারাপ দিক বলে মনে না করাই উচিত। প্রবেশপথ পরিষ্কার করে কমান্ডাররা সাবমেরিন নিয়ে সাগরে বেরিয়ে যাবে, এটা ঘটার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ঘাঁটিতে ঢোকার বা বেরুবার নির্দিষ্ট একটা এঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি আছে, প্রবেশপথ বিস্ফোরিত হলে সেই পদ্ধতিও অকেজো হয়ে যাবে, ফলে কমান্ডাররা সাবমেরিন নিয়ে বেরুতে পারবে না।

বরং কয়েকটা সাবমেরিন পেয়ে যাবে লেবানন। ওদের কোন সাবমেরিন নেই, কাজেই দরকারও।

এ-ধরনের আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল রানা। কিন্তু তারপরই, বোধহয় আধঘণ্টাও পেরোয়নি, গার্ডের চিৎকার শোনা গেল, 'ফেটিগ!'

বিছানা ছাড়তে বাধ্য হলো ওরা। রানার হাতঘড়িতে তখন পাঁচটা। ডকে এসে দেখল ঘাঁটিতে ঢুকছে সাবমারসিবল বার্জ। বার্জটাকে এই প্রথম দেখছে রানা। ছোট একটা স্টীমারের মত দেখতে। এ-ধরনের কোস্টাল বার্জ টেমস নদীতে দেখেছে রানা, জ্বালানি তেল বহন করে। সাইপ্রাস আর তেল আবিবের মধ্যে আসা-যাওয়া করে এটা, প্রতি জার্নিতে লেবানন উপকূলের এই ঘাঁটিতে ঢোকে, প্রতিবার সাইপ্রাস আর তেল আবিবে নোঙর ফেলে খালি ট্যাঙ্ক নিয়ে। কোন সন্দেহ নেই, কাগজ-পত্র সবই ভুয়া বা জাল।

ছ'টার খানিক পর নিজেদের সেলে ফিরে এল ওরা। চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে আছে রানা, গার্ড-রুম থেকে ভেসে আসা কাপ-পিরিচ ঠোকাঠুকির আওয়াজ শুনছে। ছ'টার দিকেই কফি দেয়া হয় ওদেরকে। চোখ বুজে চিন্তা করছে রানা। ঘাঁটির প্রবেশপথ বন্ধ করার সবচেয়ে ভাল উপায় হলো ডেপথ চার্জ। কিন্তু ডেপথ চার্জ কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আরেকটা উপায় হলো, ইউ-টোয়েন্টিওয়ানের আফটার টর্পেডো ফায়ার করা। সাবমেরিনটা চার নম্বর ডকে পড়ে আছে। সাতটা ডকের ঠিক মাঝখানে চার নম্বর ডক, সাবমেরিনের পিছনটা সরাসরি মূল গুহার দিকে ফেরানো। কাজেই টর্পেডোটা আঘাত হানবে গুহার এমন একটা অংশে, যার ঠিক নিচেই রয়েছে জলমগ্ন প্রবেশপথ। গুহা ধসে পড়ার পরিমাণ যদি কমও হয়, তবু পরিষ্কার করানোর জন্যে ডাইভার দরকার হবে ওদের, তা না হলে রেললাইনের ওপর ক্রেডলটা সাবলীলভাবে আসা-যাওয়া করতে পারবে না। কাজটা শেষ করতে ডাইভারদের সময় লাগবে। এমন কি রেলপথও বেঁকে যেতে পারে, সোজা না করা পর্যন্ত ক্রেডল আসা-যাওয়া করতে পারবে না।

তবে সমস্যা আছে। টর্পেডোগুলো মান্ধাতা আমলের, রাশিয়ার তৈরি, ইসরায়েলিরা কিনেছে ব্ল্যাকমার্কেট থেকে। এগুলোর ব্যবহার আজকাল প্রায় উঠেই গেছে, কাজেই ট্রেনিঙের সময় রানা শেখেনি কিভাবে এসব অপারেট করতে হয়।

আরেকটা সমস্যা হলো, ডক গেটগুলো খোলা আর সাবমেরিনটাকে ভাসমান অবস্থায় থাকতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে ওটা শুকনো একটা ডকে রয়েছে, ডকের পানি সরিয়ে ফেলা হয়েছে অনেক আগেই।

বাকি থাকল গানগুলো। ইউ-টোয়েনটিওয়ানের আফটার সিক্স ইঞ্চ গান ভাল অবস্থাতেই আছে, তবে রানা নিশ্চিত নয় একটা ছয় ইঞ্চি শেল পাথরের কতটুকু ক্ষতি করতে পারবে। তাছাড়া, শেল পাবে কোথায় ও? গার্ডকেই বা ফাঁকি দেবে কিভাবে?

সেলের তালায় চাবি ঢোকানোর আওয়াজ হলো, দরজা খুলে ভেতরে মাথা গলাল একজন পেটি অফিসার। 'ডিউটি!' হাঁক ছাড়ল সে। তাড়াতাড়ি

কাপড় পরে নাস্তা সারল রানা, ইউ-টোয়েনটিওয়ানের আফটার গান দখল করার উত্তেজনাকর প্ল্যান মাথায় নিয়ে শুরু করল দিনের কাজ। প্রবেশপথ বন্ধ করার এটাই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পন্থা বলে ভাবছে ও। আজ বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারির উনিশ তারিখ। রঁদেভো রবিবার, বাইশে ফেব্রুয়ারি, দুপুর দেড়টায়। এর মানে হলো সাবমেরিনগুলো ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়ে যাবে শনিবার রাতে। এখন থেকে শনিবার সন্ধে পর্যন্ত ওর হাতে সময় আছে, এরই মধ্যে জেনে নিতে হবে গানগুলো কিভাবে কাজ করে, শেল হাতে পাবার উপায় কি ইত্যাদি। এ এক ভয়ঙ্কর দায়িত্ব। সারাক্ষণ চিন্তা করছে বলে কাজে ঢিল পড়ল, সেজন্যে বেশ কয়েকবার ধমকও খেতে হলো ওকে।

পুরোটা সকাল স্টীভিডর হিসেবে কাজ করতে হলো ওদেরকে। স্টোর বার্জ থেকে রসদ ও অন্যান্য মালামাল নামিয়ে ট্রলিতে সাজাতে হলো, ট্রলিগুলোকে ঠেলে ঘাঁটির বিভিন্ন স্টোর-রুমে পৌঁছে দিতে হলো, কিছু গেল প্রতিটি ডকের পিছনের স্টোর-রুমে, পরে ওখান থেকে সাবমেরিনে তোলা হবে। বাকিগুলো গেল আপার গ্যালারি দুটোর কয়েকটা স্টোরে, ঘাঁটির লোকজন ব্যবহার করবে। বার্জে আর স্টোর-রুমগুলোয় কাজ করছে প্রায় পঞ্চাশজনের মত লোক। রসদ চুরি হতে পারে, এ আশঙ্কা থাকায় গার্ডের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। কাজ ছেড়ে এদিক ওদিক তাকানোর ফুরসতই পেল না রানা।

তবে লাঞ্চের পর ছোট্ট একটা সুযোগ পাওয়া গেল। চার নম্বর ডকে নিয়ে যাওয়া হলো ওদেরকে। এখানে কিছু লোক একটা মোবাইল অটোমেটিক ড্রিল নিয়ে কাজ করছে। আবর্জনা সরাবার জন্যে কোদাল আর ঝাড়ু দেয়া হলো ওদের। আসল ঘটনাটা কি ঘটছে বুঝতে রানার সময় লাগল না। চার নম্বর ডকের সাবমেরিন থেকে ফরওয়ার্ড গান সরিয়ে ফেলতে হবে, কারণ তা না হলে তুবড়ে যাওয়া ডেকপ্লেট মেরামত করা সম্ভব নয়। ফরওয়ার্ড গানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেটারও মেরামতি দরকার। ওঅর্কশপ এঞ্জিনিয়াররা ডকসাইটেই সেটা মেরামত করবে। ওরা ওখানে পৌঁছানোর আগেই মাউন্টিং থেকে বোল্টগুলো খুলে ফেলা হয়েছে। তবে ডকসাইটে ওটাকে ঝোলাবার জন্যে একটা ডেরিক খাড়া করতে হবে। ডেরিকের একটা পা ডকের উল্টোদিকের গায়ে ঠেকিয়ে রাখা যাবে, কিন্তু ডেরিকের ছোট আরও দুটো পা স্থির রাখার জন্যে ডকের মেঝেতে গর্ত করতে হচ্ছে।

প্রথমে ছোট পকেটটা তৈরি করতে দশ মিনিট লাগল। গ্র্যানিট এখানে লোহার মতই শক্ত, ড্রিলের ডগা থেকে চারদিকে পাথরের টুকরো ছুটছে। কিন্তু দ্বিতীয় গর্তটা খুব সহজেই খোঁড়া গেল, কারণ ওখানে একটা ফল্ট বা ফাটল আছে, দেখে মনে হয় জায়গাটায় পাথরের স্তর বেশ নরমও। কোদাল দিয়ে আবর্জনা টেনে আনার সময় রানা লক্ষ করল, গর্ত থেকে আসলে লাইমস্টোন উঠে এসেছে। জিয়োলজিকাল ফরমেশন সম্পর্কে এক-আধটু যার ধারণা আছে তার কাছে ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং বলে মনে হবে। পাথরগুলো খুব ভালভাবে পরীক্ষা করল রানা। তাকরির উপকূলে প্রচুর খনি

আছে, যদিও বেশিরভাগই পরিত্যক্ত। এ-ধরনের দু'একটা পরিত্যক্ত খনিতে ঢুকেছেও রানা, টানেলের দেয়ালে ঠিক এই জাতের লাইমস্টোনই দেখেছে।

গর্তটা বেশ গভীর আর একটু লম্বা করে খোঁড়া হলো, ফলে পাথরের স্তরে ফাটলটা কোন দিকে গেছে আন্দাজ করতে সুবিধে হলো রানার। কৌতূহলই এই কাজে উৎসাহ যোগাল ওকে। মেইন গ্যালারি হয়ে উল্টোদিকের স্টোর গ্যালারির দিকে চলে গেছে ফাটলটা, ক্রমশ চওড়া হয়ে।

এরপর রানা গানের ওপর মনোযোগ দিল। ওরা আবর্জনা সরাবার কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ করল দেখে গার্ডরা খুশি, তারা এখন কৌতূহল নিয়ে গানটাকে ডকসাইটে ঝোলাবার কাজ দেখছে।

ডেরিকের লম্বা পা থেকে ঝুলছে ওটা, চেইনের শেষ মাথায়, ধীরে ধীরে নেমে আসছে ডকসাইটে, রানার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে। অস্ত্রটা পরীক্ষা করার যথেষ্ট সময় পাওয়া গেল। ব্রিচ মেকানিজম কিভাবে কাজ করে বুঝতে পারল ও, শুধু বুঝতে পারল না কিভাবে ফায়ার করা হয়। শেল হাতে পাওয়াটা এখনও একটা সমস্যা মনে হচ্ছে। অস্ত্রের নিচে কোথাও ম্যাগাজিন আছে, জানে ও, কিন্তু জানে না লিফট কিভাবে কাজ করে।

হঠাৎ রানার মনে পড়ল, যুবা বয়েসে লেবানীজ নৌ-বাহিনীতে কাজ করেছে হাদী।

'তুমি জানো, কামানটা কিভাবে কাজ করে?' নিচু গলায় জানতে চাইল ও।

রানার দিকে দ্রুত তাকাল হাদী। তারপর ভুরু কোঁচকাল। 'মনে হচ্ছে জানা উচিত,' ধীরে ধীরে বলল। 'কিন্তু কিছুই মনে পড়ছে না।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। এ-ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না।

কিভাবে ফায়ার করতে হয়, নিজের চেষ্টায় সেটা জানতে হবে রানাকে। ব্যারেলটাকে খুলতে দেখল ও, খুলতে আর বন্ধ করতে দেখল ব্রিচ, হ্যান্ডগিয়ারের সাহায্যে ফায়ারিং পজিশন অলটার করতে দেখল, কিন্তু তারপরও বুঝতে পারছে না কিভাবে ওটা ফায়ার করা হয়।

ঠিক এই সময় দূর থেকে কে যেন চিৎকার করে বলল, 'ইমার্জেন্সী!'

ওদের দু'জন গার্ড অনিশ্চিত ভঙ্গিতে পরস্পরের দিকে তাকাল। চিৎকারটা আরও কাছে সরে এল, গলাটাও অন্য কোন লোকের। একটাই শব্দ, 'ইমার্জেন্সী!'

সবাই যে যার কাজ ফেলে স্থির হয়ে গেছে, কান পেতে অপেক্ষা করছে। গ্যালারির পাথুরে মেঝেতে ভারী বুটের ছুটোছুটি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ডক সাইটেও অস্থির হয়ে উঠল লোকজন। চারদিক থেকে আরও লোক ছুটে আসছে। আবার সেই চিৎকার শোনা গেল, 'ইমার্জেন্সী!' তারপর বেজে উঠল কান ঝালাপালা করা বেল।

'ইমার্জেন্সী অ্যালার্ম বেল!' একজন এঞ্জিনিয়ার বলল, হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে।

আরেকজন এঞ্জিনিয়ার রুদ্ধশ্বাস জবাব দিল, 'হ্যাঁ, তারমানে অ্যাকশন স্টেশন!'

এরপর ডকসাইট থেকে সবাই গ্যালারির একটা প্রান্ত লক্ষ্য করে ছুটল। ওদের একজন গার্ডও পিছু নিল। দ্বিতীয় গার্ড ইতস্তত করে কি যেন বলল, ইঙ্গিতে ওদেরকে দেখিয়ে। কিন্তু প্রথম গার্ড থামল না।

ডকসাইট খালি হয়ে গেছে। রানা ও হাদীর সঙ্গে এখন মাত্র একজন গার্ড। এরকম সুযোগ আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। হাদীর দিকে তাকাল রানা। নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা চেহারা, যেন অস্বাভাবিক যে ঘটনাটা ঘটছে সে-ব্যাপারে তার কোন ধারণাই নেই। গার্ড তাকিয়ে আছে ডকের শেষ মাথায় গ্যালারির দিকে, যদিও সেদিকে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আপার গ্যালারি দুটো থেকে শোরগোলের শব্দ ভেসে আসছে, কান পেতে শুনছে সে। অফিসাররা চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে, রাইফেলের বাঁট বাড়ি খাচ্ছে পাথরে, এ-সব রানাও শুনতে পাচ্ছে। গোটা ঘাঁটি জুড়ে এখনও চলছে লোকজনের ছুটোছুটি।

গার্ড নড়ছে না, এখনও ডকের শেষ মাথায় তাকিয়ে। ধীরে ধীরে গ্যাঙওয়ের দিকে সরে আসছে রানা, এইপথে সাবমেরিনে ওঠা যাবে। প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় চোখের কোণ দিয়ে ওকে দেখে ফেলল গার্ড, চোখের পলকে কোমরের হোলস্টার থেকে হাতে চলে এল রিভলভারটা। 'হল্ট!'

গার্ডের ঠিক পিছনে রয়েছে হাদী। ব্যাপারটা কি স্রেফ কাকতালীয়? প্রবল এক উত্তেজনাকর মুহূর্তে রানা ভাবল, গার্ডকে কাবু করতে যাচ্ছে সে। তারপরই গ্যালারি থেকে ডকের শেষ মাথায় বেরিয়ে এল ছুটন্ত লোকজন। দুই সারিতে মার্চ করে ডকেই আসছে তারা। তারপর আরও কয়েকটা লাইন দেখা গেল, রেটিংরা অন্যান্য ডকের দিকে যাচ্ছে। ওদের গার্ডের পেশীতে ঢিল পড়ল।

সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

রেটিংরা সবাই পুরোপুরি সশস্ত্র, প্রতি দলের সঙ্গে একজন করে অফিসার রয়েছেন। ইউ-টোয়েনটিওয়ানের ক্রুরাও এক লাইনে ফিরে এল। ইমার্জেন্সী অ্যালার্ম বেল বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে অস্ত্র নিয়ে যার যার কোয়ার্টারের বাইরে রিপোর্ট করতে হয়েছিল। এখন প্রত্যেকে তার সংশ্লিষ্ট ডকে ফিরে এসেছে, পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। প্রতি সাবমেরিন থেকে দশজন করে লোককে ইমার্জেন্সীর সময় বেস গার্ডদের সঙ্গে ডিউটি দিতে হয়। অ্যালার্মের শব্দ পাওয়া মাত্র গার্ড-রুমে রিপোর্ট করেছে তারা। শেষ সাবমেরিনটা ঘাঁটি ছেড়ে নিরাপদে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ঘাঁটি রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হবে তাদেরকে। সবগুলো সাবমেরিন চলে যাবার পর—তাতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে, কারণ ডক জলমগ্ন করার জন্যে জোয়ারের অপেক্ষায় থাকতে হবে—ঘাঁটির অংশবিশেষ ধ্বংস করার দায়িত্বও তাদের। ঘাঁটিতে সাদ্দাম হোসেনের ছবি আছে, গোলা-বারুদ আর

আগ্নেয়াস্ত্রের বাক্সের গায়ে লেখাগুলো আরবী হরফে, এ-সব বেশিরভাগ রাশিয়ার তৈরি হলেও, লেখাগুলো পড়লে বোঝা যাবে সবই আরব-আমিরাত, সিরিয়া, লিবীয়া অথবা জর্দান থেকে এসেছে। এই কৌশলের একটাই কারণ, ঘাঁটির অস্তিত্ব যদি কোনদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে সবাই জানবে এটা ইরাকীদের ছিল। তাসত্ত্বেও, ঘাঁটিতে কিছু কিছু এমন জিনিস আছে যা দেখলে পরিষ্কার হয়ে যাবে এখানে ইসরায়েলিরা ছিল। শুধু ঘাঁটিতে নয়, সাবমেরিনগুলোতেও তা আছে। এগুলো ধ্বংস করাই তাদের কাজ, অচল সাবমেরিন সহ। সবশেষে তাদেরকে আত্মহত্যা করতে হবে। কোন অবস্থাতেই আত্মসমর্পণ করা যাবে না। এরা সবাই সুইসাইড স্কোয়াড-এর সদস্য, তাতে কোন সন্দেহ সেই। আত্মহত্যাও এমনভাবে করতে হবে , একটা লাশও যাতে সনাক্ত করা না যায়। কয়েকশো টন হাই এক্সপ্লোসিভ আর বিপুল পরিমাণ ফুয়েল অয়েল বিস্ফোরিত হলে সনাক্তকরণের কোন প্রশ্ন থাকে না।

একটা আন্ডারগ্রাউন্ড ঘাঁটিতে এ-ধরনের কঠিন ইমার্জেন্সী রেগুলেশন কেন দরকার, রানা বুঝতে পারল না। এটা তো পরিষ্কারই যে আন্ডারওয়াটার প্রবেশপথের ওপর পাহাড়-প্রাচীর কামানের গোলায় ধসিয়ে দেয়া ছাড়া অন্য কোনভাবে সাগর থেকে এই ঘাঁটি আক্রমণ করা সম্ভব নয়। এরকম ভাবারও কোন কারণ নেই যে ঘাঁটি ছেড়ে চলে যাবার সময় সাবমেরিনগুলোকে লেধানীজ বা মিশরীয় টর্পেডো বোট দেখে ফেলবে, তারপর টর্পেডো ছুঁড়ে ডুবিয়ে দেবে, কারণ বেরিয়ে যাবার সময় প্রতিটি সাবমেরিনের সঙ্গে একটা করে বয়া থাকে, হলিজ গিয়ারের সঙ্গে অটোমেটিক কাপলিং-এর দ্বারা যুক্ত সাবমেরিন সারফেসে না উঠেও ওটাকে রিলিজ করে দিতে পারে—অর্থাৎ ঘাঁটি থেকে বেরিয়েই সারফেসে ওঠার দরকার নেই, পানির নিচে দিয়ে ইচ্ছে মত যতদূর খুশি চলে যেতে পারবে। তার ওপর একজন লুক-আউটও আছে। আপার গ্যালারির একটা গুহা চলে গেছে পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা পর্যন্ত, রানা ও হাদীর সেলের ঠিক পিছন দিয়ে। ঘাঁটির বাইরে আশপাশে কোন যুদ্ধ-জাহাজ আছে কিনা সাবমেরিন কমান্ডারকে তা আগেই জানিয়ে দিতে পারে লুক-আউট।

এর তাৎপর্য হলো, সাগর নয়, ডাঙা থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, ডাঙার দিক থেকে যদি ঘাঁটিতে ঢোকার কোন পথ থাকে, তাহলে বেরিয়ে যাবার কোন পথ কেন থাকবে না? চিন্তাটা রানার মনে আশা ও পুলক জাগিয়ে তুলল। এখন জানার চেষ্টা করতে হবে সেই পথটা কোথায়।

ওদের দ্বিতীয় গার্ড ফিরে এল। 'ওদেরকে ওদের সেলে রেখে আসতে হবে,' প্রথম গার্ডকে বলল সে। ছুটোছুটি করায় ঘেমে গেছে লোকটা, রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

'কি ঘটল?' প্রথম গার্ড জানতে চাইল।

'জানি না···এখনও কিছু ঘটেনি। মিনিট কয়েক আগে গার্ড-রুমের ইমার্জেন্সী অ্যালার্ম বেজে উঠেছিল। কি ঘটেছে দেখার জন্যে আটজনকে পাঠানো হয়েছে। এসো, আগে ওদেরকে সেলে ভরি। তারপর গার্ড-রুমে রিপোর্ট করতে হবে। ইমার্জেন্সী গার্ডদের তলব করা হয়েছে, সবাইকে স্ট্যান্ড বাই অবস্থায় থাকতে বলা হয়েছে।'

ওদেরকে মার্চ করতে বলা হলো। ইতিমধ্যে আবার ডকসাইট খালি হয়ে গেছে। ইউ-টোয়েনটিওয়ানের ক্রুরা নিজেদের স্টেশনে চলে গেছে। জোয়ার শুরু হয়েছে, কলকল ছলছল শব্দে ভরে উঠছে ডক। কমান্ডার আর ফার্স্ট অফিসার ব্রিজে দাঁড়িয়ে। সাগরে বেরুবার জন্যে এখনও তৈরি নয় সাবমেরিন, তবু কমোডরের নির্দেশে বেরিয়ে যাবার প্রস্তুতি চলছে।

গ্যালারিতে নামার ও র‍্যাম্প বেয়ে ওঠার সময় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে গার্ডরা, কান পেতে শুনছে রানা।

প্রথম গার্ড, 'আমরা কি আক্রান্ত হয়েছি?'

দ্বিতীয় গার্ড, 'আমি জানি না।'

প্রথম গার্ড, 'কিন্তু তাহলে এত ছুটোছুটি কিসের? অ্যালার্মটাই বা কে বাজাল?'

দ্বিতীয় গার্ড, 'এখনও কেউ কিছু বলতে পারছে না। তবে তদন্ত করে দেখার জন্যে লোক পাঠানো হয়েছে।'

প্রথম গার্ড, 'ব্যাপারটা তাহলে হয়তো ফলস অ্যালার্ম?'

দ্বিতীয় গার্ড, 'হতে পারে।'

প্রথম গার্ড, 'ধরো আক্রান্ত হলাম—তখন আমরা কি করব?'

দ্বিতীয় গার্ড, 'আমি কে—কমোডর আয়ান পেরেজ? আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ!'

প্রথম গার্ড, 'কি ঘটবে আমি জানি। আমরা সাবমেরিন সার্ভিসের লোক নই, আমাদেরকে আনা হয়েছে সুইসাইড স্কোয়াড থেকে। সবাইকে পালাবার সুযোগ করে দেয়াই আমাদের কাজ। সবাই চলে গেলে এগজিট গ্যালারি উড়িয়ে দেব আমরা, নিজেরা ভেতরে আটকা পড়ব।'

ওদেরকে সেলে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দেয়া হলো। বুটের শব্দ শোনা গেল, সেলের উল্টোদিকের গার্ড-রুমে যাচ্ছে গার্ডরা। তারপর অপার্থিব একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল গোটা ঘাঁটিতে। ইউ-টোয়েনটিওয়ান রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, দেখে এসেছে রানা, তা বোধহয় স্থগিত করা হয়েছে। এ সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা—কোথাও কোন শব্দ নেই, নেই কোন নড়াচড়া। সমস্ত মেশিনারি, এমনকি জেনারেটরগুলোও থামিয়ে দেয়া হয়েছে। এক ধরনের হতাশায় ছেয়ে গেল রানার মন। উত্তেজক কিছু একটা ঘটছে। এমন কিছু, যা ওদের জীবনের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে। অথচ সেলের ভেতর আটকা পড়ে আছে ওরা, জানার উপায় নেই কি ঘটছে। ব্যাপারটা পুরোপুরি অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স।

হাদীর দিকে তাকাল রানা, বিছানায় পাথুরে মূর্তির মত বসে আছে। তবে সে-ও বোধহয় কান পেতে আছে, কিছু শুনতে পাবার আশায়। হয়তো বুঝতে পারল রানা তাকিয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে জানতে চাইল, 'কি ঘটছে, স্যার?'

'বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল রানা। সেলের মেঝেতে পায়চারি শুরু করল ও। কিন্তু জায়গাটা এত ছোট, খানিক পর ফিরে এসে বিছানায় বসে পড়ল আবার।

সময় বয়ে চলেছে। নিস্তব্ধতা কাটছে না। ওরাও নড়ছে না। এভাবে পনেরো মিনিট পার হলো।

কল্পনার চোখে কয়েকটা দৃশ্য দেখছে রানা। ঘাঁটির পিছন দিকে কোথাও আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল আছে। সেই টানেল ধরে ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করছে লেবানীজ আর্মির লোকজন। গার্ডরা তাদেরকে ঠেকাবার জন্যে যুদ্ধ করছে। এই ফাঁকে সাবমেরিনগুলো একে একে বেরিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, সময়টা এখন দিন হলেও। ডকগুলোয় পাঁচটা সাবমেরিন আর একটা বার্জ আছে, বেরিয়ে যেতে কতক্ষণ সময় নেবে ওগুলো? তিন ঘণ্টা? চার ঘণ্টা? তারপর কি ঘটবে? ওরা কি ঘাঁটিটা পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে?

অটুট নিস্তব্ধতা স্নায়ুর ওপর ভারী বোঝার মত চেপে বসছে।

তারপর হঠাৎ কয়েকজনের গলা শোনা গেল। একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ ভেসে এল। তারপর আবার সেই নিস্তব্ধতা। আরও দশ মিনিট পার হলো। গার্ড-রুমের দরজা খোলার আওয়াজ পেল রানা, বুট পায়ে কারা যেন ছুটছে গ্যালারির দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বহু লোকের মৃদু গুঞ্জন ভেসে এল দূর থেকে। তারপর বুটের শব্দ। আবার চালু হয়ে গেল জেনারেটর। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ঘাঁটির পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

'ব্যাপারটা কি ছিল বোঝা গেল না,' বলল রানা, কৌতূহলে মরে যাচ্ছে। 'হয়তো ফলস অ্যালার্ম। কিংবা রিহার্সেল।'

হাদী কথা বলল না, তবে কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে। রানার ইচ্ছে হলো কথা বলে তার মনটা হালকা করে, কিন্তু শুরু করেও থেমে গেল, হাদী যেন এ জগতেই নেই।

চুপচাপ বসে থাকল দু'জন। সাড়ে চারটের একটু পর গ্রিল খুলে গেল। ভেতরে কেউ তাকাল, মুহূর্তের জন্যে রানা শুধু তার নাক আর চোখ দেখতে পেল, আবার বন্ধ হয়ে গেল গ্রিল। বাইরে পাথুরে মেঝেতে বুটের শব্দ, ওদের ডান দিকের সেলের দরজা খুলল ও বন্ধ হলো। কারা যেন ফিসফাস করছে, কিন্তু পাথুরে দেয়াল এত নিরেট আর মোটা যে ভাষাটা ধরতে পারল না। ডান দিকের সেলের দরজা বন্ধ হবার আওয়াজটা খুব জোরাল লাগল কানে, তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দও শোনা গেল। একটু পর গার্ড-রুমের দরজাও বন্ধ হলো।

আরও পনেরো মিনিট কাটল। হাদীর মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে।

একবার রানার মতই সেলের মেঝেতে পায়চারি শুরু করল সে; কিন্তু ছোট্ট জায়গায় প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে হাঁটতে অসুবিধে হওয়ায় আবার বিছানায় বসে পড়ল। ইতিমধ্যে রানা আরেকটা সম্ভাবনা নিয়ে ভাবছে। ঘাঁটিতে বিদ্রোহ দেখা দেয়নি তো? ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। ঘাঁটির লোকজন নিরাপদ বোধ করছে না। কেউ তারা খুশি নয়। ইউ-ফরটিওয়ানের রওনা হবার মুহূর্তটা মনে পড়ে গেল ওর। কমান্ডার পরিস্থিতিটা কোন রকমে সামাল দিতে পেরেছিল।

তবে বিদ্রোহ না করার পিছনেও একটা কারণ আছে। তা হলো, গত কয়েকদিন ধরে সবাই খুব উত্তেজনার সঙ্গে অপেক্ষা করছে বড় অপারেশনটার জন্যে—ব্রিটিশ, আমেরিকান ও জাতিসংঘের জাহাজ তিনটেকে ডুবিয়ে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে। এ-ধরনের ভয়ঙ্কর ও গুরুত্বপূর্ণ কোন অপারেশনের আগে বিদ্রোহ করার কথা নয়। না।

সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিল রানা, আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিস্ফোরণের ভোঁতা একটা আওয়াজ ভেসে এল দূর থেকে। দূরে হলেও, যে পাথর কেটে ওদের সেল তৈরি করা হয়েছে সেটা কেঁপে উঠল। পরমুহূর্তেই আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটল। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ। দু'জনেই ওরা নিজেদের অজান্তে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঘাঁটির লোকেরা কি সাবমেরিনগুলোকে বাতিল লোহায় পরিণত করছে? আপন মনে মাথা নাড়ল রানা। দুটো সাবমেরিন ধ্বংস করার জন্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হলে তার আওয়াজ আরও অনেক গুণ বেশি হত। অ্যামুনিশন স্টোরেও আগুন দেয়া হয়নি। আওয়াজ দুটো অনেক দূর থেকে এসেছে। তাহলে কি সাগর থেকে ঘাঁটির প্রবেশমুখে কামানের গোলা ছোঁড়া হয়েছে?

গার্ড-রুমের দরজা খোলা হলো, পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তারপর ওদের বাম দিকের সেলের দরজা খোলা হলো। কারা যেন ফিসফাস করছে। সেলটার দরজা বন্ধ হলো, তালাও দেয়া হলো, পায়ের আওয়াজ ফিরে এল গার্ড-রুমের দিকে। আবার নীরব হয়ে গেল আশপাশের পরিবেশ। উদ্বেগে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে রানা। বিছানায় বসার জন্যে নিজের ওপর জোর খাটাতে হলো, উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে।

হাদী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। মুখ তুলে তার দিকে তাকাল রানা। স্থির হয়ে আছে হাদী, বিশাল শরীর দরজার গায়ে হেলান দেয়া। তবে চেহারায় জ্যান্ত ভাব, নিষ্প্রাণ মূর্তির মত লাগছে না। রানা বুঝতে পারল, কি যেন শোনার চেষ্টা করছে সে। কান পাতল ও। কিন্তু কিছু শুনতে পেল না। বিছানায় ফিরে এসে দেয়ালে কান ঠেকাল হাদী। দেখাদেখি রানাও তাই করল। কিন্তু তবু কিছু কানে আসছে না। নিজের বিছানায় ফিরে এল ও, ভাবছে হাদীকে আর কতক্ষণ এই টেনশনে ভুগতে হবে। এভাবে চলতে থাকলে সে না পুরোপুরি পাগল হয়ে যায়।

একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল রানা। কিন্তু পড়ায় মন বসাতে পারছে না। মাঝে মধ্যে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। হাদী এখনও পাথুরে

দেয়ালে কান ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে।

এক সময় ম্যাগাজিন রেখে দিল রানা। 'কিছু শুনছ?' জানতে চাইল।

'না। আপনি, স্যার?'

মাথা নাড়ল রানা। আবার ম্যাগাজিনটা তুলে নিল।

পাঁচ মিনিট পর নক হলো দরজায়। চোখ তুলল রানা। ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাদী, আঙুলের উল্টোপিঠ দিয়ে ড্রাম বাজাচ্ছে দরজায়। বাইরের গ্যালারিতে পায়ের শব্দ হলো। থেমে গেল হাদী। গার্ড-রুমের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনে আবার শুরু করল।

'হাদী, এখানে এসে বসো, তোমাকে আমি একটা গল্প পড়ে শোনাই,' বলল রানা।

জবাব না দিয়ে হাত লম্বা করল হাদী, নিজের বিছানায় পড়ে থাকা প্লেট থেকে একটা চামচ তুলে নিল। এবার ওই চামচ দিয়ে গ্রিলের গায়ে বাড়ি মারতে শুরু করল সে। তার এই পাগলামি রানার স্নায়ুতে আঘাত করছে।

'কি বললাম, এদিকে এসে বসো,' বলল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল হাদী। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে। 'স্যার,' জিজ্ঞেস করল সে, 'আপনি যে পত্রিকার রিপোর্টার, কি যেন নাম সেটার?'

'মর্নিং নিউজ,' বলল রানা। 'কেন?'

কিন্তু জবাব না দিয়ে আবার সে গ্রিলে চামচ ঠুকতে শুরু করল, তবে এবার মৃদু শব্দে। তারপর হঠাৎ থেমে গেল, কুকুরের মত মাথাটা একদিকে কাত করে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে।

সামান্য হলেও নার্ভাস বোধ করছে রানা। রাতের খাবার আসতে আরও দু'ঘণ্টা বাকি। তার আগে ডাক্তারকে খবর পাঠানো সম্ভব বলে মনে হয় না।

এই সময় হঠাৎ ওর দিকে ঘাড় ফেরাল হাদী। 'এখানে একটা পেন্সিল আছে,' বলল সে। ফতুয়ার পকেট থেকে দেড় ইঞ্চি লম্বা একটা পেন্সিল বের করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিল সে। 'আমি যা বলব, লিখুন।' গ্রিলে আবার চামচ ঠুকতে শুরু করল। খানিক পর থামল, কান পেতে আছে। 'আ-মি,' ফিসফিস করল, 'এ-খা-নে বিরতি এ-র্সে-ছি বিরতি—,' বানান করে করে শব্দগুলো উচ্চারণ করছে সে, ধীরে ধীরে, মাঝে মধ্যে দুটো হরফের মাঝখানে দীর্ঘ বিরতি নিচ্ছে। 'স-ঙ্গে বিরতি মা-নু-ষ বিরতি আ-ছে।' লোহার গ্রিলে আবার চামচ ঠুকল সে। 'বা-তি-ল বিরতি তি-ন-জ-ন বিরতি মা-ই-না-র—'

রানা নিখোঁজ হবার তিনদিন পর তাকরির উপকূলে পৌঁছুল শায়লা শারমিন, রানা এজেন্সির বৈরুত শাখা থেকে। উপকূলে আসলে কি ঘটেছে সে-সম্পর্কে একটা রিপোর্ট বৈরুতে থাকতেই পেয়েছে সে, লেবানীজ নৌ-বাহিনীর হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

লেবানীজ নৌ-বাহিনী আগেই খবর পেয়েছিল যে বিদেশী কোন রাষ্ট্রের

একটা সাবমেরিন উপকূলে ভিড়বে, উদ্দেশ্য সম্ভবত একজন স্পাইকে তীরে পৌঁছে দেয়া। সাবমেরিনটার অপেক্ষায় একটা লেবানীজ টর্পেডো বোট উপকূলে অপেক্ষা করছিল। সাবমেরিন পানির ওপর মাথা তুলেই একটা রাবার বোট ছেড়ে দেয়। টর্পেডো বোট রাবার বোটকে ধাক্কা দেয়ার চেষ্টা করে, একই সঙ্গে ফায়ার ওপেন করে সাবমেরিনকে লক্ষ্য করে। সাবমেরিন থেকেও গুলি করা হয়। রাবার বোটকে ধাক্কা মারা সম্ভব হয়নি, আরোহীরা সাবমেরিনে উঠে পড়ে। টর্পেডো বোট থেকে এবার একটা টর্পেডো ছোঁড়া হয়, কিন্তু লাগাতে পারেনি। সাবমেরিন তলিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে ওই জায়গায় ডেপথ চার্জ করে টর্পেডো বোট। কিছুক্ষণ পর পানিতে তেল ভেসে উঠতে দেখে ক্রুরা ধরে নেয় সাবমেরিন ধ্বংস হয়ে গেছে। তীরে সাবমেরিনের অপেক্ষায় ছিল মাসুদ রানা নামে একজন মিশরীয় রিপোর্টার ও স্থানীয় জেলে আল হাদী। দু'জনেই তারা নিখোঁজ হয়েছে।

তাকরিরে এসে দু'দিন তদন্ত চালিয়েই রিপোর্টে কোথায় ভুল আছে ধরে ফেলল শারমিন। সাবমেরিনটা কাউকে নামাতে আসেনি, বরং আগের রাতে নামানো এক লোককে তুলে নিতে এসেছিল। তথ্যটা সে কোস্টগার্ড শমসের লিবানের স্ত্রীর কাছ থেকে পেল। শমসের লিবানই নৌ-বাহিনী হেডকোয়ার্টার বৈরুতকে সাবধান করে দিয়েছিল। তার স্ত্রীর কাছ থেকে আরও জানা গেল, রানা ও হাদী মুয়াক্কা খাঁড়ির মুখে, পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় অপেক্ষা করছিল, আগের রাতে সাবমেরিন থেকে নামা বিদেশী লোকটাকে ফিরতে দেখলে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে। স্থানীয় পুলিসের ধারণা, দু'জনেই ধরা পড়ে গেছে সাবমেরিন থেকে নেমে আসা লোকজনের হাতে। নিশ্চয় সাবমেরিনেই তাদেরকে তোলা হয়। পুলিস ও স্থানীয় লোকজন সন্দেহ করছে, ডেপথ চার্জের ফলে সাবমেরিনটা ধ্বংস হয়নি।

সাবমেরিনের রাবার বোট যেখানে ভিড়েছিল, মুয়াক্কা খাঁড়ির সেই জায়গাটা দেখল শারমিন। পাহাড়ের উল্টোদিকের ঢালে জেলেদের গ্রামেও গেল, দেখে এল দোস্তানা নামের কটেজটা। প্রথম রাতে সাবমেরিন থেকে নেমে আসা লোকটা এই দোস্তানা কটেজটা কোথায় জানতে চেয়েছিল রানার কাছে।

শমসের লিবান টর্পেডোবোটে ছিল, এখন সে হাসপাতালে। সাবমেরিনের গোলায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় টর্পেডোবোট, ডুবতে ডুবতে কোন রকমে টিকে গেছে। শমসের লিবান এমন শক পেয়েছে, কোন কথাই বলতে পারছে না। ডাক্তাররা বলছেন, সে হয়তো জীবনে আর কথাই বলতে পারবে না। রানা আর হাদী দ্বিতীয় রাতে যেখানে অপেক্ষা করছিল সেই জায়াগাটা দেখে এসেছে শারমিন। মাটিতে ধস্তাধস্তির চিহ্ন দেখে তারও ধারণা হলো, রানা ও হাদীকে বন্দী করে সাবমেরিনের একটা বোটে তোলা হয়, বোটটা সাবমেরিনে পৌঁছুতেও পারে। তারপর জানা গেল ওটা ছিল কলাপসিবল রাবার বোট, ঘটনার পরদিন উপকূল থেকে কয়েক মাইল দূরে পাওয়া গেছে।

ঘটনার দিন রাতেই দোস্তানার ভাড়াটে জামালু দীনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বছর দুই হলো তাকরির উপকূলে আছে সে। বৈরুতের একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করত, ওই বছর দুয়েক আগেই অবসর নিয়েছে। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানা গেল প্রায়ই সে দোস্তানা ছেড়ে কোথায় যেন চলে যেত, ফিরতে অনেক সময় বিশ-পঁচিশ দিন লেগে যেত। স্থানীয় নয়, এমন অনেক লোক তার সঙ্গে দেখা করতেও আসত দোস্তানায়।

স্থানীয় পুলিস জামালু দীনকে গ্রেফতার করে বৈরুতের সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে, সেখানে তাকে জেরা করেছে লেবানীজ ইন্টেলিজেন্স। রানা এজেন্সির বৈরুত শাখা থেকে টেলিফোনে রিপোর্ট পেল শারমিন, জামালু দীন কোন তথ্য দিতে রাজি হয়নি। তবে ইন্টারোগেশন এখনও চলছে।

সব মিলিয়ে পরিস্থিতি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। শারমিনের তদন্ত এগোতে চাইছে না। লেবানীজ ইন্টেলিজেন্সে লোকবল এতই কম যে তাকরিরে তারা নিজেদের কাউকে পাঠাতে পারছে না। স্থানীয় পুলিস সাহায্য করছে তাকে, কিন্তু তা যথেষ্ট বিবেচিত হচ্ছে না। শারমিন অবশ্য হাল ছাড়তে রাজি নয়, তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। জামালু দীনকে বৈরুতে পাঠিয়ে দেয়া হলেও, গত পাঁচ দিন ধরে তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের আশায় গোটা এলাকা চষে ফেলছে সে।

তারপর এক হোটেলের একজন ওয়েটার ওকে এমন একটা তথ্য দিল, রীতিমত উল্লসিত বোধ করল শারমিন। হোটেলটার নাম আল হাফা কফি হাউস। এখানে প্রায়ই আসা-যাওয়া করত জামালু দীন। খুব ধনী এক ভদ্রলোক বৈরুত বা অন্য কোন বড় শহর থেকে এখানে আসত তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। ভদ্রলোকের নাম হুসাফ জেরোম। ব্যস, এইটুকুই, ওয়েটার এর বেশি কিছু বলতে পারল না। শারমিন তার কাছ থেকে হুসাফ জেরোমের চেহারার বর্ণনা জেনে নিল।

পরদিন স্থানীয় পুলিস স্টেশনে এসে ইন্সপেক্টর কায়সুল কারাম-এর সঙ্গে দেখা করল শারমিন। হুসাফ জেরোমের চেহারার বর্ণনা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল ইন্সপেক্টর। তবে মুখ খোলার আগে খবর পাঠাল 'দ্য ডেইলি লেবানন'-এর স্থানীয় সংবাদদাতা জাকির হোসেনকে। ইন্সপেক্টরের চিঠি পেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে পুলিস স্টেশনে হাজির হলো জাকির হোসেন, বগলদাবা করে কয়েকটা পুরানো খবরের কাগজ নিয়ে এসেছে।

পরিচয় পর্ব শেষ হতেই পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল ইন্সপেক্টর কায়সুল কারাম। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি মনে পড়ে, হুসাফ জেরোম নামে এক ভদ্রলোক কাফায় একটা টিন মাইন কিনেছিলেন? বছর দুই আগের ঘটনা, আপনাদের পত্রিকায় সম্ভবত খবরটা বেরিয়েছিল, ভদ্রলোকের ছবি সহ।'

স্থানীয় সংবাদদাতা পুরানো কাগজ ঘেঁটে একটা কপি আলাদা করল। দেখা গেল প্রথম পৃষ্ঠাতেই খবরটা বেরিয়েছিল, হুসাফ জেরোমের ছবি সহ।

ভদ্রলোকের কোম্পানীর নাম ছিল জেরোম মাইন লিমিটেড। তাকরির উপকূলে, কাফা এলাকায়, একটা টিন মাইন কেনেন তিনি।

জাকির হোসেন জানাল, 'কিন্তু সে টিন মাইন তো আঠারো মাস পর বন্ধ হয়ে গেছে।'

'বন্ধ হয়ে গেছে? কেন?' জানতে চাইল ইন্সপেক্টর।

জাকির হোসেন বলল, 'তা বলতে পারব না। তবে ব্যাপারটা রহস্যময়ই বটে, কারণ জেরোম মাইন কোম্পানী লিমিটেড লালবাতি জ্বেলেছে বলে তো শোনা যায়নি।'

শারমিন বলল, 'আমাকে একটু সাহায্য করুন, প্লীজ। আমাকে জানান মাইনটা কাফার ঠিক কোথায়, আর বিশ্বস্ত ও পরিশ্রমী দু'তিনজন মাইনারের নাম-ঠিকানা দিন। মাইনটার ভেতর আমি একবার ঢুকতে চাই।'

জাকির হোসেন হাঁ করে তাকিয়ে আছেন দেখে ইন্সপেক্টর কায়সুল কারাম বলল, 'মিস শারমিনের ধারণা, যে বিদেশী সাবমেরিনটাকে টর্পেডোবোট ডেপথ চার্জ করে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে বলে কাগজে লেখালেখি হচ্ছে তা আসলে ডোবেনি।'

'তা যদি না-ও ডুবে থাকে, তার সঙ্গে মাইনটার কি সম্পর্ক?' জানতে চাইল জাকির হোসেন।

শারমিন বলল, 'দেখুন, লেবানন সরকারের অনুমতি নিয়ে আমি একটা কনফিডেনশিয়াল ব্যাপারে এই এলাকায় তদন্ত করতে এসেছি। আপনাদের সব প্রশ্নেরই উত্তর আমি দেব, তবে এখুনি নয়। আমার মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে, এখনও জানি না সেটা ভিত্তিহীন কিনা, কাজেই এখুনি আমি কিছু বলতে পারব না।'

সংবাদদাতা ও ইন্সপেক্টর, দু'জনেই তার এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে সাহায্য করতে রাজি হলো। ইন্সপেক্টর তিনজন মাইনারের নাম বলল—আহুদ, সাজিদ আর সুলতান। আরও জানাল, 'তিনজনই প্রাক্তন সৈনিক, সৎ ও বিশ্বস্ত, ওদের নামে কোন পুলিস রেকর্ড নেই।'

দু'দিন পর আহুদকে নিয়ে কাফায় চলে এল শারমিন। খুসলান আর আসলান, এই দুই খনির মাঝখানে জেরোম টিন মাইন। সবগুলোই পরিত্যক্ত। এলাকায় কোন লোকবসতি নেই।

প্রথম দিনটা টিন মাইনের আশপাশে ঘুরে বেড়াল ওরা। পাহাড়-প্রাচীরের মাথার কাছাকাছি সরু একটা কার্নিসের ওপর মান্ধাতা আমলের রেললাইন ছিল এককালে, তার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও রয়ে গেছে আধ মাইল জুড়ে। পাহাড়-প্রাচীরের একশো গজ সামনে টিন মাইনের মুখ অর্থাৎ মেইন শ্যাফট, কাজেই শারমিনের ধারণা হলো রেললাইনটা এই মাইন কোম্পানীরই ছিল। মেইন শ্যাফটের কাছে পাথুরে পাঁচিল আছে, দেখে খুব পুরানো মনে হলো না। পাঁচিলটা তুলে মাইনে ঢোকার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

পরদিন আবার এল ওরা। রশির মই বেয়ে পাঁচিলের মাথায় উঠল

শারমিন। শোয়া অবস্থায় উঁকি দিয়ে তাকাতে দেখতে পেল উল্টোদিকে পাঁচিলটা একশো ফুট খাড়া নেমে গেছে। তারপর শুরু হয়েছে টানেল। টানেলের ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ ভেসে আসছে—যেন ভেতরে কোথাও জলপ্রপাত আছে।

এদিকের পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে পাথুরে পাঁচিল শুধু এই একটা নয়, বহু। অর্থাৎ অনেকগুলো খনিই পরিত্যক্ত ঘোষণার পর পাঁচিল তুলে ভেতরে ঢোকার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে আহুদের মুখে শারমিন শুনল, জেরোম টিন মাইন ছাড়া বাকি সবগুলো পরিত্যক্ত মাইন বিস্ফোরণের সাহায্যে ভরাট করে ফেলা হয়েছে। কি কারণে কে জানে জেরোম টিন মাইন ভরাট করা হয়নি।

পরদিন হোটেলে শারমিনের সঙ্গে দেখা করল স্থানীয় সংবাদদাতা জাকির হোসেন। গত দু'দিনে জেরোম টিন মাইন সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছে সে। তার কথা থেকে জানা গেল, টিন মাইনটার নাম ছিল দর্দ মেসি। স্থানীয় লোকজন ওটাকে ভিজে মাইন বলে। বহু বছর আগে দর্দ মেসিতে একটা ধস নামে, তাতে খনির ত্রিশজন শ্রমিক মারা যায়। সেই থেকে প্রায় বিশ বছর খনিটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। দু'বছর আগে দর্দ মেসি কিনে নেন হুসাফ জেরোম। ভদ্রলোক লেবানীজ, তবে ইহুদি।

তাঁর সময়ে, প্রায় আঠারো মাস, দর্দ মেসি বা জেরোম টিন মাইন থেকে অত্যন্ত ভাল আয় হয়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে হুসাফ জেরোম খনির ভেতর সম্পূর্ণ নতুন একটা স্তর আবিষ্কার করেন, এবং সেই স্তরের ভেতর দীর্ঘ একটা টানেল পেয়ে যান তিনি। লোকমুখে শোনা গেছে, এই টানেল নাকি সাগরের তলায় গিয়ে শেষ হয়েছে। দর্দ মেসি সেজন্যেই 'ভিজে খনি'। স্থানীয় খনি শ্রমিকদের জন্যে ভিজে খনি দুঃসংবাদ, কারণ ভিজে খনির টানেল বা শ্যাফট যখন তখন ধসে পড়তে পারে।

হুসাফ জেরোম খনিটা কেনার আঠারো মাস পর ঘটলও ঠিক তাই। আন্ডারসী শ্যাফট হঠাৎ ধসে পড়ে, ফলে মারা যায় চল্লিশজন মাইনার। সেই থেকে জেরোম টিন মাইন পরিত্যক্ত। ক্ষতিপূরণ দেয়ার ভয়েই সম্ভবত হুসাফ জেরোম লেবানন ছেড়ে পালিয়ে যান।

তথ্যগুলো পেয়ে চিন্তায় পড়ে গেল শারমিন। এ-ধরনের একটা বিপজ্জনক মাইনে তার ঢোকাটা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছে না। তাছাড়া—আহুদ, সাজিদ আর সুলতানও কি ঢুকতে চাইবে?

সেদিনই প্রসঙ্গটা নিয়ে ওদের তিনজনের সঙ্গে আলোচনা করল শারমিন। প্রস্তাবটা দেয়ার সময় পারিশ্রমিকের অঙ্কটা জানাতেও ভুলল না—মাথা পিছু এক হাজার ডলার। তবে ওরা তিনজন যে শুধু টাকার লোভে মাইনে ঢুকতে রাজি হলো, তা নয়। একটা মেয়ে যেখানে মাইনে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে না সেখানে তারা পুরুষ হয়ে ভয়ে পিছিয়ে আসে কিভাবে, লোকে কাপুরুষ ভাববে না!

দু'দিন পর কাউকে কিছু না জানিয়ে ওরা চারজন জেরোম টিন মাইনে ঢুকল। এমন ভৌতিক পরিবেশ জীবনে কখনও দেখেনি শারমিন। ভেতরে ঢোকার জন্যে পাঁচিল ভাঙতে হয়নি, পাহাড়-প্রাচীর আর পাঁচিলের মাঝখানে ফাঁক থাকায় রশি বেয়ে নামা গেছে। ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে আর বাতাসে গুমোট ভাব প্রকট। লোয়ার লেভেলে নামার পর ওদের গাইড আহুদ খুব নার্ভাস হয়ে পড়ল, দেখাদেখি সাজিদ ও সুলতানও। এদের মধ্যে একমাত্র আহুদই এর আগে জেরোম টিন মাইনে কাজ করেছে। মাইনের ভেতরে কি আছে না আছে সে-সম্পর্কে অনেক অবিশ্বাস্য গল্প শারমিনকে শুনিয়েছে সে। শারমিন শুধু শুনেই গেছে, বিশ্বাস করছে কি করছে না তা তার চেহারা দেখে বোঝা যায়নি। একটা নয়, একাধিক জলপ্রপাতের বর্ণনা দিয়েছে আহুদ। তার ভাষায়, বিশ-ত্রিশ বছর আগে প্রথমবার যখন দর্দ মেসিতে মাইনাররা কাজ শুরু করে তখন অনেক ছোট ছোট গুহা ভেঙে একাধিক বড় গুহা তৈরি করা হয়েছিল। তৈরি করা হয়েছিল বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট গ্যালারি। সে-সব গ্যালারিতে শ্রমিক মাইনারদের ঢোকার অনুমতি ছিল না বলে শুনেছে আহুদ। জেরোম সাহেব মাইনটা কেনার পরও এই নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। কাজেই গ্যালারিগুলোর শেষ মাথায় গুহাগুলো সত্যি সত্যি সাগরের তলায় বেরিয়েছে কিনা তা তার জানা নেই।

সঙ্গে করে ওরা শুধু এক কয়েল রশি, দুটো ইলেকট্রিক টর্চ আর কিছু স্যান্ডউইচ নিয়ে এসেছে। সালোয়ার-কামিজের ওপর ওড়না পরে তাকরির উপকূলে আসে শারমিন, তবে মাইনে ঢুকছে ট্রাউজার আর টি-শার্ট পরে, মাথায় লোহার হেলমেটও আছে। রানার মত ওরও একই কাভার—মিশরীয় একটা দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার।

শ্যাফটের লোয়ার লেভেলে নামার পর অদ্ভুত যে শব্দটা বাইরে থেকে শোনা গিয়েছিল সেটা অকস্মাৎ শতগুণ বেড়ে গেল। অথচ বিভিন্ন টানেল ধরে এগোবার সময় দেখা গেল সামনে ধস নেমে বন্ধ হয়ে আছে পথ। প্রতিবারই শাখা টানেল পাওয়া গেল, ফলে কোন বাধাই ওদেরকে দমাতে পারছে না। তবে আহুদ বারবার নিষেধ করছে শারমিনকে, আর এগোনো উচিত হবে না। কিন্তু শারমিন নাছোড়া-বান্দা, অন্তত গ্যালারিগুলো না দেখে ফিরবে না সে।

প্রায় সাত-আট বার টানেল বদলে চওড়া একটা গুহায় ঢুকল ওরা, এখান থেকে অনেকগুলো শাখা টানেল বেরিয়েছে। সবচেয়ে চওড়া শাখা টানেল ধরে এগোল ওরা। এই টানেলের শেষ মাথায় পাওয়া গেল প্রথম জলপ্রপাত। ঠিক জলপ্রপাত বলা চলে না, কারণ পানি এখানে ঝরে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়, তবে ফোঁটাগুলোর সংখ্যা কয়েক লাখের কম হবে না। ভিজে গেল ওরা, সিকি মাইলের মত এগিয়ে শুকনো টানেলে পৌঁছুল। টানেল এখান থেকে ক্রমশ ওপরে উঠতে শুরু করেছে।

সঙ্গের খাবার আর টর্চের ব্যাটারি শেষ হয়ে আসায় পরদিন মাইন থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলো ওরা। দু'দিন পর আবার ঢুকল। এবার

স্যান্ডউইচ, পানি, টর্চ ইত্যাদি বেশি করে আনা হয়েছে।

প্রথম অভিযান যেখানে শেষ হয়েছিল সেখান থেকে আবার শুরু হলো নতুন পথে যাত্রা। কিছু দূর যেতেই টানেলের সমতল মেঝেতে পানি দেখল ওরা। এই পানিতে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল। সামনে পড়ল পাথুরে পাঁচিল। পাঁচিলটা পরীক্ষা করে দেখা গেল তাতে ফাটল ধরাতেই মেঝেতে পানি জমেছে।

টানেলটা এখানে খুবই চওড়া, কিন্তু পানিতে ডোবা। এখান থেকে কোন শাখা টানেল বেরিয়েছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে হাঁটাহাঁটি করছে ওরা, এই সময় আহুদ প্রায় ডুবে মরতে যাচ্ছিল। টানেলের এক অংশে মেঝে বলে কিছু নেই। ভাগ্যিস সে সাঁতার জানত, তা না হলে তলিয়ে যেত গভীর অতলে। মেঝের কিনারায় দাঁড়িয়ে নিচে পাথর ফেলা হলো, নিচ থেকে কোন শব্দ উঠে এল না—অর্থাৎ তলাটা অনেক গভীরে।

খনির একটা লেভেল হঠাৎ একটা খাদে কেন নেমে গেল, এর কোন সদুত্তর আহুদও দিতে পারল না। সে জানাল, খনির এতটা ভেতরে আগে কখনও আসেনি সে। যাই হোক, খানিকটা পিছিয়ে এসে সরু অন্য একটা টানেলে ঢুকল ওরা, সেখান থেকে উঠে এল অন্য এক লেভেলে। এই লেভেলের শেষ মাথায় পাওয়া গেল কয়েকটা গ্যালারি। গ্যালারির শেষ মাথায় একটা ক্রস-সেকশন। ওরা ডান দিকের একটা পথ বেছে নিল। এটা অসম্ভব লম্বা একটা টানেল, ক্রমশ চওড়া হয়ে গেছে। পরিবেশটা ভৌতিক বললেও কম বলা হয়। চওড়া হবার পর অসংখ্য শাখা টানেল বেরিয়েছে দু'দিকে, ওদের পায়ের শব্দ শতগুণ জোরালভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বাতাস অত্যন্ত গরম। কয়েকটা চওড়া গুহায় পৌঁছুল ওরা, পাশ কাটিয়ে এল কয়েক স্তরে তৈরি করা একাধিক গ্যালারি। মাঝে মধ্যেই থমকে দাঁড়িয়ে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে আহুদ। এক সময় শারমিন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ভূতের ভয় পাচ্ছেন?' কিন্তু আহুদ হাসল না। আরও যেন গম্ভীর হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পর নতুন একটা শব্দ শোনা গেল—এটা সত্যিকার একটা জলপ্রপাত হবারই সম্ভাবনা। আর ঠিক এই সময় শারমিনের সন্দেহ হলো, ওদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে। সব আওয়াজই যে ওদের পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি, এখন আর তা বিশ্বাস করতে পারছে না সে। তবে এরই মধ্যে খনির আরও এক স্তর নিচে নেমে এসেছে ওরা। আহুদ জানাল, এটাই সর্বশেষ স্তর। এদিকে সিলিঙ সুরক্ষিত রাখার জন্যে কড়ি আর বাঁশ ব্যবহার করা হয়েছে, তবে বেশিরভাগই পচে গেছে।

সামনে পড়ল পাঁচিল তুলে বন্ধ করা নতুন একটা শ্যাফট। বাম দিকে বাঁক ঘুরে একটা গ্যালারি এলাকায় ঢুকল ওরা। জায়গাটা ঢালু হয়ে ডান দিকে ঘুরে গেছে। রেললাইনের কিছু অংশ এখনও অক্ষত দেখা গেল। জলপ্রপাতের শব্দ এখানে আরও তীব্র হয়ে বাজছে কানে, যেন সরু একটা গিরিখাদ থেকে বিপুল জলরাশি নেমে আসছে।

এক পর্যায়ে গ্যালারিটা আরও প্রশস্ত হলো, তিনটে শাখা তিন দিকে চলে গেছে। আহুদ ইতস্তত করে ডান দিকের শাখাটা বেছে নিল। পানির আওয়াজ আরও বাড়ছে। এদিকের গ্যালারি খুব মজবুত, প্রায় সাত ফুট উঁচু, সাত ফুট চওড়া। গ্যালারির কোথাও কোথাও সিমেন্টের স্তর তৈরি করে পানি ঠেকানোর ব্যবস্থা করে হয়েছে। তারপর একটা বাঁক ঘুরতেই রোমহর্ষক জলপ্রপাতটা দেখতে পেল ওরা। গোটা ছাদ স্রেফ ধসে পড়েছে, গ্যালারি থেকে সামনে যাবার পথটা বিশাল সব পাথরের টুকরোয় ঢাকা।

মেইন গ্যালারি যেখানে শাখা বিস্তার করেছে সেখানে ফিরে এল ওরা। আরেকটা শাখা ধরে রওনা হলো, কিন্তু ত্রিশ ফুটও এগোতে পারল না, আরও একটা জলপ্রপাতের সামনে পড়ে গেল। শারমিন ধারণা করল, রক ফরমেশনে সিরিয়াস কোন ফল্ট না থেকেই পারে না। আহুদ পাথুরে আবর্জনার গায়ে টর্চের আলো ফেলে কি যেন খুঁজছে। কিছু না পেয়ে দেয়ালগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করল। তারপর স্থির হয়ে গেল সে, কান পেতে কি যেন শুনছে। শব্দটা শারমিনও পেল। মনে হলো জলপ্রপাতের পিছন থেকে আসছে। তবে কিসের শব্দ বোঝা গেল না। কেউ কি ড্রিল করছে? নাকি সামনে কোথাও জেনারেটর চলছে?

'চলুন, ফিরে যাই,' বলল শারমিন। 'স্বীকার করছি, আমার ভয় লাগছে।'

'এখানে কেউ এসেছিল,' বিড়বিড় করল আহুদ, 'মাইন বন্ধ হবার পর। শারমিনকে ভয় পেতে নিষেধ করল সে। 'এই জলপ্রপাত কৃত্রিম, মানুষের সৃষ্টি—কেউ চেয়েছে সামনে কোন মানুষ যাতে যেতে না পারে। জলপ্রপাতগুলো পাথর ধসিয়ে তৈরি করা হয়েছে। পাথরগুলো পরীক্ষা করে দেখুন, ডিনামাইট ফাটিয়ে নামানো হয়েছে ওগুলো।'

'এখন তাহলে কি করব আমরা?'

'দু'দিন পর আমরা আবার আসব,' জবাব দিল আহুদ। 'এই জলপ্রপাতের ভেতর দিয়েই পথ করে নিতে হবে।'

সেদিন সন্ধের খানিক আগে জেরোম টিন মাইন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সবাই খুব ক্লান্ত। ঠিক হয়েছে কালকের দিনটা বিশ্রাম নিয়ে পরশু আবার আসবে ওরা।

ছয়

অকস্মাৎ উত্তেজনাকর রোমাঞ্চ অনুভব করল রানা, বুঝতে পারল হাদী আসলে কি করছে। মোর্স সঙ্কেতের মাধ্যমে কারও সঙ্গে আলাপ করছে সে। কিন্তু সত্যিই কি আলাপ করছে? নাকি ব্যাপারটা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা মস্তিষ্কের একটা খেয়াল? তার উচ্চারিত শব্দ দিয়ে সাজানো লেখাটা পড়ল রানা—

'আমি এখানে তিনজন মাইনারকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। সম্প্রতি খনন করা হয়েছে, এরকম টানেল ধরে এগোবার সময় দেখি পাথর ধস আর জলপ্রপাত বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পাথর ধস সরিয়ে পথ করে নিই আমরা। তারপর ধরা পড়ে যাই ইসরায়েলি সশস্ত্র সৈনিকদের হাতে। ওরা এগজিট গ্যালারির মুখে পাঁচিল তুলে দিয়েছে। এই জায়গাটা আসলে কি?'

হাদীর দিকে তাকাল রানা। গ্রিলের বারে এখনও চামচ ঠুকছে সে, এবার জবাব দিচ্ছে।

লেখাটার ওপর আরেকবার চোখ বুলাল রানা। ব্যাপারটা ওর ধারণার সঙ্গে মিলে যায়। সাগরের নিচে এই ঘাঁটিটা একটা মাইনের অংশ। 'জিজ্ঞেস করো, কে সে? পরিচয় কি?' ফিসফিস করল ও।

'নিজের পরিচয় আগেই দিয়েছেন, এখন জানতে চাইছেন আমাদের পরিচয়,' জবাব দিল হাদী। 'বলছেন, উনি একজন রিপোর্টার, কায়রো থেকে প্রকাশিত মর্নিং নিউজে কাজ করেন। এর মানে হলো, স্যার, ওই পত্রিকা থেকে আপনার খোঁজে কাউকে পাঠানো হয়েছে।'

রানা কথা না বলে নিঃশব্দে বুকে টেনে নিল হাদীকে। হাদী হতভম্ব, কিন্তু সেদিকে রানার খেয়াল নেই। চামচটা তার হাত থেকে নিয়ে গ্রিলে ঠুকছে ও, নিজেই মেসেজ পাঠাচ্ছে— 'আমি মাসুদ রানা, আমার সঙ্গে সাবেক লেবানীজ নাবিক আল হাদী। তুমি কে?'

জবাব এল, 'মাসুদ ভাই, রানা এজেন্সির বৈরুত শাখা থেকে এসেছি, আমি শায়লা শারমিন। আপনি কি আহত?'

'ধন্যবাদ, শারমিন। না, আমি বহাল তবিয়তেই আছি, তবে তোমাদের মতই বন্দী। কিন্তু এখানে পৌঁছুলে কিভাবে?'

'দোস্তানার জামালু দীন ইসরায়েলি এজেন্ট, তাকে গ্রেফতার করে বৈরুতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তার সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে একটা সূত্র পেয়ে যাই, সেই সূত্র ধরে এই খনির সন্ধান পেয়েছি। এই খনি কাফা থেকে চার মাইল দক্ষিণে।'

'আমরা তাকরির উপকূলেই আছি,' হাদীর দিকে ফিরে বলল রানা। তারপর আবার মোর্স সঙ্কেতের মাধ্যমে শারমিনকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি খনিতে ঢুকেছ, এ-খবর আর কেউ জানে কিনা?'

'স্থানীয় পুলিস ইন্সপেক্টর আর এলাকার একজন সংবাদদাতা জানে। কিন্তু ইসরায়েলিরা টানেল ধসিয়ে দিয়ে সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে, ফলে দেখে মনে হবে পাথর ধসে আটকা পড়েছি আমরা। মাসুদ ভাই, এই জায়গাটা কি? আপনার কোন প্ল্যান আছে কিনা?'

কিন্তু রানা জবাব দিতে পারল না, বাইরে থেকে বুটের আওয়াজ ভেসে এল। দু'জন গার্ড রাতের খাবার নিয়ে আসছে।

খেতে বসে রানা বলল, 'জানো তো, হাদী, আমাদের হাতে সময় আছে খুব বেশি হলে শনিবার রাত পর্যন্ত।'

মুখভর্তি খাবার, কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল হাদী।

তাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে রানা। 'দোস্তানা কটেজে কে থাকত, তোমার মনে আছে?'

'ইয়ে··· লোকটার নাম বোধহয় জামালু দীন, তাই না?'

'তোমার স্মরণশক্তি দেখতে পাচ্ছি খুব খারাপ নয়—সব বোধহয় আবার মনে পড়ছে?'

'তা পড়ছে,' বলে নিঃশব্দে হাসল হাদী, চোখে কৌতুকের ঝিলিক।

তবু নিশ্চিত হতে পারছে না রানা। ওর মত সচেতন একজন মানুষকে সামান্য একজন জেলে অস্কার পাবার যোগ্য অভিনয় করে ধোঁকা দিয়েছে, মেনে নিতে কষ্ট হবারই কথা। এক বা দু'দিন নয়, প্রায় দুই হপ্তা হতে চলল দু'জন ওরা সারাক্ষণ একসঙ্গে রয়েছে। কাজেই আরও একটা প্রশ্ন করল রানা, 'তাকরির উপকূলের কোস্টগার্ডের নামটা মনে করতে পারো?'

চিন্তিত দেখাল হাদীকে। 'দাঁড়ান, স্যার, একটু ভাবতে দিন।' তারপর একটু কৌতুকের হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'নামটা কি শমসের লিবান?'

হঠাৎ পরম স্বস্তিবোধ করল রানা। হাঁপ ছেড়ে বলল, 'বলোনি কেন যে অভিনয় করছ?'

'অভিনয়ের আমি কি বুঝি, স্যার?' সবিনয়ে বলল হাদী। 'আপনি যদি জানতেন যে আমি অভিনয় করছি, তাহলে আপনার সামনে কি অভিনয় করতে পারতাম? বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সত্যি কথা বলছি, স্যার—নিজেকেও আমার বোঝাতে হয়েছে যে আমি পাগল হয়ে গেছি।'

হাসিটা চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো রানা। 'নিজেও জানো না কত বড় অভিনেতা তুমি। দুনিয়ার সব বড় অভিনেতা যা করেন, তুমিও ঠিক তাই করেছ। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি ছিল?'

'ওরা যে তথ্য আমার কাছে চাইছিল সেগুলো না দেয়ার মতলব। তাছাড়া, আরও সাহায্যে আসবে বলে ভেবেছিলাম।'

'এসেছে কি?'

'এসেছে, স্যার।' হাতছানি দিয়ে নিজের বিছানার দিকে রানাকে ডাকল হাদী। 'ছুরি দিয়ে কাঠ কাটতে দেখে আমাকে কেউ বাধা দেয়নি, কারণ আমি তো ওদের চোখে একটা পাগল। তাতে লাভ হয়েছে এই,' বলে খাটটা কাত করে দেয়াল ঘেঁষা পায়াটা রানাকে দেখাল। খাটের এই পায়া দরজার কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে। পায়ার ভেতর দিকে সে তার নাম খোদাই করেছে, তারই একটা হরফে ছুরির ডগা দিয়ে চাড় দিতে নাম খোদাই করা পুরো অংশটা আলাদা হয়ে খুলে এল। পায়ায় একটা গর্ত তৈরি হয়েছে, গর্তের ভেতর শুয়ে রয়েছে একটা চাবি। খুলে আসা অংশটা জায়গামত বসিয়ে চাপ দিতে আবার খাপে খাপে আটকে গেল। সন্দেহ নিয়ে কেউ না খুঁজলে গর্তটার অস্তিত্ব প্রকাশ পাবে না।

'কিসের চাবি ওটা?'

'এই সেলের।'

'কোত্থেকে পেলে?'

বিছানায় বসে খাবারের প্লেটটা কোলে তুলে নিল হাদী। 'এদিকে সব মিলিয়ে চারটে সেল। প্রত্যেকটাতে একই ধরনের তালা। গত সোমবারের কথা মনে আছে, নিজেদের মধ্যে মারামারি করায় কয়েকজন রেটিংকে সেলগুলোয় আটকে রাখা হয়েছিল মাথা ঠাণ্ডা করার জন্যে? গার্ডরা সবগুলো তালায় একই চাবি ব্যবহার করল। আরেকটা জিনিস লক্ষ করি আমি, মাঝে মধ্যে গার্ড-রুমে ফিরিয়ে না দিয়ে তালাতেই ওরা রেখে দেয় চাবি।'

'আর সেই চাবি তুমি চুরি করেছ?'

'করেছি,' হাসি চেপে বলল হাদী। 'তবে প্রথমে তৈরি করি খাটের পায়ার গর্তটা, চাবি লুকানোর জায়গা। চাবিটা হাতে পাই গর্ত তৈরি করার দু'দিন পর, পাশের সেলের তালায় ঝুলছিল। দু'ঘণ্টা পর ওটার খোঁজ পড়ে। মনে পড়ে, স্যার, বুধবার রাতে গার্ড এসে আমাদের সেল তন্নতন্ন করে খুঁজে গেল?'

'হ্যাঁ। কিন্তু দরজায় ওরা বোল্ট লাগায়নি কেন?'

'গার্ড সম্ভবত চাবি হারানোর ঘটনা শাস্তি পাবার ভয়ে রিপোর্ট করেনি।'

হাতে চাবি থাকা মানে রাতের যে-কোন সময় সেল থেকে বেরুতে পারা। রানা চিন্তা করছে। কিন্তু বেরিয়ে করবেটা কি? সবগুলো স্টোরে তালা দেয়া থাকে, সেগুলোর চাবি ওদের কাছে নেই। তাছাড়া, ফুয়েল আর অ্যামুনিশন-এর কাছাকাছি যাওয়াও সম্ভব নয়। গার্ডরা প্রতি ঘণ্টায় পালা করে টহল দেয়। জটিলতা আরও বেড়ে গেছে শারমিন মাইনার তিনজনকে নিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ায়। এখন যদি ঘাঁটিটা রানা উড়িয়ে দেয়, ওদের দু'জনের সঙ্গে ওই চারজনও মারা যাবে।

এই একই চিন্তা হাদীর মাথাতেও খেলছে। 'আপনার শায়লা শারমিন কেমন মেয়ে? মানে, তার যোগ্যতা কি?'

'খুব সুন্দরী,' বলে হেসে ফেলল রানা। 'স্রেফ একজন রিপোর্টার, তাও মেয়ে—তবে কারাতে-কুংফু বা আনআর্মড কমব্যাট জানে বোধহয়।' হাদীকে নিজের আসল পরিচয় যেমন দেয়নি ও, শারমিনের আসল পরিচয়ও দিচ্ছে না। তবে শারমিন পুরোদস্তুর ট্রেনিং পাওয়া এজেন্ট নয়। রানা এজেন্সির বৈরুত শাখায় সে আসলে শিক্ষানবিস হিসেবে কাজ করছিল। কাজেই তার কাছ থেকে খুব একটা সাহায্য আশা না করাই ভাল।

'তাহলে কিভাবে কি করব আমরা?' জানতে চাইল হাদী।

'আগে সিদ্ধান্ত নাও, মরতে রাজি আছ কিনা।' রানা সিরিয়াস।

'আপনি বলছেন কি, স্যার! দেশের জন্যে মরব না তো কিসের জন্যে মরব?' হাদীকে আহত দেখাল। 'আপনি বললে আজ রাতেই বেরিয়ে পড়ি। টহলে বেরোয় মাত্র দু'জন গার্ড। ওদেরকে কাবু করা কঠিন হবে না। ওদের কাছে চাবি থাকে, সেগুলো নিয়ে অ্যামুনিশন স্টোরে চলে যাব, উড়িয়ে দেব

ঘাঁটি।'

'শুনতে সহজ মনে হচ্ছে, কিন্তু যদি নিঃশব্দে গার্ডদের কাবু করতে না পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঝুঁকি তো নিতেই হবে, স্যার। ওরা চেঁচামেচি শুরু করলেও হাতে আমরা প্রচুর সময় পাব।'

'বিকল্প কোন উপায় আছে কিনা ভাববে না? স্রেফ আত্মহত্যা করবে? সাবমেরিনে সিক্স ইঞ্চ গান আছে, ওগুলোর কথা ভাবছিলাম আমি,' বলল রানা। 'ওগুলো তো তুমি চালাতে জানো, তাই না? ইউ-টোয়েনটিওয়ানের আফটার গান ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। সাবমেরিনটার পিছন দিকটা মেইন গুহার দিকে তাক করা আছে। ওই কামান থেকে একটা গোলা ছুঁড়লে আন্ডারওয়াটার এন্ট্রান্স ধসে পড়ে পুরোপুরি ব্লক হয়ে যাবে। একটা সাবমেরিনও আর বেরুতে পারবে না। লাভটা চিন্তা করে দেখো।'

মাথা নাড়ল হাদী। 'স্যার, সাবমেরিনগুলোকে ধ্বংসই করতে হবে। কারণ আন্ডারওয়াটার প্রবেশপথ আমরা যদি ব্লক করে দিইও, ওরা হয়তো পাহাড়-প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে যাবার পথ করে নিতে পারবে। সাবমেরিনগুলোকে ধ্বংস করার একটাই রাস্তা—ঘাঁটিটাকে উড়িয়ে দেয়া।'

'শোনো! শারমিন সঙ্গে করে তিনজন মাইনারকে এনেছে। কামানের গোলা ছোঁড়ার পর আমরা যদি ওদেরকে মুক্ত করতে পারি, আর তারপর শাবল দিয়ে পাঁচিল ভেঙে খনিতে ঢুকতে পারি, তাহলে ওরা যে পথে আজ বিকেলে এখানে এসেছে সেই পথ ধরে পালানো যায়।'

মুখে কিছু না বললেও, হাদীর চেহারাই জানিয়ে দিল রানাকে সে কাপুরুষ ভাবছে। তারপর হেসে উঠল সে। 'তাকরির উপকূলের একটা টিন খনিতে পাথর ধস কি রকম হয়, আপনার কোন ধারণা আছে, স্যার? আমাদের সামনে প্রথম যে গ্যালারিটা পড়বে সেটারই হয়তো একশো ফুট ছাদ ধসে পড়েছে। পাথরগুলো শক্ত গ্র্যানিট, স্যার। আকারে বিশাল। আর আপনি চাইছেন তিনজন মাইনারের সাহায্যে ওগুলো সরিয়ে পথ বের করবেন?'

'ঘাঁটিতে মোবাইল ড্রিল আছে, হাদী,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'তা আছে,' হাসি থামিয়ে বলল হাদী। কিছুক্ষণ চিন্তা করল সে। 'সমস্যা হলো, স্যার, ওরা জানবে কোন পথে পালিয়েছি আমরা। জানার সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করবে।' মাথা নাড়ল। 'একজনও বাঁচব না, স্যার।'

'পিছু নিতে সময় লাগবে ওদের,' বলল রানা। 'আমরা ওদেরকে এখানে ব্যস্ত রাখার ব্যবস্থা করে রেখে যাব। তাছাড়া, আমাদের পিছনে এগজিট গ্যালারি আংশিক হলেও ব্লক করে দিতে পারব আমরা। তখন আমাদের হাতে অস্ত্রও থাকবে।'

'আপনার প্ল্যান আমার ঠিক মাথায় ঢুকছে না, আরও ব্যাখ্যা করুন।'

'পালাবার কথা বলছি বটে, কিন্তু সেটা একেবারে শেষ পর্যায়ে,' বলল রানা। 'গার্ডদের কাবু করার পর অস্ত্র আর ইকুইপমেন্ট দখল করব আমরা,

তারপর কামান। কামানের পিছনে যদি গানার থাকে, তাকেও কাবু করতে হবে। এ-সব যদি সম্ভব হয়, ঘাঁটি আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে, তখন যেটা ভাল মনে হয় সেটা করা যাবে। কিন্তু যদি গার্ডদের কাবু করতে না পারি বা ওরা যদি অ্যালার্ম বাজাবার সুযোগ পেয়ে যায়, তখন পালানোর চেষ্টা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। এবার বুঝতে পারছ?'

বেশ কয়েক মুহূর্ত কথা বলল না হাদী। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আমি একমত।'

খালি প্লেট নিতে এল গার্ড। ইঙ্গিতে বিছানাটা দেখিয়ে হিব্রু ভাষায় সে বলল, 'যতটা পারো ঘুমিয়ে নাও। আজ রাতে দুটো সাবমেরিন আসছে।' রানার মুখের সামনে দুটো আঙুল খাড়া করে উচ্চারণ করল, 'বোটস।'

রানা মাথা ঝাঁকাতে হাসিমুখে ফিরে গেল লোকটা।

'ভাগ্য ভালই বলতে হবে যে দুটোই আজ রাতে ফিরে আসছে,' বলল রানা। 'তারমানে কাল রাতে আমাদেরকে কোন কাজ করতে হবে না। অবশ্য যদি প্ল্যান মত আজ রাতে ইউ-ফরটিসেভেন বেরিয়ে যায়।'

বাইরের আলো নিভে যেতে দরজার সামনে চলে এল রানা, আবার যোগাযোগ করল শারমিনের সঙ্গে। ইতিমধ্যে রাত দশটা বেজে গেছে। শারমিনের সঙ্গে বার্তা বিনিময় হতাশ করে তুলল রানাকে। যে মাইন গ্যালারিতে মাইনারদের নিয়ে শারমিন পৌঁছেছিল, ঘাঁটির সঙ্গে সেটা সংযুক্ত হয়েছে গার্ড-রুম থেকে বেরুনো একটা টানেলের মাধ্যমে। পাথুরে একটা দেয়াল ভাঙছিল ওরা, জানত না সেটা গার্ড-রুমের দেয়াল। তখনই ধরা পড়ে যায় ওরা। আরও দুঃসংবাদ হলো, মাইন গ্যালারিটা নতুন করে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে, লম্বায় প্রায় দুশো ফুট।

অর্থাৎ গার্ড-রুম হয়ে গ্যালারিতে ঢুকতে হবে, তার আগে ভাঙতে হবে দেয়ালটা। গ্যালারিতে শুধু ঢুকলেই হবে না, দুশো ফুট জুড়ে পড়ে থাকা পাথর সরিয়ে পথ করে নিতে হবে।

গভীর রাত পর্যন্ত ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেশিন ও অন্যান্য মেশিনারির যান্ত্রিক গুঞ্জন শুনতে পেল ওরা। এত রাতে সাধারণত এ-ধরনের শব্দ পাওয়া যায় না। ব্যাপারটা কি? 'ওরা কি ইউ-টোয়েনটিওয়ান মেরামত করছে?'

মাথা ঝাঁকাল হাদী। 'আমার তাই ধারণা, স্যার। ছি, আমি অনেক দেরি করে ফেলেছি।'

রাত বারোটায় ওদেরকে ডাকা হলো। দুটো সাবমেরিনের একটা পৌঁছেছে। মার্চ করিয়ে তিন নম্বর ডকে আনা হলো ওদের। ভেজা, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে হলো, ডাংকি এঞ্জিনের কর্কশ শব্দ মেইন কেভ বা মূল গুহায় প্রতিধ্বনি তুলছে। অপেক্ষার এই সময়টায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পেল রানা। ইউ-ফরটিসেভেন মেরামতের কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কারণ সোমবার রাতের আগে ওটা বেরুবার জন্যে তৈরি হতে পারবে না। ঘাঁটির সমস্ত এঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতা কাজে লাগানো

হয়েছে ইউ-টোয়েনটিওয়ান মেরামতে, লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে কাল দুপুরের মধ্যে অ্যাকটিভ সার্ভিসের জন্যে রেডি রাখতে হবে ওটাকে—কাল মানে শুক্রবার। অর্থাৎ রানার ধারণাই সত্যি হতে যাচ্ছে, সাবমেরিন বহর বেরিয়ে যাবে শুক্রবারে, শনিবার রাতে নয়।

আরেকটা কথা ছড়িয়ে পড়ল। যে সাবমেরিনটা আসছে সেটা হারকিউলিস নামে একটা মিশরীয় বাণিজ্যিক জাহাজকে ডুবিয়ে দিয়েছে। এই দ্বিতীয় সাবমেরিনটাও নাকি ঘাঁটিতে ঢোকার জন্যে অপেক্ষা করছে বাইরে। অর্থাৎ আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইসরায়েলের কমপক্ষে ছ'টা সমুদ্রগামী সাবমেরিন এই ঘাঁটিতে থাকবে, আরও থাকবে স্টোর বার্জটা।

তথ্যগুলো হাদীকে জানাল রানা। কিন্তু তার মন্তব্য শোনার সুযোগ ঘটল না, কারণ হঠাৎ ডকের পানিতে একটা আলোড়ন জাগল, বড় একটা ঢেউ ডুবিয়ে দিল ডকসাইট। মূল গুহায় উথলে উঠল পানি, মেটালের সঙ্গে মেটালের ঘষাঘষি আর ধাক্কাধাক্কিতে কর্কশ শব্দ হলো, তারপর শোনা গেল দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী উল্লাস ধ্বনি। দুটো সাবমেরিনের একটা মূল গুহার সারফেসে উঠে আসছে।

একঘেয়ে আওয়াজ তুলে ডিজেল-এঞ্জিন লাগানো টাগ মেইন কেভে ঘুরে বেড়াল, কয়েক মিনিট পর তিন নম্বর ডকের উল্টোদিকে সাবমেরিনের বো দেখা গেল। ডকসাইটে ছুঁড়ে দেয়া হলো এক প্রস্থ রশি, হাত থেকে হাতে চলে যাচ্ছে সেটা। সবার হাতে রশিটা পৌঁছানোর পর অমসৃণ পাথরে পা বাধিয়ে টানতে শুরু করল ওরা। ধীরে ধীরে ডকে উঠে এল সাবমেরিনটা। বোট-হুক হাতে রেটিংরা অপেক্ষা করছে, ডকসাইটে সাবমেরিনের গা যাতে ঘষা না খায়।

সাবমেরিন বাঁধা হতেই ক্রুরা যে যার কোয়ার্টারে ফিরে গেল। রানা ও হাদীকে নিয়ে যাওয়া হলো চার নম্বর ডকে, ওখানে ইউ-টোয়েনটিওয়ান ভেসে রয়েছে। ইলেকট্রিক ট্রলিতে করে ওটার সিক্স ইঞ্চ গান ফাউন্ড্রীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, মেরামতের পর ফিরিয়ে আনা হয়েছে ডকে, সাবমেরিনে তোলার জন্যে সাহায্য দরকার।

হাড় ভাঙা পরিশ্রমের কাজ। প্রথমে ওটাকে পুলিতে তুলতে হলো। পুলিগুলো স্টীল ডেরিকের সঙ্গে যুক্ত। তোলার পর দোল খাওয়াতে হলো, নির্দিষ্ট পজিশনে আনার জন্যে। কাজটা চলার সময় ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা ঘটল। ইউ-টোয়েনটিওয়ানের কমান্ডার ঘাঁটিতে সদ্য আগত ইউ-টোয়েনটিসেভেনের ফার্স্ট অফিসারকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে, পরস্পরের ব্যক্তিগত বন্ধু তারা। ফার্স্ট অফিসারকে তার কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে আবার সে গ্যালারি থেকে নেমে এলো, নিজের বোটে এঞ্জিনিয়াররা কি রকম কাজ করছে দেখার জন্যে। একটা চুরুট ধরিয়েছে, যদিও ডকে বা ডকসাইটে ধূমপান করা নিষেধ। সবাই তখন ডেরিকে ঝুলন্ত কামানটাকে দোল খাইয়ে নির্দিষ্ট পজিশনে আনার জন্যে গায়ের ঘাম ঝরাচ্ছে। দেখাদেখি সেও হাত

লাগাল সবার সঙ্গে।

যাই হোক, কাজটা তখনও শেষ হয়নি, তিন মিনিটের বিশ্রাম পেল ওরা। ব্যথায় আড়ষ্ট পিঠ সিধে করছে ওরা, এই সময় কে যেন ধমকের সুরে বলল, 'আগে রশিগুলো খোলো, তারপর বিশ্রাম।'

আবার শুরু হলো রশি ধরে টানাটানি। একটা রশি অনেকেই ধরেছে, তাদের সঙ্গে রানাও। কমান্ডার পিছিয়ে যাবার সময় পেল না, রশিটা লাফিয়ে উঠল। মুখেই লাগত, কিন্তু কমান্ডার মাথাটা পিছিয়ে নিল ঝট করে। মুখে নয়, রশিটা লাগল চুরুটে।

ডক সাইটে ছেঁড়া ন্যাকড়া আর কম্বলের টুকরো ছড়িয়ে আছে, সে-সবের ভেতর কোথায় পড়ল চুরুটটা কেউ খেয়াল করল না। কিন্তু মাত্র দু'মিনিট পরই কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'কি যেন পুড়ছে!'

জ্বালানি তেলে ভেজা চারপাশের ন্যাকড়া থেকে ধোঁয়া উঠছে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সবাই, শুধু রানা বাদে। রশিটায় ও-ই ঝাঁকি দিয়েছিল, চুরুটটা কোথায় পড়েছিল তা-ও দেখেছে ও, কিন্তু ভুলেও আর সেদিকে তাকায়নি। শুধু যে ধোঁয়া উঠছে তা নয়, হঠাৎ ডেরিকের একটা পায়ের কাছে কি যেন দপ করে জ্বলে উঠল। এক মুহূর্তের জন্যে স্থির পাথর হয়ে রইল সবাই। তারপর একজন এঞ্জিনিয়ার ছুটে গিয়ে বুট পরা পা ঘন ঘন ঠুকে আগুনটা নেভাতে চেষ্টা করল। কিন্তু শিখাগুলো তো নিভলই না, বরং তার তেলে ভেজা ওভারঅলের নাগাল পেয়ে গেল।

সাবমেরিন কমান্ডার তার জ্যাকেট খুলে এঞ্জিনিয়ারের জ্বলন্ত পায়ে জড়িয়ে দিল। এক সেকেন্ডের জন্যে ধোঁয়া আর আগুনের কথা সবাই যেন ভুলে থাকল। সে আগুন ইতিমধ্যে সশব্দ হয়ে উঠেছে, প্রবল আঁচ অনুভব করে পিছাতে শুরু করেছে লোকজন। আরও ভীতিকর ব্যাপার হলো, ডকসাইটেরও কোথাও কোথাও আগুন ধরে গেছে। এঞ্জিনিয়ারের ট্রাউজারের আগুন নিভিয়ে কমান্ডার এবার তার জ্যাকেটের ঝাপটা ও বুটের আঘাতে আশপাশের শিখাগুলো নেভাবার চেষ্টা করছে।

ইতিমধ্যে সবাই কাশতে শুরু করেছে। ধোঁয়া খুব ঘন হয়ে গেছে, এত ঘন যে আগুনের শিখাগুলোকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। অতি ব্যস্ততার সঙ্গে আগুন নেভাচ্ছে কমান্ডার, খকখক করে কাশছেও, কপালে চকচক করছে ঘাম। তারপর হঠাৎ মনে হলো হাঁটুর নিচে পা নেই, ঢলে পড়ল কমান্ডার। ন্যাকড়ার স্তূপ থেকে টেনে সরিয়ে আনা হলো তাকে। দু'জন লোক আশপাশের আগুন নিভিয়ে ফেলল।

ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো হলো। কমান্ডারের সেবা-যত্ন ও চিকিৎসা চলছে, জ্ঞান ফিরতে সময় নিল সে। আরও অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করা গেল—যারা আগুনের খুব কাছাকাছি ছিল তারা সবাই অসুস্থ বোধ করছে। তাদের মধ্যে একজন জ্ঞান হারিয়ে ফেলল, তবে ডকসাইট থেকে একটু দূরে সরিয়ে নিতে আবার জ্ঞান ফিরে এল তার। রানারও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, মাথা

ঘুরছে, যেন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়েছে ও। হাদীও অভিযোগ করল, সে সুস্থবোধ করছে না।

দ্বিতীয় সাবমেরিনটা আসছে, কাজেই এক নম্বর ডকে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো। চিৎকার করে নির্দেশটা দিল ফেটিগ অফিসার ডকের শেষ মাথা থেকে। কয়েকজন তার নির্দেশ মত এক নম্বর ডকের দিকে এগোল, কিন্তু বেশিরভাগই হাঁপাচ্ছে আর হাঁপানোর কারণ নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক করছে। নির্দেশটা রিপিট করা হলো। কিন্তু সেটা পালন না করে ইউ-টোয়েনটিওয়ানে উঠে পড়ল রানা, কামানটাকে সঠিক পজিশনে নামানোর কাজে এঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে হাত লাগাল। ওর দেখাদেখি হাদীও। ওরা ওদের গার্ডদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে। কামানটাকে ওটার মাউন্টিঙে বসানো হলো। কাজটা শেষ হতে তিন মিনিটের মত লাগল। এরইমধ্যে আশপাশটা ভাল করে দেখে নিল ওরা। তবে যা দেখল তাতে হতাশই হতে হলো। এমন কি ব্যবহারের জন্যে জড়ো করা অ্যামুনিশনও ডেকের নিচে রাখা হয়। আর আর্মারড অ্যামুনিশন ট্রাকের নাগাল পাওয়া বা ওটা থেকে কিছু বের করা সম্ভবই নয়।

ওদের গার্ডরা ওদেরকে খুঁজে নিল। ডকসাইটে নামার সময় রানা দেখল কমান্ডার এতক্ষণে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। সাদা হয়ে গেছে চেহারা, কাপড়চোপড় নোংরা। এখনও সে শ্বাসকষ্টে ভুগছে। ডাক্তারকে 'অ্যাসফিকসিয়েশন' শব্দটা উচ্চারণ করতে শুনল রানা, পুরো বাক্যটা কানে এল না। ওদেরকে মার্চ করিয়ে এক নম্বর ডকে নিয়ে আসা হলো। ফেটিগ পার্টি এরইমধ্যে মোটা রশি হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে, গাঢ় রঙের ছুঁচালো সাবমেরিন বো নাক গলাচ্ছে ডকে। নিজেদের পজিশনে দাঁড়াবার সময় রানাকে হাদী জিজ্ঞেস করল, 'কমান্ডারের ব্যাপারটা কি?'

'শ্বাসকষ্টে ভুগছিল।'

'সে তো দেখতেই পেলাম, স্যার। কমবেশি সবাই আমরা ভুগেছি। কিন্তু কি কারণে?'

'কি করে বলব।' বলতে না পারলেও, রানা ধারণা করল ন্যাকড়া আর আবর্জনার স্তূপে ক্ষতিকর কিছু একটা ছিল। রশি টানার নির্দেশ আসতে আর কোন কথা হলো না।

সাবমেরিন বাঁধার কাজ শেষ হতে সেলে ফিরিয়ে আনা হলো ওদেরকে। দরজা বন্ধ হতেই হাদী বলল, 'স্যার, আফটার গান দখল করেও কোন লাভ নেই। শুধু যে অ্যামুনিশন পাব না, তা নয়।'

'আর কি সমস্যা?'

'ব্রিজে উঠে যে-ই একজন গার্ডকে দেখলাম, অমনি মনে পড়ে গেল বেসে আসার পর থেকে দু'জন গার্ড প্রতিটি সাবমেরিনকে দিন-রাত পাহারা দেয়। একজন ছিল ব্রিজে, আরেকজন বোর দিকে।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। কামান ব্যবহার করতে না পারলে ঘাঁটি থেকে

সাবমেরিন বহরের বেরিয়ে যাওয়া ঠেকানো যাবে না। হাতে সময় আছে আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা, যা করার এরই মধ্যে করতে হবে। আন্ডারওয়াটার এট্রান্স ধসিয়ে না দিয়ে খনির টানেল ধরে পালাতে চেষ্টা করতে পারে ওরা, কিন্তু সেটা হবে স্রেফ কাপুরুষতা ও দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া। রবিবার দুপুর দেড়টায় ব্রিটিশ, আমেরিকান আর জাতিসংঘের জাহাজ তিনটেকে ইসরায়েলিরা যদি ডুবিয়ে দিতে পারে, তার ভয়ঙ্কর ফলাফল যা-ই হোক না কেন, তার দায় রানাকেই বহন করতে হবে। সব জানার পরও ও যদি কিছু না করে, নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না।

'স্যার?' ডাকল হাদী। 'আমি বলি কি, আজ রাতটাই যখন সময় পাচ্ছি, চলুন গার্ডদেরই কাবু করি···'

তার কথা শেষ হলো না, মাথা নাড়ল রানা। 'ঘাঁটিতে আজ সারারাত কাজ হবে। মেরামতের কাজে সবাই কেমন ব্যস্ত দেখলে না? সবগুলো সাবমেরিনে সাপ্লাই তোলা হচ্ছে। উঁহুঁ, আমাদেরকে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। এখন সেলের বাইরে যারাই আমাদেরকে দেখবে, ভাববে, আমাদের মতলবটা কি। কিন্তু যদি দিনের বেলা বেরুই, এই ধরো চা খাবার সময়, কেউ কোন সন্দেহ করবে না। ভাববে আমরা ফেটিগ পার্টিতে আছি।'

ক্লান্ত শরীর, খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিছানায় উঠতেই ঘুম এসে গেল। একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল রানার। স্বপ্নে দেখল ডকসাইটে ডেরিক বসানোর সময় লাইমস্টোনের যে স্ট্রাটাম স্তর আবিষ্কার করেছিল, তাতে আগুন ধরে গেছে। ঘুমটা ভেঙে যেতে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ অনুভব করল রানা। স্বপ্নটার তাৎপর্য বুঝতে পারছে ও। মৃদু ধাক্কা দিয়ে হাদীর ঘুম ভাঙাল ও। 'শোনো! তুমি জানো লাইমস্টোন গরম হয়ে উঠলে কি ঘটে? কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ে, রয়ে যায় শুধু ক্যালসিয়াম অক্সাইড।'

'তো কি হলো?'

'বুঝতে পারছ না? বাতাসের জায়গা দখল করতে পারলে কার্বনডাই অক্সাইড বিষাক্ত হয়ে ওঠে—অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ইউ-টোয়েনটিওয়ানের কমান্ডার অক্সিজেনের অভাবেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।'

রানার মনে পড়ল, চার নম্বর ডক হয়ে উল্টোদিকের স্টোরের গুহা পর্যন্ত লাইমস্টোনের একটা স্তর আছে, স্টোরে ঢোকার মুখে সেটা পাঁচ ফুটের মত চওড়া হয়ে গেছে। ভেজা আবর্জনার স্তূপ লাইমস্টোনের এই স্তরের ওপরই ছিল, আগুন লাগায় কার্বনডাই অক্সাইড ছাড়ছিল। ব্যাখ্যাটা শোনার পর হাদীকে মাথা ঝাঁকাতে দেখল রানা।

'আপনি তাহলে বলছেন ওই লাইমস্টোনে বড় একটা আগুন ধরানো দরকার?' জানতে চাইল সে।

'আমাকে আরও চিন্তা করতে দাও।' সাবমেরিন রিফুয়েলিঙের সময় তেল

ও পেট্রলের ট্যাঙ্ক স্টোর থেকে বেরিয়ে আসে। রানার সঙ্গে একটা দেশলাই আছে। পেট্রলের একটা ড্রাম যেভাবে হোক ফুটো করতে হবে, দেখতে হবে পেট্রল যাতে লাইমস্টোনের স্তরে পড়ে। সুযোগ পাওয়া গেলে লাইমস্টোন খুঁড়ে আগুনের চারপাশে জড়ো করতে হবে। সেজন্যে কোদাল আর শাবল দরকার। খেয়াল রাখতে হবে আগুনের শিখা যেন ছড়িয়ে না পড়ে—কারণ ডকসাইটে ও ডক গ্যালারিতে যথেষ্ট পরিমাণে তেল আছে। আরও একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, নিজেদের নিরাপত্তা। কার্বনডাইঅক্সাইডে ওরা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে সব ভেস্তে যাবে।

রানা মাথা চুলকাচ্ছে দেখে হাদী জানতে চাইল, 'কার্বনডাই অক্সাইডের ক্ষতি করার ক্ষমতা কতটুকু?'

'কোল গ্যাসের মত ওটাকে ঠিক বিষাক্ত বলা চলে না,' জবাব দিল রানা। 'পরিবেশ থেকে অক্সিজেন সরিয়ে ফেলে বা খেয়ে ফেলে আর কি। কি রকম প্রতিক্রিয়া হয় তা তো তুমি দেখেছই। প্রথমে আচ্ছন্ন বোধ করে মানুষ, তারপর জ্ঞান হারায়। তাজা বাতাসে নিয়ে যাও তাকে, একটু পর আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। তবে পরিস্থিতিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলে মানুষ মারাও যেতে পারে।'

'আমাদের অক্সিজেন সিলিন্ডার দরকার হবে, কোথায় পাব?' জানতে চাইল হাদী।

রানার মনের প্রশ্নই উচ্চারণ করছে হাদী। শারমিন আর তিনজন মাইনারের কথাও ওরা ভোলেনি। ঘাঁটিতে অক্সিজেন সিলিন্ডার অনেকই আছে, কিন্তু সেগুলো হাতে পাবার উপায় কি? একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছে হাদী, যে-সব প্রশ্নের উত্তর রানার জানা নেই। এভাবেই রাত ভোর হয়ে এল।

সাত

সকালে নাস্তা খেতে বসে রানাকে হাদী জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, কোন প্ল্যান তৈরি হলো?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কোন সুযোগ দেখতে পেলেই সেটাকে কাজে লাগাতে হবে।' নার্ভাস ও হতাশ বোধ করছে ও। এখনও কোন প্ল্যান তৈরি হয়নি, অথচ যা কিছু করার আগামী বারো ঘণ্টার মধ্যে করতে হবে।

নাস্তা শেষ হতে হাদীর খাটের পায়া থেকে চাবিটা বের করল রানা।

'স্যার?'

'কাজে লাগতে পারে, তাই সঙ্গে রাখছি,' জবাব দিল রানা।

খানিক পর গার্ড এসে সেল থেকে বের করল ওদের, নিয়ে এল কিচেন পরিষ্কার করাতে। এখানের কাজ শেষ হতে নিয়ে আসা হলো ডকে। কাজ

দেয়া হলো, স্টোররুম থেকে রসদ নিয়ে তুলতে হবে ইউ-ফিফটিফোরে, কাল রাতে যেটা এক নম্বর ডকে ভিড়েছে। রানার মনটা একটু খুশি হয়ে উঠল, কারণ এক নম্বর ডক অ্যামুনিশন স্টোরের সবচেয়ে কাছে। জিরো-আওয়ার ঘনিয়ে আসছে, পরিস্থিতিও যেন ওদের অনুকূলে চলে আসছে, এ-সব ভেবে উত্তেজিত হয়ে উঠছে ও।

ডকের উল্টোদিকে এক নম্বর স্টোর-রুম, সেখান থেকে রসদ নিয়ে আসছে ওরা। মেইন গ্যালারি পার হয়ে বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত টানেলে ঢুকতে হচ্ছে ওদেরকে, এই টানেলেই চলে গেছে সোজা স্টোরে। টানেলের দুই প্রান্তে দরজা আছে, ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি। দরজাগুলো খোলা, তালায় চাবি ঝুলছে। সেগুলো বন্ধ করে তালায় চাবি ঝোলানো এক সেকেন্ডের ব্যাপার। ইউ-ফিফটিফোরের একজন অফিসার আর তার অধীনে চারজন লোক কাজ করছে স্টোরে, ওদেরকে আটকে রাখা কোন সমস্যা নয়। সমস্যা নয় ওদেরকে যে দু'জন গার্ড পাহারা দিচ্ছে তাদেরকে কাবু করাও। কিন্তু আরও দু'জন গার্ড সাবমেরিন পাহারা দিচ্ছে, তাদেরকে কিভাবে কাবু করবে? সাবমেরিনের ডেকেও কিছু লোক কাজ করছে, রসদ নিয়ে কনিং টাওয়ার হয়ে নিচে নামছে বা ওপরে উঠছে। অ্যামুনিশন স্টোরের বাইরেও গার্ড আছে, তাদেরকেও তো কাবু করতে হবে। অ্যামুনিশন স্টোরে রানা বা হাদী কখনও ঢোকেনি। শুধু বাছাই করা কিছু লোককে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়। তবে স্টোরটার মুখ পর্যন্ত যাবার সুযোগ হয়েছে রানার। প্রবেশের মুখে বিশাল একটা স্টীল বাল্কহেড তৈরি করা হয়েছে, ঘাঁটিতে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তার আঁচ যাতে অ্যামুনিশন স্টোরে না পৌঁছায়। এই বাল্কহেডের গায়ে দরজা আছে, শুধু মিউনিশন ট্রলি ঢোকার মত চওড়া। টানেলের মুখে, দু'পাশে দু'জন গার্ড সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, এই টানেল মেইন ডক-গ্যালারিকে ছাড়িয়ে এক নম্বর ডককে প্রায় কাটিয়েছে।

পরিস্থিতি আশাপ্রদ নয়, তবু সান্ত্বনা এইটুকু যে অ্যামুনিশন ডিপোর কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছে ওরা। ওদের সঙ্গে নতুন তিনজন লোক কাজে হাত দিল, গায়ে পরিষ্কার ফতুয়া আর নীল ট্রাউজার। তাদেরকে একজন পেটি অফিসার ও দু'জন গার্ড পাহারা দিচ্ছে। রানা বুঝতে পারল এরা মাইনার, শারমিনের সঙ্গে ধরা পড়েছে।

পেটি অফিসার ও অতিরিক্ত দু'জন গার্ড পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলল। তিনজনই অত্যন্ত সতর্ক নজর রাখছে মাইনারদের ওপর। তবে, রানা ভাবল, ওদের দলের সদস্য সংখ্যা এখন বেড়ে গেছে—দু'জন থেকে পাঁচজনে।

একবার ওদেরকে ফাউন্ড্রীতে যেতে হলো, কনিং টাওয়ারের হ্যাচটা আনার জন্যে। হ্যাচে নতুন রাবার জয়েন্টিং রিঙ লাগানো হয়েছে। ফাউন্ড্রীটা ডক গ্যালারির শেষ মাথায়। গোটা গ্যালারি আর প্রায় সবগুলো ডকে লোকজন অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করছে, বিশেষ করে তিন আর চার নম্বর ডকে। চার নম্বর ডক পেরুবার সময় রানা দেখল ইউ-টোয়েনটিওয়ানে

মোবাইল ট্যাঙ্ক থেকে পানি ভরা হচ্ছে, একই সঙ্গে একটা মিউনিশন ট্রাক থেকে সাবমেরিনের ডকে তোলা হচ্ছে অনেকগুলো টর্পেডো। এ. এ. কামানে এখনও কাজ করছে কয়েকজন এঞ্জিনিয়ার।

লোকজন কি নিয়ে আলোচনা করছে শোনার চেষ্টা করল রানা। দেখা গেল আলোচ্য বিষয় মাত্র দুটো। এক, ঘাঁটিতে একটা সুন্দরী মেয়ে এসেছে। ইমার্জেন্সী অ্যালার্ম সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি, তবে সবাই জানে যে মেয়েটার সঙ্গে কয়েকজন পুরুষকেও বন্দী করা হয়েছে ঘাঁটিতে। আরেকটা বিষয় হলো, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বড় একটা অপারেশনে বেরুবে সাবমেরিন বহর। অবশ্য অভিযানটা কি সে-সম্পর্কে কারও কোন ধারণা নেই।

সকাল প্রায় এগারোটার দিকে ঘর ঝাড়ু দেয়ার কাজে ফিরে যেতে হলো রানা ও হাদীকে। তারপর আবার ডকে আনা হলো, এবার ইউ-টোয়েনটিওয়ানে রসদ তুলতে হবে। ওদের সঙ্গে যোগ দিল তিনজন বন্দী মাইনার। ডকসাইটে নানা ধরনের বাক্স দেখা গেল, ভেতরে শুকনো মাংস ও অন্যান্য খাবারের ক্যান আছে। চিনি, লবণ, কফির প্যাকেট স্তূপ হয়ে আছে এক পাশে। মার্জারিন আর বিস্কিটের টিনও আছে। এসব চার নম্বর স্টোর থেকে নিয়ে এসেছে মাইনাররা। একটা ট্রলিতে করে ডকে নিয়ে আসা হলো তেলের বিশাল এক ট্যাঙ্ক। পেট্রলের একটা ট্যাঙ্কও আনা হয়েছে। তবে রিফুয়েলিং অপারেশন এখনও শুরু হয়নি

কয়েকজন ক্রু আর কুক না আসা পর্যন্ত ওদেরকে অপেক্ষা করতে হলো। আফটার হ্যাচ খোলা হতে সাবমেরিনের গহ্বরে নামল তারা। হাদী একাই পারত, তবু তার সঙ্গে হাত লাগাল ওরা, ছোট একটা গ্যাংওয়ে টেনে এনে ডকসাইট আর সাবমেরিনের মাঝখানে ফেলা হলো। ওদের কাজ হলো ডকের রসদ সাবমেরিনে তোলা, তারপর রশিতে বেঁধে আফটার হ্যাচ দিয়ে নিচে নামানো।

প্রায় বারোটা বাজে। প্রথম লাঞ্চের সময় হয়ে এসেছে। ঘাঁটিতে যখন লোক সংখ্যা বেশি থাকে, কিচেন স্টাফের সুবিধের জন্যে দু'বার লাঞ্চ পরিবেশন করা হয়। প্রথমবার বারোটায়, দ্বিতীয় বার সাড়ে বারোটায়।

কাজ শুরু হয়েছে বেশিক্ষণ হয়নি, হ্যাচে একটা বাক্স নামাবার সময় হাদী লক্ষ করল ডকের বাক্সগুলোর কাছে রানা যখন পৌঁছেছে, প্রায় একই মুহূর্তে পৌঁছেছে একজন মাইনারও। হাদী ঠিক ধরতে পারল না, তবে সন্দেহ হলো মাইনারকে কি যেন বলল রানা। এরপর বেশ কিছুক্ষণ রানার সঙ্গে হাদী কথা বলার সুযোগ পেল না, তবে খেয়াল করল মাইনার তিনজন বাক্সগুলো সাবমেরিনে তুলে ডকসাইটের এক জায়গায় জড়ো করছে। একটার ওপর একটা রাখা হচ্ছে ওগুলো, ফলে একটা পাঁচিল তৈরি হচ্ছে।

এরপর হাদীও দু'একটা করে বাক্স এনে আলাদা একটা পাঁচিল তৈরি শুরু করল। এক সময় রানাকে পাশ কাটাল সে, নিচু গলায় নির্দেশ পেল, 'স্ট্যান্ড

বাই।'

কয়েক মিনিট পর গ্যালারির দিক থেকে একটা নির্দেশ ভেসে এল। হাতঘড়ি দেখল রানা। বারোটা বাজে। সাবমেরিনের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল ও। সাদা ইউনিফর্ম পরা লোকজন গ্যালারি হয়ে র‍্যাম্পের দিকে চলে যাচ্ছে, ওপরের গ্যালারিতে উঠবে। সবগুলো ডক প্রায় খালি হয়ে গেল। সাবমেরিন থেকে নামার সময় নিজেদের গার্ড দু'জনকে দেখতে পেল রানা—কয়েকটা বাক্সের পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। একজন হেলান দিয়ে আছে বাক্সের একটা পাঁচিলে। সাবমেরিনে এখন একজন মাত্র গার্ড, কনিং টাওয়ারের ফরওয়ার্ড ডেকে দাঁড়িয়ে। অপর গার্ড সাবমেরিনের ভেতর, সম্ভবত অ্যামুনিশন সাজিয়ে রাখতে ক্রুদের সাহায্য করতে গেছে।

শেল ভর্তি একটা অ্যামুনিশন ট্রলি দেখা গেল, ডকসাইটে দাঁড়িয়ে আছে। ডকসাইট থেকে আরেকটা গ্যাংওয়ে বসানো হয়েছে সাবমেরিনে, এই শেলগুলো ফরওয়ার্ড হ্যাচ দিয়ে নিচে নামানো হবে। এই মুহূর্তে বিশটা শেল সহ ট্রলিটা ডকসাইটে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে, আশপাশে কেউ নেই। ওখানে যারা ছিল তারা ট্রলির অর্ধেক শেল নিয়ে সাবমেরিনের ভেতর ঢুকেছে। আশপাশে লোক বলতে মাইনারদের একজন গার্ড আর একজন পেটি অফিসার। না, কাছাকাছি দু'জন রেটিংও দাঁড়িয়ে আছে।

সাবমেরিন থেকে রানা নেমে আসতেই ওর পিছু নিল হাদী। ওদের গার্ডরা খোশগল্পে মশগুল। বাক্সগুলোর দিকে এগোচ্ছে ওরা, তাদের একজন ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল। তারপর আবার গল্প জুড়ে দিল। রানা ও হাদী দুটো বাক্স ধরল, কিন্তু তুলল না। দম দেয়া একজোড়া পুতুলের মত একযোগে নড়ে উঠল ওরা, পিছন থেকে গার্ড দু'জনের গলা পেঁচিয়ে ধরে টেনে আনল সদ্য তৈরি পাঁচিলের আড়ালে।

'ওদের ভাঁজ করা হাতের চাপে গার্ডদের গলা থেকে কোন শব্দ বা বাতাস বেরুতে পারল না, দু'জনেই জ্ঞান হারিয়ে নেতিয়ে পড়ল। 'ইউনিফর্ম পরে নাও,' হাদীকে বলল রানা, ইঙ্গিতে দীর্ঘদেহী গার্ডকে দেখাল।

হাদী ইতস্তত করল না। ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন আর পিছিয়ে যাবার উপায় নেই। রানার আগে সে-ই ইউনিফর্ম পরা শেষ করল। কাঁধে একটা বাক্স তুলে নিয়ে সাবমেরিনের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। রানাও ইউনিফর্ম পরল, তারপর নিজেদের পরিত্যক্ত কাপড়চোপড় পরিয়ে দিল গার্ডদের। কয়েকটা বাক্স টেনে এনে অচেতন গার্ডদের গায়ে চাপাচ্ছে, এই সময় ফিরে এসেছে হাদী।

'ডেকে বেরিয়ে পেটি অফিসারকে ডাকো,' নির্দেশ দিল রানা। 'লোকটার নাম সালকিন।'

বাক্সগুলোর পিছন থেকে বেরিয়ে এসে হাদী ডাক দিল, 'সালকিন! সালকিন!'

পেটি অফিসার সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। পিছিয়ে বাক্সগুলোর আড়ালে সরে

এল হাদী। অচেতন গার্ডগুলোর পায়ে কয়েকটা বাক্স পড়ে আছে, হাঁটু গেড়ে তাদেরকে পরীক্ষা করছে রানা। বন্দীরা অসুস্থ হয়ে পড়েছে বা দুর্ঘটনায় পড়েছে ভেবে পেটি অফিসারকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'কি হয়েছে?' জানতে চাইল সে। হাদী জবাব দিল তার মাথায় সবেগে একটা বাক্স নামিয়ে এনে।

জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল পেটি অফিসার। বাকি থাকল দু'জন রেটিং। অবশ্য সাবমেরিনের কনিং টাওয়ারেও একজন গার্ড আছে, তাকেও কাবু করতে হবে। নিজেদের তৈরি বাক্সের পাঁচিলের মাথার ওপর দিয়ে উঁকি দিল রানা। এখান থেকে গার্ডটার ডান হাতের সাদা ইউনিফর্মটুকু শুধু দেখা যাচ্ছে। ডকের শেষ মাথা থেকে রসদ নিয়ে মাইনার তিনজনকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, সামনে রয়েছে ওদের গার্ড।

'এখন কি করব, স্যার?' জানতে চাইল হাদী।

হোলস্টার থেকে পেটি অফিসারের রিভলবারটা বের করছে রানা, জবাব দিল, 'ওরা কাছাকাছি এলে ডাক দেবে, পেটি অফিসারকে দেখিয়ে পা আর কাঁধ ধরতে বলবে। বাকি যা করার আমি করব।' অচেতন গার্ড দু'জনকে টেনে সরিয়ে আনল ও, গায়ে কয়েকটা বাক্স চাপিয়ে ঢেকে দিল ওদেরকে।

পেটি অফিসারের মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে হাদী। পায়ের আওয়াজ কাছাকাছি আসতে হিব্রু ভাষায় রেটিং দু'জনকে ডাক দিল। 'পেটি অফিসার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এসো তোমরা, আমাকে সাহায্য করো।' পায়ের শব্দ দ্রুত হলো তার পিছনে, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে সাহস পেল না।

'কি হয়েছে?' একজন রেটিং জিজ্ঞেস করল।

'জানি না, তুমি ওর পা ধরো,' বলল হাদী।

লোকটা এগিয়ে এসে পেটি অফিসারের পা ধরল। দ্বিতীয় রেটিং দাঁড়িয়ে আছে, তার ধারণা হাদী পেটি অফিসারের হাত ধরবে। পেটি অফিসারের শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল হাদী, বলল, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন, ওর হাত দুটো ধরো—এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে এগিয়ে এল দ্বিতীয় লোকটা, পেটি অফিসারের বগলের নিচে হাত গলাল। ঠিক সেই মুহূর্তে অসুস্থকর একটা শব্দ হলো, ধাতব কিছু দিয়ে খুলি ফাটানোর আওয়াজ। পেটি অফিসারের পা ধরে থাকা লোকটা ঢলে পড়তেই রানাকে দেখতে পেল হাদী, দ্বিতীয় রেটিঙের দিকে রিভলবার তাক করছে।

সিধে হলো হাদী, লাফ দিয়ে সামনে এগোল, বিশাল দুই হাত দিয়ে চেপে ধরল লোকটার গলা। লোকটা ধস্তাধস্তি করারও সুযোগ পেল না, জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। 'ইউনিফর্মগুলো পরে ফেলো,' মাইনারদের নির্দেশ দিল রানা, পাঁচিলের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখল ডকসাইট সম্পূর্ণ খালি পড়ে আছে। তবে সাবমেরিনের গার্ড কনিং টাওয়ারের সামনে এখনও পাহারা দিচ্ছে। 'এদিকে কেউ এলে কি করতে হবে তোমরা জানো।' হাদীকে ইঙ্গিত করল ও, কাঁধে একটা বাক্স তুলে নিয়ে ওর পিছু নিল সে। সাবমেরিনের দিকে যাচ্ছে

ওরা।

আফটার গানের সামনে এসে থামল দু'জন। 'গার্ডকে এখানে আনতে হবে,' ফিসফিস করল হাদী। 'আপনি স্যার ভান করুন, যেন কামানে কোন ত্রুটি দেখা দিয়েছে। মুখটা ঘুরিয়ে রাখবেন, যাতে আলো না পড়ে।'

হিব্রু ভাষায় ডাক দিল রানা, 'গার্ড! গার্ড!'

ফাঁপা ইস্পাতের ওপর বুটের আওয়াজ হলো। ওদের গার্ডের সঙ্গে রিভলবার ছিল, কিন্তু রেটিং যারা সাবমেরিন পাহারা দেয় তাদের কাছে রাইফেল থাকে, সঙ্গে ফিট করা বেয়োনেট। লোকটা কাছে চলে এসেছে বুঝতে পেরে কামানের পাশে টেলিস্কোপ সাইটটা ইঙ্গিতে দেখাল রানা। 'কে যেন এটা ভেঙে ফেলেছে।'

সাইটে চোখ রাখল গার্ড। পিছন থেকে হাদী তার নাকের নিচে ঘুসি মারল। লোকটাকে রানা পড়ে যেতে দিল না, পড়ার আগেই ধরে ফেলল; তারপর কোন শব্দ না করে শুইয়ে দিল ডেকে। 'জলদি!' বলেই মই বেয়ে ব্রিজে উঠতে শুরু করল, পিছু নিল হাদী।

মইয়ের মাথায় ওঠার আগে একবার থামল ওরা। ডকের শেষ মাথায় গ্যালারি ধরে কেউ একজন কোথাও যাচ্ছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বাক্সের পাঁচিলটার দিকে তাকাল রানা। মাইনার তিনজন ইউনিফর্ম পরতে ব্যস্ত। আপাতত বিপদের কোন ভয় নেই, বুঝতে পেরে মইয়ের মাথায়, ব্রিজে উঠে এল ও, কনিং টাওয়ারের হ্যাচ গলে নেমে এল নিচে। হাদী ওর ঠিক পিছনেই আছে। কন্ট্রোল রুমকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা, নিঃশব্দে সামনে এগোচ্ছে, দু'জনের হাতেই রিভলবার। হাদী একটু ইতস্তত করে সামান্য পিছিয়ে পড়ল, ইঙ্গিতে সামনে থাকতে বলল রানাকে। একটা বাল্কহেডে পৌঁছেছে ওরা। ওটার সামনে রানা ওদের শেষ গার্ডটাকে দেখতে পেল, রাইফেল ভর্তি একটা র‍্যাকে হেলান দিয়ে গুন গুন করে সুর ভাজছে। হাতে রিভলবার, ভেতরে ঢুকল রানা। পায়ের আওয়াজ পেয়ে তড়াক করে লাফ দিয়ে সিধে হলো লোকটা, রানাকে একজন অফিসার ধরে নিয়েছে। তার রাইফেলের বাঁট স্টীল প্লেটে বাড়ি খেলো। 'রাইফেলটা দাও,' হিব্রুতে বলল রানা। এক পা এগিয়ে হাত বাড়াল, ছিনিয়ে নিল রাইফেলটা। লোকটা বাধা দিল না, ইতিমধ্যেই দেখে নিয়েছে রিভলবার হাতে তাকে কাভার দিচ্ছে হাদী।

'আফট-এ নিয়ে যান ওকে, স্যার,' বলল হাদী।

গ্যাংওয়ে ধরে নেমে এল ওরা, কন্ট্রোল রুম আর ওয়ার্ড-রুমকে পাশ কাটাল, ঢুকে পড়ল স্টোরেজ চেম্বারে। এখানে ওরা যে বাক্সগুলো হ্যাচের ভেতর দিয়ে নিচে নামিয়েছিল সেগুলো সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। তিনজন রেটিং আর একজন অফিসার কাজ করছে। ওদেরকে দেখেই পাথর হয়ে গেল সবাই। কারও হাতে কোন অস্ত্র নেই।

'স্যার, ওদেরকে বলুন কেউ একটু শব্দ করলেই আমি গুলি করব। নরম, অনুরোধের সুরে বলুন। খোদার কসম, মানুষ খুন করতে আমি পছন্দ করি না।'

হাসি চেপে হাদীর কথাগুলো ভাষান্তর করল রানা।

'এবার স্যার, আপনি ওই হ্যাচ দিয়ে ওপরে উঠে যান,' বলল হাদী। 'আমাদের আগের সব গার্ডকে এখানে ফেলার ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা দেখেন।'

ওখান থেকেই মই বেয়ে ডেকে উঠে এল রানা। মাইনারদের আগেই বলা ছিল, ওর সঙ্কেত পেয়ে অচেতন পেটি অফিসার আর গার্ডদের কাঁধে তুলে ছুটে আসছে সাবমেরিনের দিকে। সঙ্কেত দিয়েই সাবমেরিনের সামনের দিকে ছুটল রানা, আফটার গানের পাশে পড়ে থাকা গার্ডটাকে টেনে আনল মইয়ের মাথায়। মাইনাররা বোঝা কাঁধে নিয়ে পৌঁছুতেই হ্যাচ থেকে নিচে ফেলে দেয়া হলো অচেতন লোকগুলোকে। তারপর ওপর থেকে বন্ধ করে দেয়া হলো হ্যাচ কাভার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে থাকা লোকগুলো সেটা খোলার চেষ্টা করল। দু'জন মাইনারকে ভারী কিছু একটা পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে ডকসাইটে পাঠাল রানা। তারা ছোট একটা ফর্জ নিয়ে এল। ডকের এক পাশে পড়ে ছিল ওটা, কয়েক হানড্রেডওয়েট ওজন হবে। হ্যাচের ঢাকনিতে সেটা চাপিয়ে দেয়া হলো।

ইতিমধ্যে হাদীর জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে রানা। সাবমেরিনের ভেতর থেকে এখনও সে উঠে আসেনি। দ্বিতীয় দফা লাঞ্চ শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই, যে-কোন মুহূর্তে ডকে লোকজন এসে পড়বে। তাছাড়া, স্টোর-রুমের লোকজন ভাবতে পারে বন্দীরা বাক্স নিতে আসছে না কেন। সামনে, কনিং টাওয়ারের দিকে ছুটল রানা। মই বেয়ে ব্রিজে উঠছে, হ্যাচের কিনারায় হাদীর মাথা দেখা গেল। একটা লাইট মেশিন গান আর কয়েকটা ম্যাগাজিন নিয়ে এসেছে সে।

'ট্রলিটা কামানের পাশে নিয়ে এসো,' নির্দেশ দিল রানা।

ইতস্তত করছে হাদী। 'শেলগুলো এই গানে ফিট করবে তো?'

'জানি না,' বলল রানা। 'দেখতে হবে।'

একজন মাইনারকে ইঙ্গিত করে লাফ দিয়ে ডকসাইটে নামল হাদী, তারপর শান্ত পায়ে হেঁটে এল ট্রলিটার কাছে। দু'জন মাইনার সাহায্য করল ওকে, গ্যাংওয়ে দিয়ে ট্রলিটাকে ওরা আফটার গানের পাশে তুলে আনবে।

ডক ধরে ট্রলিটাকে টেনে আনছে ওরা, হঠাৎ পিছন থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। ডকের শেষ মাথায়, স্টোর-রুমের দরজায় একজন অফিসার দাঁড়িয়ে। আবার চিৎকার করল, 'বন্দীদের তোমরা কোথায় পাঠিয়েছ?' আরেকজন লোককে দেখা গেল, গ্যালারিকে পাশ কাটিয়ে কোথাও যাচ্ছিল, অফিসারের গলা শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

হাদী ভাবল, সব শেষ। তবে জবাব দিতে দেরি করল না, 'লেফটেন্যান্ট বললেন নতুন বাক্স আনার আগে ডক থেকে সমস্ত বাক্স সরিয়ে ফেলতে হবে। এই শেলগুলোও ডক থেকে সরাতে বলেছেন তিনি।'

অফিসার ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকালেন। 'ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি সারো। তোমাদের লাঞ্চের সময় হয়ে এসেছে।' স্টোর-রুমে ঢুকে পড়ল সে।

দাঁড়িয়ে পড়া লোকটাও চলে গেল।

ইতিমধ্যে মাইনাররা ছোট্ট গ্যাংওয়েটাকে টেনে এনে সাবমেরিনের গায়ে লাগিয়েছে। ওপরে, কামানটার ওপর ঝুঁকে রয়েছে রানা। ডেকে উঠে আসছে হাদী, দেখতে পেল কামানের মাজল ধীরে ধীরে নিচু হচ্ছে। রানার চোখ সাইটে, মাজলটা মেইন কেভের শেষ প্রান্তের দিকে তাক করছে ও। হাদী কাছে এসে দেখল, ব্রিচ খুলে ফেলছে রানা। তার হাত থেকে একটা শেল নিয়ে ভেতরে ভরল ও। খাপে খাপে বসে গেল সেটা। ব্রিচ বন্ধ করে পিঠ সিধে করল, তাকাল হাদীর দিকে। 'সব ঠিক আছে। এখন শুধু কর্ড ধরে টান দিলেই গোলা বেরিয়ে যাবে।' ইঙ্গিতে ট্রিগার কর্ডটা দেখাল হাদীকে। 'তারপর ব্রিচ খুলতে হবে—এভাবে। খরচ করা শেল বেরিয়ে আসবে, নতুন শেল ভরে আবার টান দিতে হবে কর্ডে।'

দু'জন মাইনার শেলগুলো বয়ে আনছে, নামিয়ে রাখছে কামানের নিচে।

'তোমরা মেশিন-গান চালাতে জানো?' তাদেরকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'দু'জনেই আমরা আর্মিতে ছিলাম,' জবাব দিল আহুদ। তারপর গর্বের সঙ্গে বলল, 'আমিই মিস শারমিনকে পথ দেখিয়ে খনির ভেতর এনেছি।'

'ধন্যবাদ,' বলে হাদীর দিকে ফিরল রানা। 'সবচেয়ে কঠিন আর জরুরী কাজটা এখনও বাকি। তুমি এখানকার চার্জে থাকো। সাবমেরিনে নেমে যেখানে আমরা আমাদের দ্বিতীয় গার্ডকে দেখেছিলাম সেখানে সব রকম অস্ত্রই আছে—রাইফেল, হ্যান্ড-গ্রেনেড, রিভলবার। যার যা খুশি বেছে নিতে পারো। যখন দেখবে ডক নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না, শুধু তখন ফায়ার করবে। আমি শারমিনকে আনতে যাচ্ছি।'

'স্যার, আপনি আমাদের লীডার,' প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল হাদী। 'আপনাকে আমরা কোথাও যেতে দিতে পারি না। মিস শারমিনকে আমি নিয়ে আসতে যাচ্ছি।'

'পাগলামি করো না, হাদী···'

হেসে ফেলল হাদী। 'পাগলামিই তো করব, স্যার! ওরা এখনও সবাই আমাকে পাগল-ছাগল বলে জানে, কাজেই আমারই ধরা পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। দিন, চাবিটা দিন।'

হাদীর কথায় যুক্তি আছে। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে চাবিটা তার হাতে গুঁজে দিল রানা। তারপর বলল, 'শারমিনকে এখানে নিয়ে এসে সম্ভবত কোন লাভ নেই। এরপর যা ঘটবে, ঘাঁটির একটা প্রাণীও বাঁচবে না।'

মাথা নাড়ল হাদী। 'লাভ আছে, স্যার। এঞ্জিন-রুমে তিনজন এঞ্জিনিয়ারকে দেখে ভেতরে আটকে রেখে এসেছি আমি। আমাদেরকে শুধু ডক ডুবিয়ে দিয়ে সাবমেরিনটাকে ভাসাতে হবে। আর মাত্র এক ঘণ্টা পর জোয়ার। এদিকের কাজ তাড়াতাড়ি সারতে পারলে পালিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ পাব। মেইন কেভে পৌঁছুতে পারলে সাবমেরিন নিয়ে ডুব দেব আমরা,

আন্ডার-সী এন্ট্রান্স দিয়ে খোলা সাগরে বেরিয়ে যাব।'

রানা তর্কের মধ্যে গেল না, তিক্ত একটু হাসল শুধু।

হাদী জানতে চাইল, 'আপনার অন্য কোন প্রস্তাব আছে? ভুলে যাবেন না, স্যার, মাইন ব্লক করে দেয়া হয়েছে।'

'ঠিক আছে, যাও তুমি, আগে শারমিনকে নিয়ে এসো।'

আট

হাদী চলে যাবার পর আহুদকে কামানের কাছে পাহারায় রেখে সুলতানকে নিয়ে কনিং টাওয়ারের হ্যাচ বেয়ে সাবমেরিনের ভেতর নামল রানা। তিক্ত সেই হাসির রেশটুকু এখনও ওর ঠোঁটে লেপ্টে আছে। এই সাবমেরিন চালাতে ষাটজন লোক দরকার, অথচ হাদী ভাবছে ওরা দু'তিনজন মিলে চেষ্টা করলে এটাকে এর নিজস্ব শক্তির সাহায্যে গুহার জলমগ্ন মুখ দিয়ে বের করে নিয়ে যেতে পারবে। ঠিক সচেতন কোন উদ্দেশ্যে নয়, হাতে কিছু গ্রেনেড রাখতে চাইছে ও। ম্যাগাজিন রুমে এসে ওরা তিনজন চারটে করে গ্রেনেড ভরল পকেটে, দুটো রাইফেল আর বেশ কিছু অ্যামুনিশন নিল। সাবমেরিনের ডেকে উঠে এসে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল ওগুলো। ঘড়িতে এখন বারোটা পঁচিশ। আর পাঁচ মিনিট পর প্রথম দফা লাঞ্চের সময় পার হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে হাদীর ফিরে আসার কথা না? তাকে অবশ্য টপ গ্যালারিতে উঠতে হবে। গার্ড-রুমের দরজা যদি খোলা থাকে, কেউ দেখে ফেলার ভয়ে সেলের তালা খুলতে ভয় পাবে সে।

এই সময় ডকের শেষ মাথা থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'গার্ড! কুত্তাগুলোকে বলো বাক্সগুলো এখান থেকে নিয়ে যাক।'

কনিং টাওয়ারের আড়াল থেকে উঁকি দিল রানা। স্টোর-রুমে যাবার টানেলের মুখে এক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও জবাব দিল, 'এখানকার কাজ শেষ হলেই ওদেরকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

তারপরই রানার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। টানেলের মুখে একজন অফিসার হাজির হলেন। দেখেই চিনতে পারল ও—ইউ-টোয়েনটিওয়ানের কমান্ডার। লোকটার সঙ্গে কথা বলছে সে। ডেকে পড়ে থাকা বাক্সগুলো তাকে দেখাল লোকটা। মাথা ঝাঁকাল্ কমান্ডার, ডক ধরে সাবমেরিনের দিকে হেঁটে আসছে।

'কামানের পিছনে দাঁড়াও,' বিড়বিড় করল রানা, দ্রুত টানা-হ্যাঁচড়া করে গ্রেনেড আর রাইফেলগুলো চোখের আড়ালে সরিয়ে ফেলল। তারপর মাইনার দু'জনকে নিয়ে গুঁড়ি মেরে বসে থাকল, অপেক্ষা করছে।

গ্যাংওয়ের নিচে থামল কমান্ডার। কনিং টাওয়ারের ঠিক সামনে রয়েছে মাইনার আহুদ, মুখ তুলে তার দিকে তাকাল। আহুদ এক চুল নড়ছে না।

চোখ নামিয়ে আবার গ্যাংওয়ের দিকে তাকাল কমান্ডার। কামানের মাউন্টিঙের ফাঁক-ফোকর দিয়ে কোন রকমে তার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে রানা। গ্যাংওয়ের পজিশন লক্ষ করে বিস্মিত হয়েছেন সে। কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে গ্যাংওয়ে ধরে সাবমেরিনের ওপর উঠল, পিছন দিকে চলে যাচ্ছে। খানিক আগে লোড করা একটা রাইফেল তুলে নিল রানা, বুড়ো আঙুল দিয়ে সেফটি ক্যাচ অফ করল। যুদ্ধটা অসমই হবে, তবে শুরু হতে চলেছে। হ্যাচের ঢাকনির ওপর ফর্জ চাপা দেয়া আছে, এখুনি সেটা দেখে ফেলবে কমান্ডার। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত তার পিছু নিল রানা, হাতে বাগিয়ে ধরা রাইফেল। ফর্জের ওপর ঝুঁকল কমান্ডার। তারপর দু'হাতে ধরে ওটাকে তুলতে চেষ্টা করল। রানা পঞ্চাশ ফুট দূরে। ডেকে একটা হাঁটু গেড়ে রাইফেলটা কাঁধে ঠেকাল। 'আপনাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে,' হিব্রুতে বলল। 'হাত দুটো মাথার পিছনে রাখুন। নড়বেন না।'

ঝট করে সিধে হল কমান্ডার, এতটুকু ইতস্তত না করে হাত বাড়াল রিভলভারের দিকে। রানার কিছু করার নেই, ট্রিগার টান দিতে হলো। বদ্ধ গুহার ভেতর গুলির আওয়াজটা কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয়ার উপক্রম করল। হোলস্টার ছুঁয়েই স্থির হয়ে গেল কমান্ডারের হাত, তারপর হাঁটু জোড়া ভাঁজ হয়ে গেল। লোকটা মারা গেছে কিনা দেখার জন্যে থামল না রানা। তবে ঘুরে সামনের দিকে ছোটার সময় তার পতনের আওয়াজটা শুনতে পেল। 'ম্যান দ্যাট গান!' অর্ডার দিল ও।

সাজিদ কামানের পাশে পজিশন নিচ্ছে, ফিরে এল রানা। 'হ্যান্ড-গ্রেনেড।' সুলতানের দিকে আঙুল তাক করল। 'তুমি তিন নম্বর ডকে নজর রাখো। আমি পাঁচ নম্বরটা দেখব। গ্যালারির দুই দিকই ব্লক করে রাখতে হবে।' রানার কথা শেষ হওয়া মাত্র কয়েকটা গ্রেনেড নিয়ে লাফ দিয়ে ডকে পড়ল সুলতান।

তিনটে গ্রেনেড নিয়ে রানাও লাফ দিল। রাইফেলটা রেখে এসেছে ও, তবে কোমরে গুঁজে রেখেছে রিভলবারটা। ডক ধরে ছুটছে ওরা, গ্যালারি থেকে কয়েকজন লোককে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। দু'জন পাঁচ নম্বর ডকের দিকে চলে গেল। কিন্তু আরও তিনজন দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর ছুটে এল ওদের দিকে। ভাগ্য ভাল যে ওরা রেটিং, সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই। রানা গুলি করতেই ঘুরে গেল তারা, যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। ফাঁকা গুলি করেছিল রানা, কাউকে লাগেনি।

টানেলের মুখে আরও কিছু লোক বেরিয়ে এসেছে। তবে কারও কাছেই অস্ত্র নেই, ওদেরকে দেখে পিছিয়ে গেল। ওরা দু'জন ইতিমধ্যে ডকের প্রায় শেষ মাথায় চলে এসেছে, সুলতানের সঙ্গে একই সমান্তরাল রেখায় রয়েছে রানা। এই সময় দু'জনেই দেখতে পেল তিন নম্বর ডক থেকে গার্ডদের একজন বেরিয়ে এল। হাতে রাইফেল আছে, কিন্তু ওদের গায়ে সাদা ইউনিফর্ম দেখে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল, কিছু করছে না। 'পিছাও!' হিব্রুতে ধমক দিল রানা। নিজের ডক পাহরা দাও। ওরা বিদ্রোহ

করেছে!'

ওরা কারা জিজ্ঞেস করল না, লোকটা রানার নির্দেশ পালন করল। কিন্তু সুলতানকে নিয়ে গ্যালারির কাছাকাছি আসার পর রানা দেখল ওই গার্ড আরও দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে তিন নম্বর ডকের মুখে দাঁড়িয়ে আছে, হাতের রাইফেল ওদের দিকে তাক করা। 'পিন খোলো,' সুলতানকে বলল রানা। গার্ড তিনজনকে তার দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে ওদের নিজেদের আর পাঁচ নম্বর ডকের মাঝখানে গ্যালারির যে অংশটুকু পড়ে, সেদিকে মনোযোগ দিল ও। অন্যান্য ডক আর গ্যালারির সামনের দিকে স্টোর-রুম থেকে লোকজনকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। দু'জন সম্ভবত একই সময়ে গ্রেনেড ছুঁড়েছে, কারণ ঘুরে গিয়ে পাশাপাশি ছুটছে ওরা, বাতাসে শিস কেটে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রাইফেলের বুলেটগুলো।

অকস্মাৎ বিকট এক বিস্ফোরণের শব্দ হলো। প্রথমে একটা, তারপর আরেকটা। ওদের পায়ের নিচে পাথুরে মেঝে কেঁপে উঠল, গরম বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় ছিটকে পড়ল দু'জনেই। ডকসাইটের শক্ত পাথরে মুখ থুবড়ে পড়ল রানা, একটা হাত কুশন হিসেবে থাকায় কপালটা চৌচির হলো না। নাকের ভেতরটা তরল আর গরম রক্তে ভরে উঠল। পাথরে চিড় ধরতে শুরু করায় রোমহর্ষক একটা আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। টলতে টলতে সিধে হলো, সামনে এগোবার সময় হোঁচট খাচ্ছে। ওদের পিছনে পাথরে চিড় ধরার আওয়াজটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। ঘাড় ফেরাতেই রানা দেখল ওদের আর তিন নম্বর ডকের মাঝখানে গ্যালারির পুরো ছাদ খসে পড়ছে। মুহূর্তের জন্যে গার্ডদের দেখতে পেল, ঘুরে গিয়ে ছুটছে; পরমুহূর্তে সেখানে পাথরের স্তূপ তৈরি হতে দেখল, ধুলোর মেঘের ভেতর অস্পষ্ট।

সুলতান হাঁপাচ্ছে, তার বাম চোখের নিচে কুৎসিত একটা ক্ষত। ধুলো সরে যেতে শুরু করল। রানা দেখল, তিন নম্বর ডকে যাবার গ্যালারি সম্পূর্ণ ব্লক হয়ে গেছে। তবে ডান দিকে, অর্থাৎ ওদের আর পাঁচ নম্বর ডকের মাঝখানে কি ঘটেছে দেখতে পাচ্ছে না ও। মেঝেতে অবশ্য প্রচুর আবর্জনা ছড়িয়ে রয়েছে।

ছুটে ডকে ফিরে এল রানা, হাতে একটা গ্রেনেড। বিস্ফোরণের ধাক্কায় বেশিরভাগ ইলেকট্রিক বালব ভেঙে গেছে। তবে আধো অন্ধকারেও একজন অফিসারের সাদা ইউনিফর্ম চিনতে পারল ও, স্টোর-রুম থেকে টানেলে বেরিয়ে এল। তার টর্চের আলো রানাকে প্রায় অন্ধ করে দিল। 'কি ঘটেছে?' জিজ্ঞেস করল সে, রানাকে ঘাঁটির একজন গার্ড ধরে নিয়েছে। তারপর গ্রেনেডটা দেখতে পেল। 'তোমার উদ্দেশ্য কি?'

আর কোন উপায় নেই, পিন খুলে গ্রেনেডটা টানেলে ছুঁড়ে দিল রানা, লাফ দিয়ে সরে এল এক পাশে। রিভলবারের বুলেটটা রানার মাথার আধ ইঞ্চি দূর দিয়ে ছুটে গেল। এক সেকেন্ড পর একটা চোখ-ধাঁধানো আলো ঝলসে উঠল, প্রায় একই সঙ্গে শোনা গেল বিস্ফোরণের আওয়াজ। কিন্তু মেঝেতে পড়েও টর্চটা জ্বলছে, মুহূর্তের জন্যে টানেলটা ভেসে থাকল চোখের

সামনে। দেখা গেল গোটা ছাদ নেমে আসছে। এক সেকেন্ড ঝুলে থাকল ওটা, খসে পড়ছে শুধু ছোট ছোট পাথরগুলো। তারপর সগর্জনে খসে পড়ল, সেই সঙ্গে অন্ধকার হয়ে গেল গোটা দৃশ্যটা।

পকেট থেকে ইমার্জেন্সী টর্চ বের করে জ্বালল রানা, গার্ডদের সবার পকেটেই একটা করে থাকে। জায়গাটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। ডকের শেষ মাথা ফাটা ও ভাঙা পাথরের একটা স্তূপে পরিণত হয়েছে। পাথরের বেশিরভাগই লাইমস্টোন। হঠাৎ রানা সচেতনভাবে উপলব্ধি করল গ্রেনেডগুলো কেন সঙ্গে রাখতে ইচ্ছে হয়েছিল ওর।

ওর নাগালের মধ্যে এখন প্রচুর লাইমস্টোন আছে। আর ওর পিছনের ডকে আছে অয়েল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক আর ছোট একটা পেট্রল ট্যাঙ্ক। এদিকটা থেকে বেশ কিছুক্ষণ কেউ ওদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না। তিন নম্বর ডকের দিক থেকেও কোন বিপদের ভয় নেই। এক, দুই আর তিন নম্বর ডকে সব মিলিয়ে পঁচিশ থেকে ত্রিশজন লোক কাজ করছিল। ডকে আর অ্যামুনিশন ও ফুয়েল স্টোরে। সবাই তারা ছাদ ধসে পড়ায় আটকা পড়েছে। ঘাঁটির বাকি লোকের সঙ্গে যোগ দিতে হলে খোলা ডকের শেষ মাথা থেকে সাঁতার কেটে আসতে হবে তাদেরকে।

বিপদ আসবে পাঁচ নম্বর ডক থেকে। ইস, আপার গ্যালারিতে ওঠার র‍্যাম্পটা যদি উড়িয়ে দিত! কোন সন্দেহ নেই, ঘাঁটির সব লোক এখন ছুটে ঢুকে পড়ছে পাঁচ, ছয় আর সাত নম্বর ডকে।

কান পাতল রানা। গ্যালারির ছাদ থেকে এখনও কিছু কিছু পাথর খসে পড়ছে, মেঝেতে ধসে পড়া পাথরের স্তূপও নড়াচড়া করছে, সে-সব শব্দকে ছাপিয়ে অস্পষ্টভাবে লোকজনের চিৎকার ভেসে আসছে ডকের খোলা প্রান্ত থেকে। আবর্জনার ওপর চড়ল রানা, ওদের আর পাঁচ নম্বর ডকের মাঝখানে খসে পড়া পাথরগুলো পরীক্ষা করল। ওদিকের গ্যালারি মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত নিরেট পাথর ছিল। খসে পড়া পাথরের স্তূপ দেখে রানার ধারণা হলো, এ-সব পরিষ্কার করতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে, কাজেই এদিক থেকে আক্রান্ত হবার কোন ভয় নেই। কোন কোন পাথরের টুকরো এত বড়, মোবাইল ড্রিল ব্যবহার করলেও ভাঙতে প্রচুর সময় লাগবে।

আবর্জনার চূড়া থেকে সুলতানের পাশে নেমে এল রানা। ক্ষতটার রক্ত তার সারা মুখে লেপ্টে গেছে। 'এসো,' বলেই ছুটল ও। 'মেশিন-গানটা সাবমেরিনের পিছনে নিয়ে যেতে হবে।'

গ্যাংওয়ে বেয়ে সাবমেরিনে উঠে এল ওরা। এখানে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে সাজিদ আর আহুদ। আহুদকে কামানের কাছে থাকতে বলল রানা। সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিল আক্রান্ত না হলে গোলা ছোঁড়ার দরকার নেই। ওর সঙ্গে হাত লাগাল সুলতান, লাইট মেশিন-গানটা ধরাধরি করে সাবমেরিনের পিছন দিকে নিয়ে এল। ম্যাগাজিন, রাইফেল আর কয়েকটা গ্রেনেড নিয়ে ওদের পিছু নিল সাজিদ।

লাইট মেশিন-গানের চারপাশে কাঠের কয়েকটা বাক্স সাজিয়ে ব্যারিকেড

তৈরি করল ওরা। মেশিন-গান ঠিকমত কাজ করবে কিনা জানার জন্যে সাজিদ এক পশলা গুলি করল। সব ঠিক আছে। লাভ হলো এই যে সাজিদ তার টার্গেট মিস করেনি। মেইন কেভে ভাসছিল হলিজ গিয়ার বয়া, তার টার্গেট ছিল ওই বয়ার মাথাটা।

সাজিদকে লাইট মেশিন-গানের কাছে রেখে সুলতানকে নিয়ে কনিং টাওয়ারে ফিরে এল রানা। ইতিমধ্যে ওর মাথায় যে প্ল্যানটা তৈরি হচ্ছিল সেটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে। ডকের শেষ মাথা নিজেদের দখলে রাখতে হবে, আর সেজন্যে আরও অস্ত্র ও অ্যামুনিশন দরকার ওদের। ওর প্ল্যানটা হলো হাদী আর শারমিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা বা মিলিত হওয়া, তারপর ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া। জোয়ারের সময় সাবমেরিন নিয়ে পালিয়ে যাবার যে সম্ভাবনাটা ছিল, এখন আর সেটা নেই। হাদী আর শারমিনকে রেখে পালিয়ে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া, শুধু সাবমেরিনের এঞ্জিনের ওপর নির্ভর করে আন্ডার-সী এগজিট দিয়ে বেরুতে চাওয়াটা নেহাতই বোকামি হবে। আরও সমস্যা আছে। ওদের সাবমেরিন মেইন কেভে পৌঁছানো মাত্র ঘাঁটির বাকি সব সাবমেরিন থেকে ওদেরকে গুলি করা হবে—ওদের সাবমেরিন ডুব দেয়ার আগেই ওটাকে ডুবিয়ে দেয়া হতে পারে। তাতে হয়তো আন্ডার-সী এগজিট ব্লক হয়ে যাবে, এ-কথা সত্যি; কিন্তু রানার প্ল্যান বা ইচ্ছে, আন্ডার-সী এগজিট বন্ধ করা, সেই সঙ্গে সবাইকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া।

সাবমেরিনের ম্যাগাজিন রুমে চারবার আসা-যাওয়া করল ওরা। প্রথমে নিয়ে এল আরও একটা লাইট মেশিন-গান, চারটে ম্যাগাজিন আর কিছু গ্রেনেড। এ-সবই সাবমেরিনের পিছন দিকে জড়ো করা হলো। দ্বিতীয়বার নিয়ে এল আরও একটা লাইট মেশিন-গান, কামানের পাশে বসানোর জন্যে। তারপর আনল চারটে রাইফেল, প্রয়োজনীয় ম্যাগাজিন সহ। সবশেষে প্রচুর গ্রেনেড।

শেষ বোঝাগুলো নিয়ে সাবমেরিনের ওপরে উঠে এসেছে ওরা, খুদে ডিজেল-এঞ্জিন বসানো টাগ-এর কর্কশ আওয়াজ ঢুকল কানে। পিছন দিকে ছুটল ওরা, একই সময়ে সাজিদ লাইট মেশিন-গান থেকে ফায়ার ওপেন করল। অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে ওরা, এই সময় রানা দেখল ছোট একটা কালো কি যেন উড়ে আসছে। জিনিসটা ইউ-টোয়েনটিওয়ানের ঠিক পিছনে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পানির বড় একটা স্তম্ভ খাড়া হলো, শোনা গেল ভোঁতা একটা গর্জন।

ডাইভ দিয়ে প্যাকিং কেসগুলোর আড়ালে চলে এল ওরা। সুলতান স্পেয়ার মেশিন-গানটা দখল করল, রানা তুলে নিল একটা অটোমেটিক রাইফেল। ডেক ভিজে গেছে, ভিজে গেছে সাজিদের ইউনিফর্ম। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ইসরায়েলিরা কি করতে চেয়েছিল। ডকের প্রবেশমুখে পাথরের বড়সড় একটা ধস নামাতে পারলে ওদেরকে তারা পুরোপুরি ফাঁদে আটকে ফেলতে পারবে। কিন্তু তাদের সমস্যা হলো, ডকের প্রবেশমুখে আঘাত

করতে হলে যেখান থেকে গ্রেনেড ছুঁড়তে হবে সেখানে তারা বেরিয়ে আসতে পারছে না, এলেই ওদের গুলি খেতে হবে। তবে পানির নিচে গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ডকের ফ্লাড গেটের ক্ষতি করেছে বলে মনে হলো, কারণ ওদের নিচে থেকে ঘড় ঘড় আওয়াজ উঠে আসছে, ডকে পানি ঢোকার শব্দ, অথচ জোয়ার শুরু হতে এখনও খানিকটা দেরি আছে।

টাগ এঞ্জিনের আওয়াজ খুব কাছে চলে এসেছে। পাঁচ নম্বর ডকের প্রবেশমুখের ঠিক বাইরে রয়েছে ওটা, দুটো ডককে আলাদা করে রাখা পাথুরে পাঁচিলের বাড়তি অংশটুকুই শুধু ওটাকে আড়াল করে রেখেছে। টাগের এঞ্জিন হঠাৎ গর্জে উঠল। সাজিদ একটা গ্রেনেড হাতে নিল। পাঁচিলের আড়াল থেকে বোটটা নাক বের করতেই পিন খুলে ফেলল সে। ডেকে একটা হাঁটু গেড়ে রাইফেল তুলল রানাও। টাগ বোট পিছনে ফেনা তুলে পাঁচিলের আড়াল থেকে তীর বেগে বেরিয়ে এল।

সাইটে চোখ রেখে ট্রিগারে টান দিল রানা। পাশ থেকে গর্জে উঠল সুলতানের মেশিন-গান। রানা ঠিক দেখল না, শুধু অনুভব করল সাজিদ হাত উঁচু করে গ্রেনেড ছুঁড়ছে। বোটের হুইল ধরে থাকা লোকটা গুলি খেয়ে ঢলে পড়ল। দ্বিতীয় লোকটা গ্রেনেড ছুঁড়তে যাচ্ছিল, সে-ও প্রথমে স্থির হয়ে গেল, তারপর কাত হয়ে পড়ে গেল পানিতে। প্রায় একই মুহূর্তে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণে দু'টুকরো হয়ে গেল টাগ। সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল সেটা, পানিতে ভেসে থাকল তিনটে লাশ আর কিছু আবর্জনা।

এক সেকেন্ড পর একটা মেশিন-গান গর্জে উঠল, সাত নম্বর ডক থেকে। লক্ষ্যস্থির করতে পারছে না, কারণ সর্বশেষ বিস্ফোরণে ডকের অবশিষ্ট আলো নিভে গেছে। তবে খানিক পরই একটা সার্চলাইট জ্বালল তারা। ডকের আরও পিছন দিকে সরে আসতে হলো ওদেরকে। এ-ছাড়া কোন উপায় নেই। ইসরায়েলিরা হতাহতের ঝুঁকি নিতে পারে, ওরা পারে না। রানার নির্দেশে প্যাকিং কেস দিয়ে আরেকটা অর্ধবৃত্তাকার ব্যারিকেড তৈরি করা হলো।

নতুন ব্যারিকেডের আড়ালে আহুদকে ডেকে নিয়ে রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করল রানা। ওর প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করার পর বলল, 'এতে কাজ হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। তবে ঝুঁকিটা আমাদের নিতেই হবে। আর যদি তোমাদের কারও কোনও প্ল্যান থাকে তো বলো।' কেউ কথা বলল না। সবাই জানে, ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা। ধরা পড়া এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার। প্রায় ছয়শো লোকের বিরুদ্ধে ওরা মাত্র চারজন। আর আত্মসমর্পণ করলে যে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মেরে ফেলা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'ভাটার পানি নেমে যাবার আগে ওরা যদি একটা সাবমেরিনও ভাসাতে পারে, এই ডক এক মিনিটও নিজেদের দখলে রাখতে পারব না। সিক্স ইঞ্চ গানের একটা শেল ডকের মুখে লাগুক, ইহজগতে আমাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না। কিন্তু তারা যদি জোয়ারটাকে কাজে লাগাতে না পারে, আমরা অন্তত আরও দশ ঘণ্টা টিকে থাকতে পারব।'

কেউ দ্বিমত পোষণ করছে না।

'যাই ঘটুক না কেন,' আবার বলল রানা। 'যত মূল্যই দিতে হোক, এই বেসের আন্ডারওয়াটার এন্ট্রান্স বন্ধ করে দিতে হবে।' 'সংক্ষেপে ইসরায়েলি নৌ-বাহিনীর প্ল্যানটা ওদেরকে ব্যাখ্যা করল ও—এখন থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইসরায়েলি সাবমেরিন ব্রিটিশ, আমেরিকান ও জাতিসংঘের তিনটে জাহাজ ডুবিয়ে দেবে। তাৎপর্যটাও ব্যাখ্যা করল—ঘটনার জন্যে দায়ী করা হবে ইরাককে, ফলে আলোচনার মাধ্যমে সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার আর কোন সুযোগ থাকবে না, ব্রিটেন আর আমেরিকা ইরাককে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। সবশেষে বলল, 'আমি আন্ডার-ওয়াটার এন্ট্রান্স ব্লক করার কাজটা এখুনি শুরু করতে চাই।'

সবাই ওরা সমর্থন করল প্রস্তাবটা।

রানার মনে পড়ল, প্রত্যেক সাবমেরিনের সঙ্গে কোলাপসিবল রাবার বোট আছে। ইসরায়েলিরা যদি জোয়ারের সুযোগ নাও নিতে পারে, সাত নম্বর ডকের আড়াল থেকে গুলি করে ওদের ডকের প্রবেশমুখ বন্ধ করে দিতে পারবে। কথাটা শুনে সাজিদ প্রস্তাব দিল সাবমেরিনের পিছনে গিয়ে মেশিন-গানের গুলিতে সার্চলাইটটা নিভিয়ে দিয়ে আসবে সে। 'অপেক্ষা করো,' বলল রানা। 'আগে আমরা এই গানটা ফায়ার করি।'

গানটা অপারেট করার দায়িত্ব আহুদকে দিয়ে ইউ-টোয়েনটিওয়ানের ব্রিজে উঠে এল রানা। সাবমেরিনের সার্চলাইট জ্বেলে ঘোরাল, চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পিছন দিকটা, সেই সঙ্গে গোটা মেইন কেভ বা মূল গুহা। সাগরের দিকটায় ছাদ ক্রমশ নিচে নেমে গেছে, এক পর্যায়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে পানির তলায়। ওদিকের পানি কালো, তেল চকচকে একটা ভাব আছে।

'সাইটে কোন ত্রুটি নেই তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কোথাও কোন ত্রুটি নেই, স্যার,' জবাব দিল আহুদ।

ব্রিজের রেইলটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল রানা। 'ফায়ার!'

ট্রিগার কর্ড ধরে টান দিল আহুদ। প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটল। রানার পা দুটো ডেক ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল, রেইলিং ধরে না থাকলে ছিটকে পড়ে যেত। খালি ডকের পাথুরে গায়ে ঘষা খেলো সাবমেরিন। প্রায় একই মুহূর্তে চোখ ধাঁধানো আলো ঝলসে উঠল মেইন কেভের ছাদে, ঠিক যেখানে ছাদটা পানির তলায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারপর বদ্ধ জায়গার ভেতর যে বিস্ফোরণের আওয়াজটা হলো, তার ধাক্কায় সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল রানার। মুখে আঘাত করল গরম বাতাস। সার্চলাইটের আলোয় রানা দেখল গুহার শেষ প্রান্তের পুরো ছাদ সগর্জনে ধসে পড়ছে।

শুধু ছাদ ধসে পড়েনি, রানার চারদিকের পাথর প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়েছে, সেই ঝাঁকির রেশ এখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। বড় আকৃতির কয়েকটা পাথরের টুকরো সাবমেরিনের ডেকেও পড়ল। কম করেও মূল গুহার ত্রিশ গজ

খসে পড়েছে। প্রকাণ্ড আকারের পাথর পানিতে পড়ছে, ফলে বেসিনে বিশাল ঢেউ উঠছে। সাবধান করার জন্যে চেঁচিয়ে উঠল রানা, তবে কেউ শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। পানির দশ ফুট উঁচু একটা পাঁচিল ডেকের দিকে ছুটে আসছে। খালি ডকে উঠে পড়ল তরল পাঁচিলটা, ডকের নাগাল পেয়ে গেল। বাধা পেয়ে ঘোড়া যেমন পিছনে পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়, সাবমেরিনও তাই করল। কনিং টাওয়ারের ব্রিজে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেছে রানা। সাবমেরিন উঁচু হচ্ছে, রেইলটা ছাদে বাড়ি খেলো রানার ঠিক মাথার ওপরে, সেই সঙ্গে নিভে গেল সার্চলাইট। তারপর সাবমেরিনের বো ডকের শেষ মাথার সঙ্গে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলো।

বার কয়েক উঁচু-নিচু হয়ে, ডকসাইটে বারবার ধাক্কা খেয়ে, অবশেষে স্থির হলো সাবমেরিন। এখনও ওটা ভেসে রয়েছে। কানে তালা লেগে আছে, তাসত্ত্বেও ডকের ফ্লাড গেট থেকে সবেগে পানি ঢোকার অস্পষ্ট আওয়াজ পেল রানা। ধীরে ধীরে সিধে হলো ও। চারদিক অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

'স্যার, মি. রানা? আপনি ঠিক আছেন তো?' কামানের দিক থেকে জিজ্ঞেস করল কেউ।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'তুমি?' উত্তরের অপেক্ষায় থাকল না, মই বেয়ে কনিং টাওয়ার থেকে নেমে এল। ওখানেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল। ডকের শেষ প্রান্তে ক্ষীণ আলোর আভা। তারমানে বিস্ফোরণে সব আলো নিভে যায়নি। ওর চারদিকে সব কিছু অন্ধকারে ঢাকা, কিন্তু ডক যেখানে মেইন কেভে বেরিয়েছে সেখানে আলোর একটা অর্ধবৃত্ত। সেই আলোর উল্টোদিকে কামানের গাঢ় কাঠামো আর লোকজনের নড়াচড়া অস্পষ্ট হলেও ধরা পড়ল চোখে। পকেট থেকে টর্চটা বের করে জ্বালল ও। আলোর দিকে চোখ ফেরাতে মাইনারদের মুখ সাদা দেখাল। তবে সবাই ওরা অক্ষত। কামানের পাশে মেশিন-গান, রাইফেল ও অ্যামুনিশনও ঠিকঠাক আছে।

হাতে অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে পিছন দিকে চলে এল ওরা। আফটার হ্যাচের ওপর ফর্জটা আগের জায়গাতেই আছে, এক চুল নড়েনি, তবে পানির তোড়ে প্যাকিং কেসের ব্যারিকেডটা ভেসে গেছে। ডেকে ছোট বড় পাথরের টুকরো ভর্তি। ডকসাইট এখনও অগভীর পানিতে ডোবা, সেখানে প্যাকিং কেসগুলো ভাসছে।

ডেকের খাড়া একটা পোলের সঙ্গে আটকে রয়েছে একটা মেশিন-গান, সেটাকে তুলে আনা হলো। দ্বিতীয়টা পাওয়া গেল না। ম্যাগাজিনগুলো যেখানে ছিল সেখানেই আছে। ডক সাইট থেকে একটা অটোমেটিক রাইফেল উদ্ধার করা হলো। প্যাকিং কেসগুলো পানি থেকে তুলে এনে দ্রুত আবার ব্যারিকেড তৈরি করল ওরা। দুটো গ্যাংওয়েই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, প্যাকিংকেসগুলোকে রশি দিয়ে বেঁধে সাবমেরিনের ঢালু গায় তুলতে হলো।

ম্যাগাজিন রুমে আবার একবার যেতে হলো রানাকে। অক্সিজেন

মাস্কগুলো আগেই দেখে গিয়েছিল, এবার সেগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। ফেস মাস্ক সহ বড় আকৃতির এয়ার ব্যাগ, এয়ার ব্যাগটা স্ট্র্যাপ দিয়ে কোমরে আটকাতে হয়, সঙ্গে আছে ছোট আকৃতির অক্সিজেন সিলিন্ডার।

একটা থলেতে ভরে বেশ কিছু গ্রেনেড নিয়ে সাবমেরিনের ডেকে ফিরে এল রানা। চারদিক আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। ছয় নম্বর ডকের সাবমেরিন থেকে সার্চলাইট জ্বালা হয়েছে। চিৎকার-চেঁচামেচির কারণটা এতক্ষণে ধরতে পারল ও। তেল চকচকে কালো পানিতে, মেইন কেভের কাছে, উঁচু-নিচু হচ্ছে তিনটে কলাপসিবল রাবার বোট, তার মধ্যে দুটো উপুড় হয়ে আছে। রানা বলল, 'ওরা হামলা করতে যাচ্ছিল, এই সময় কামান দাগি আমরা।'

সুলতান বলল, 'স্যার, এখন আমরা এই জায়গা অনেকক্ষণ নিজেদের দখলে রাখতে পারব।'

'কি দেখে বলছ কথাটা?' জানতে চাইল রানা।

'ওরা এখন আর বোট নিয়ে সাবমেরিনের পিছন দিকে আসতে পারবে না। আপনি স্যার ডকের তলায় ঘসটানির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন না?'

সুলতান ঠিকই বলছে। ব্যস্ত থাকায় এতক্ষণ ব্যাপারটা খেয়াল করেনি রানা। ডকে পানি উঠে এলেও, ভাটার টান পড়ায় সাবমেরিনের তলা মেঝেতে ঘষা খাচ্ছে। 'ঈশ্বরকে সেজন্যে ধন্যবাদ!' বলল ও। ইসরায়েলিরা ওদের সুযোগ হারিয়ে ফেলেছে। ওদের জন্যে যেটা সবচেয়ে বড় বিপদ ছিল, সেটা কেটে গেছে। অন্য কোন সাবমেরিন থেকে হামলা আসার আগে হাতে দশ ঘণ্টা সময় পাবে ওরা। ওখানে দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল রানা, যত ভয়াবহ মূর্তি নিয়ে যে-বিপদই হাজির হোক, ওর প্ল্যান যদি ব্যর্থও হয়, অন্য কোন সাবমেরিন ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগে ওরাই ওদের সাবমেরিন নিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। তা-ও যদি সম্ভব না হয়, লড়াই করে মরবে ওরা, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াবে না। যেহেতু ওরা অ্যাকশনে আছে, মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়াটা সহজ বলে মনে হচ্ছে।

হাদীর কথা মনে পড়ল। কি করছে ও? বেঁচে আছে তো?

সুলতানকে নিয়ে ডকসাইটে নেমে এল রানা। পানি এরইমধ্যে নেমে গেছে। দেয়ালের কাছে কোদাল আর শাবল পাওয়া গেল, কাল ডেরিক খাড়া করার সময় কাজে লাগানোর পর সরানো হয়নি। ওগুলো নিয়ে ডকের শেষ প্রান্তে চলে এল ওরা, গ্যালারি যেখানে ব্লক হয়ে আছে। আবর্জনার মাঝখানে একটা জায়গা পরিষ্কার করা হবে। কাজ করার সময় অটোমেটিক রাইফেলগুলো নাগালের মধ্যে থাকল, ডকের খোলা প্রান্ত থেকে আক্রমণ এলে ঠেকাতে হবে।

হাত দিয়ে পাথর সরানো অসম্ভব পরিশ্রমের কাজ। একটা পথ তৈরি করে এগোচ্ছে ওরা, পাথরগুলো তুলে পিছনে ফেলছে। আধ ঘণ্টা পর আবর্জনার ভেতর যে বেসিনটা তৈরি করতে চাইছে রানা সেটা আকৃতি পেতে শুরু করল। কোন বিরতি ছাড়া নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে দু'জন। বারবার ঝুঁকে

লাইমস্টোনের ভারী টুকরো তুলে ছুঁড়ে ফেলতে হচ্ছে, ব্যথায় ভেঙে যেতে চাইছে কোমর। ধসে পড়া পাথরের স্তূপে চড়ে টুকরোগুলো নিজেদের পিছনে ফেলছে, ফলে পিছনে বেসিনের কিনারা ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। ব্যথা তো করছেই, হাতের পেশী কাঁপতে শুরু করল। নাকে-মুখে ধুলো ঢোকায় দু'জনেই কাশছে।

আরও কিছুক্ষণ পর দম নেয়ার জন্যে থামল ওরা। হাতঘড়ি দেখল রানা। তিনটে বেজে কয়েক মিনিট। এই মুহূর্তে ও দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক বৃত্তাকার পাথুরে প্রাচীরের পিছনে। ছাদটা, এবড়োখেবড়ো, ওর মাথা থেকে মাত্র দশ ফুট ওপরে—মোটেও নিরাপদ নয়, যে-কোন মুহূর্তে খসে পড়তে পারে। ওদের তিন দিকে ভাঙা লাইমস্টোনের স্তূপ প্রায় ছাদ ছুঁয়েছে। শুধু ডকগুলোর দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে আছে ধসে পড়া পাথর, সেগুলো স্তূপাকারে সাজিয়ে পাথরের একটা ট্যাঙ্ক তৈরি করছে ওরা। সেটাও ইতিমধ্যে ওদের মাথা সমান উঁচু হয়ে উঠেছে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হলো রানা, পাঁচিলের মাথা ছাড়িয়ে দৃষ্টি চলে গেল ডকের খোলা প্রান্তের দিকে। সার্চলাইট এখনও আলোকিত করে রেখেছে মেইন কেভ, উজ্জ্বল আভায় ডকের ভিজে দেয়ালগুলো চকচক করছে, ওদের সাবমেরিনের কনিং টাওয়ারটাকে গাঢ় একটা ছায়ার মত লাগছে দেখতে।

আবার কাজ শুরু করতে যাবে রানা, দেখল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সুলতান, কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে। পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ, রানাও শুনতে পেল। তারপর কানে এল লোকজনের ফিসফাস। ওদের ডক আর পাঁচ নম্বর ডকের মাঝখানে পাথর ধস যেখানে গ্যালারি ব্লক করে দিয়েছে, তার পিছন থেকে আসছে শব্দগুলো। তারপর স্পষ্ট শোনা গেল পাথরে কোদাল আর শাবলের সংঘর্ষ। 'ওরা পাথর সরিয়ে পথ তৈরি করছে,' ফিসফিস করল সুলতান।

'কতক্ষণ লাগবে?' জানতে চাইল রানা।

ধসে পড়া পাথরগুলোর দিকে তাকাল সুলতান। ওদিকের গোটা গ্যালারির ব্লক হয়ে আছে। 'নির্ভর করে গভীরতার ওপর,' বলল সে। 'এক ঘণ্টার আগে কাজটা শেষ করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'গুড!' বলল রানা। 'তার আগেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর আমরা ওদের আসার অপেক্ষায় থাকব।' আবার ওরা কাজ শুরু করল।

কিন্তু মাত্র দশ মিনিট পরই গর্জে উঠল একটা মেশিন-গান। ডকের খোলা প্রান্তের দিক থেকে এল আওয়াজটা। মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের তৈরি প্রাচীরের মাথায় উঠে এল ওরা, রাইফেল তুলে নিয়ে ডকসাইট ধরে ছুটল যত জোরে পারা যায়।

ভোঁতা একটা বিস্ফোরণ ঘটল, সাবমেরিনের পিছনে খাড়া হলো পানির একটা স্তম্ভ। সাবমেরিনে উঠল ওরা, রানা দেখল প্যাকিং কেস দিয়ে তৈরি ব্যারিকেডের পিছন থেকে খানিকটা উঁচু হলো একটা মাথা, এক মুহূর্ত পর

আরেকটা জোরাল গর্জন শোনা গেল, মেইন কেভের ছাদ থেকে পানিতে খসে পড়ল বেশ কিছু পাথর। সেই মুহূর্তে নিভে গেল সার্চ লাইটটা।

প্যাকিং কেসের পিছনে ডাইভ দিল ওরা, হাতে রাইফেল। 'কি ঘটল?' জানতে চাইল রানা।

'ওরা একটা ভেলা তৈরি করেছিল,' জবাব দিল আহুদ। 'প্যাকিং কেস সাজিয়ে আড়ালও তৈরি করেছিল। শালাদের রাইফেল তো ছিলই, গ্রেনেডও ছুঁড়ছিল। ভেলাটাকে সাজিদ উড়িয়ে দিয়েছে।'

'গুড ওঅর্ক!' প্রশংসা করল রানা। 'সাজিদ, তুমি কি ওদেরকে আরও আধ ঘণ্টা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে?'

সাজিদ কথা বলছে না। মেশিন-গানের পিছনে পড়ে আছে সে। হাত দিয়ে তার মুখ স্পর্শ করল রানা। তাজা রক্তে ভিজে গেল ওর আঙুল। হাত দিয়ে আড়াল করে টর্চ জ্বালল ও। দাড়ি না কামানো শ্যামলা চোয়াল হাঁ হয়ে আছে, জ্যাকেটটা ভিজে গেছে রক্তে। বুলেটটা লেগেছে গলায়।

অসুস্থ বোধ করল রানা। বিদেশী একটা মেয়েকে খনির ভেতর ঢুকতে সাহায্য করতে এসে অকালে প্রাণ হারাল লোকটা। তবে সান্ত্বনা এইটুকু যে খনিতে ঢোকার পর স্বদেশের মাটিতে চরম শত্রু ইসরায়েলিদের হাতে বন্দী হয় সে, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যে লড়াই করার সময় শহীদ হয়েছে।

ওরা চারজন ছিল, হয়ে গেল তিনজন। ভেলাটা উড়িয়ে দেয়ার বিনিময়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে সাজিদ। কিন্তু একের পর এক আরও ভেলা আসবে। 'বেসিনটা আরও তিন ফুট গভীর করা দরকার। কাজটা তুমি একা করতে পারবে, সুলতান? এদিকটা দখলে রাখার জন্যে আহুদের সঙ্গে থাকতে চাই আমি।'

'যাচ্ছি,' সিধে হলো সুলতান।

'কাজ শেষ হলেই চিৎকার করে জানাবে,' বলল রানা, নিজের টর্চটা ধরিয়ে দিল তার হাতে। সাবমেরিনের ডেক ধরে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সুলতান।

এরপর লাশ নিয়ে আহুদ আর রানা পরবর্তী আক্রমণের অপেক্ষায় বসে থাকল। আবার সার্চলাইট জ্বালল ইসরায়েলিরা। একজন রেটিং মেইন কেভের পানিতে নেমে আহত একজন লোককে উদ্ধার করল। দু'জনেই অদৃশ্য হয়ে গেল পাশের ডকে, সেই সঙ্গে নিভে গেল সার্চলাইট। পাঁচ, ছয় আর সাত নম্বর ডকের মুখে আলোর আভা ছিল, সেগুলোও একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওদের নিজেদের ডকের বাম দিকে সব কিছু গাঢ় অন্ধকারে মোড়া। শুধু ডান দিকে এক, দুই আর তিন নম্বর ডকের মুখে এখনও আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। খানিক পর হিব্রু ভাষায় একজন অফিসার চিৎকার করে উঠল। তারপর একে একে ওগুলোও নিভে গেল। সব কিছু কালো পর্দায় ঢাকা পড়ে গেল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, এমন কি সামনের প্যাকিং কেসগুলোও নয়।

'ব্যাটারা অন্ধকারে হামলা চালাবে,' ফিসফিস করল আহুদ।

'কান পেতে থাকো,' বলল রানা।

সময় বয়ে চলেছে অসম্ভব ধীর গতিতে। মাঝে মধ্যে হিব্রু ভাষায় নির্দেশ ভেসে আসছে, পাথরের ওপর বুটের শব্দও শোনা যাচ্ছে। আর পাঁচ নম্বর ডকের ওদিক থেকে খসে পড়া পাথর সাফ করার আওয়াজ।

বিশ মিনিট পার হলো। নতুন ধরনের একটা আওয়াজ ঢুকল কানে। হাতুড়ি দিয়ে ঠোকাঠুকির শব্দ। 'আরেকটা ভেলা বানাচ্ছে,' ফিসফিস করল আহুদ।

এই সময় ওদের নিজেদের ডকের শেষ প্রান্ত থেকে একটা টর্চ জ্বলে উঠেই নিভে গেল, দেখতে পেয়ে রানা বলল, 'সুলতান আমাকে ডাকছে। ফিরতে দেরি করব না।' সাজিদের টর্চটা নিয়ে সাবমেরিনের ডেক ধরে ছুটল ও।

লাফ দিয়ে ডকে নামল রানা। তারপর ছুটল। অয়েল ট্যাঙ্কের কাছে ওর সঙ্গে মিলিত হলো সুলতান। 'স্যার, পাথর সরিয়ে পথ করে নিয়েছে ওরা, আর মাত্র কয়েক ফুট পরিষ্কার করতে পারলেই...'

'ঠিক আছে, এসো, পাম্প করে তেল ঢালি।'

লাইমস্টোনের বেসিনটা যথেষ্ট গভীর হয়েছে কিনা তা আর এখন দেখার সময় নেই হাতে। ট্রলিতে চাপানো অয়েল ট্যাঙ্কটা আবর্জনার স্তূপের কাছে নিয়ে এল ওরা। ক্যানভাস পাইপটা আবর্জনার ওপর দিয়ে ওদের তৈরি প্রাচীরের ওপর তুলল সুলতান, পাইপের খোলা মুখ বেসিনের দিকে ঝুলে থাকল। রানা ছুটে এল ছোট পেট্রল ট্যাঙ্কের কাছে। দুটো ট্যাঙ্কেই হ্যান্ড পাম্প ফিট করা আছে। আড়াল করা টর্চের আলোয় দেখল কালো ক্রুড অয়েল হড়হড় করে বেরিয়ে আসছে, ছড়িয়ে পড়ছে পাথরের ওপর। পাঁচ নম্বর ডকের ওদিক থেকে কথা বলার ও পাথর সরানোর আওয়াজ পাচ্ছে ও। যে-কোন মুহূর্তে বেরিয়ে আসবে ইসরায়েলিরা।

পেট্রল ট্যাঙ্কের কাছে ফিরে এসে পাম্প শুরু করল রানা, অটোমেটিক রাইফেলটা পাশে পড়ে আছে। ট্যাঙ্কটা অর্ধেক খালি করার পর সুলতানকে সাহায্য করার জন্যে এগোল ও। তার সাহায্য দরকার নেই দেখে এদিক ওদিক তাকাল, এক প্রস্থ লোহার পাইপ আর কিছু ন্যাকড়া দেখতে পেয়ে তুলে নিল। পাইপটার মাথায় পেট্রলে ভেজানো ন্যাকড়া জড়িয়ে মশাল বানাল। ইতিমধ্যে ইসরায়েলিদের পাথর সরানোর আওয়াজ আরও জোরাল হয়ে উঠেছে।

সিধে হলো সুলতান। অয়েল ট্যাঙ্ক খালি হয়ে গেছে। প্রাচীর ঘেরা বেসিনে টর্চের আলো ফেলল রানা। তেল ভালভাবেই জমে আছে ওখানে। ঠিক তখনই বিস্ময়সূচক আওয়াজ ঢুকল কানে। ইসরায়েলিরা টর্চের আলো দেখতে পেয়েছে। ইতিমধ্যে পেট্রল ট্যাঙ্কে কাজ শুরু করেছে সুলতান, বেসিনে পেট্রল পড়ার আওয়াজ পাচ্ছে রানা। ইসরায়েলিরা যেখানে বেরিয়ে আসবে সেখানে তাকিয়ে আছে ও, হাতের রাইফেলও সেদিকে তাক করা।

ডেকের খোলা প্রান্ত থেকে মেশিন-গানের এক পশলা গুলি হলো। ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা। আরেকটা হামলা? ওদিকে কোন আলো নেই। আহুদ কি কোন ভুল করে বসেছে? তারপর, অস্পষ্টভাবে, আহুদের গলা ভেসে এল। কার সঙ্গে কথা বলছে সে? মনে হলো পাশের ডকের ইসরায়েলিদের উদ্দেশে কিছু বলছে। 'জলদি!' সুলতানকে তাগাদা দিল ও।

'প্রায় শেষ,' জবাব দিল সুলতান।

তারপর আহুদের কণ্ঠস্বর বদ্ধ জায়গার ভেতর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করল, 'স্যার, মি. রানা! স্যার, মি. রানা!' কি কারণে কে জানে, আতঙ্কিত মনে হলো তাকে।

পকেট থেকে দেশলাই বের করে সুলতানের হাতে গুঁজে দিল রানা। 'কাজ শেষ হলেই মশালটা জ্বালবে, ছুঁড়ে দেবে বেসিনে। যাই ঘটুক না কেন, তার আগে কোনভাবেই যেন ওরা বেরিয়ে আসতে না পারে।'

'মি. রানা, স্যার!' আবার চেঁচাল আহুদ।

সাবমেরিনের ঢালু গা বেয়ে ডেকে উঠে এল রানা। স্টীল প্লেটে ওর পায়ের শব্দ ফাঁপা শোনাচ্ছে। টর্চ নিভিয়ে দিয়ে ছুটছে ও, প্যাকিং কেসের আড়ালে পৌঁছে জানতে চাইল, 'কি হয়েছে?'

'শালারা মিস শারমিন আর হাদীকে জিম্মি করেছে।'

'ওহ্ গড!'

'বলছে, দু'জনকে বেঁধে মেশিন-গানারের শীল্ড হিসেবে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এখন যদি আমরা সারেন্ডার না করি, ওরা আক্রমণ করবে। আপনার সঙ্গে পরামর্শের কথা বলে ব্যাটাদের আমি অপেক্ষা করতে বলেছি।'

এই সময় পাশের ডকের সাবমেরিন থেকে সার্চলাইট জ্বলে উঠল। এতক্ষণে ব্যাপারটা উপলব্ধি করল রানা। পাঁচ নম্বর ডকের মুখ থেকে খানিক সামনে একটা ভেলা ভাসছে, তাতে হাঁটু গাড়া অবস্থায় পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে শারমিন আর হাদীকে, পাশাপাশি। দু'জনের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আছে একটা সাবমেশিন-গানের র‍্যারেল। শারমিন আর হাদীকে আঘাত না করে ওদের পক্ষে গুলি করা সম্ভব নয়। রানা দেখল, বাঁধন খোলার চেষ্টায় আড়ষ্ট হয়ে আছে হাদীর প্রকাণ্ড শরীর। চওড়া কপাল চকচক করছে ঘামে। শারমিনকে সুস্থ ও সতেজ লাগছে, তবে যে ভঙ্গিতে বেঁধে রাখা হয়েছে, খুব কষ্ট পাচ্ছে সে। ভেলাটা ধীরগতিতে ভেসে আসছে ওদের দিকে। রানা আন্দাজ করল, ওটার পিছনে সাঁতার কাটছে অন্তত দু'জন রেটিং।

'তোমরা কি সারেন্ডার করবে?' কমোডর আয়ান পেরেজের গলা চিনতে পারল রানা। 'নাকি বন্ধুদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে?'

'কি শর্তে?' সময় পাবার জন্যে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কোন শর্ত নেই,' তীক্ষ্ণ, কঠিন জবাব এল।

'স্যার, স্যার, বোকামি করবেন না!' চিৎকার করছে হাদী। 'এরা আপনাকে গুলি করবে।' তার পিছনে একটা হাত উঁচু হতে দেখল রানা। হঠাৎ ঝাঁকি খেলো হাদী। বেয়োনেট দিয়ে খোঁচা মারা হয়েছে তাকে।

'মাসুদ ভাই, আপনাদের কাজ আপনারা করুন,' শারমিনের গলা ভেসে এল। 'আমাদের কথা চিন্তা করতে হবে না। এরা এমনিতেও গুলি করবে আমাদের।'

আর ঠিক তখনি রানার পিছনের ডকে একটা গুলি হলো।

নয়

ঝট করে ঘুরে তাকাতেই দূরে সুলতানের কাঠামোটা টলতে দেখতে পেল রানা, হাতে ধরা মশালটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। মশালের আলোয় বেশিনের মাথায় একজন ইসরায়েলিকেও দেখা যাচ্ছে। তারপর সুলতানের হাত সচল হয়ে উঠল, মশালটা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে উড়ে যাচ্ছে। পাথুরে বেসিনে পড়ল সেটা। দুপ করে রোমহর্ষক একটা শব্দ হলো, ক্রুড অয়েলের ওপরে জমে থাকা পেট্রলে আগুন ধরতেই আলোকিত হয়ে উঠল গোটা ডক। তারপর চোখের পলকে ডকের পুরো শেষ প্রান্তটা জ্বলে উঠল। বেসিনের মাথায় উঠে আসা ইসরায়েলির কি পরিণতি হলো বোঝা গেল না। সম্ভবত আকস্মিক আঁচেই পুড়ে গেছে সে। পাঁচ নম্বর ডকের পাথর ধ্বস সরিয়ে পথ বের করা হয়েছে, ফলে ওদিক থেকে বাতাস আসছে, সেই বাতাস আগুনটাকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সহায়তা করল। তীব্র বাতাসের বিকট গর্জনের মত শোনাচ্ছে অগ্নিশিখার আওয়াজ। তার গোলাপী আলোয় ডকটসাইট ধরে সুলতানকে টলতে টলতে এগিয়ে আসতে দেখল রানা, ডকের দেয়ালে তার ছায়া পড়েছে।

হঠাৎ ভেলা থেকে মেশিন-গান গর্জে উঠল। রানার নির্দেশে প্যাকিং কেসের আড়াল থেকে বেরিয়ে সাবমেরিনের ডেক ধরে চোঁ-চোঁ দৌড় দিল আহুদ। নিজেদের মেশিন-গান থেকে ফায়ার ওপেন করল রানা। ভেলার পাশে লক্ষ্যস্থির করল ও, শারমিন আর হাদীর কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে। ভেলার কোন ক্ষতি করা ওর উদ্দেশ্য নয়, গানারের মনোযোগ সাবমেরিনের দিকে ধরে রাখতে চায়, সুলতান যাতে নিরাপদে ডকে পৌঁছুতে পারে।

আহুদ সাবমেরিন থেকে নেমে যেতেই ব্যারিকেডের আড়াল থেকে বেরিয়ে ডেক ধরে ছুটল রানা, কনিং টাওয়ারে পৌঁছতে হবে ওকে। আগুনের আভায় এদিকটাও আলোকিত হয়ে আছে, ভেলা থেকে ওকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে গানার। ও যে এভাবে ছুটবে, সেজন্যে গানার যেন তৈরিই ছিল। আড়াল থেকে বেরুতেই পিছনে গর্জে উঠল মেশিন-গান। ঝাঁক-ঝাঁক বুলেট, কেন যে একটাও লাগছে না, একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারবেন। তারপর বাঁ হাতে একটা ঝাঁকি খেলো রানা, তীক্ষ্ণ ব্যথাটাও সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল। তবে থামেনি রানা, এক ছুটেই কনিং টাওয়ারের আড়ালে পৌঁছে গেল।

ইতিমধ্যে সাবমেরিনের ডেকে উঠে পড়েছে সুলতান, তবে ডান হাতটা

নাড়তে পারছে না। আগুনের আভায় যন্ত্রণায় কাতর মুখ বিকৃত হয়ে আছে। ডেকে উঠতে তাকে সাহায্য করেছে আহুদ। 'ভেতরে ঢোকো!' নির্দেশ দিল রানা। মই বেয়ে ব্রিজে উঠে যাচ্ছে আহুদ, পিছু নিল সুলতান। রানাও উঠছে, কিন্তু মইয়ের রেইল মুঠোর ভেতর ধরতেই অকস্মাৎ ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ওর বাঁ হাত কব্জির ঠিক ওপরে ভেঙে গেছে, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে।

কনিং টাওয়ারের ব্রিজে উঠে এসে দ্রুত একবার চারদিকে চোখ বুলাল রানা। ভেলার এক কোণ দেখা যাচ্ছে, ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে ডকের শেষ প্রান্তে। আরেক প্রান্তে ওদের জ্বালা আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। কনিং টাওয়ারের হ্যাচ দিয়ে নিচে নামল রানা, ঢাকনিটা বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে।

নিচে নেমে কন্ট্রোল রুমে চলে এল রানা, আহুদ এখানে সুলতানের ডান হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। ছুটল রানা, পিছন দিকের স্টোর-রুম বাল্কহেডের সামনে চলে এল। টেনে সেটাকে পিছিয়ে আনল ও। বন্দী ইসরায়েলিরা প্যাকিং কেসের ওপর বসে আছে। ওর হাতে রিভলবার, ধমক দিয়ে সবাইকে এঞ্জিন রুমে ঢোকাল, তারপর বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল হ্যাচটা। ওখান থেকে স্টোর-রুমে চলে এল। মই বেয়ে হ্যাচের দিকে উঠছে, ওর মাথার ওপর ডেক থেকে সন্তর্পণে হাঁটাহাঁটির অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেল। সাবমেরিনের ওপর পৌঁছে গেছে ইসরায়েলিরা। হ্যাচটা নাগালের মধ্যে আসতেই ভেতর থেকে আটকাবার ব্যবস্থা করল ও। আর একটা হ্যাচ ভেতর থেকে আটকানো বাকি আছে, যে হ্যাচ দিয়ে অ্যামুনিশন নিচে নামানো হয়েছিল। সাবমেরিনের সামনের দিকে হেঁটে এসে সেটাও আটকাল রানা। ফেরার সময় আচ্ছন্ন বোধ করল ও, পিছনে রক্তের একটা ধারা ফেলে আসছে।

কন্ট্রোল রুমে ফিরে এসে দেখল জ্যাকেটটা আবার পরছে সুলতান। 'এখন ভাল তো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'স্যার! আপনার হাত!' ওর দিকে তাকিয়েই আঁতকে উঠল আহুদ।

'হ্যাঁ, কব্জির ওপরটা ভেঙে গেছে,' বলল রানা। 'দেখো কিছু করতে পারো কিনা।'

রানার ইউনিফর্মের আস্তিন গুটিয়ে ওপরে তুলল আহুদ, নিজের শার্ট ছিঁড়ে কনুইয়ের ওপরটা শক্ত করে বেঁধে দিল। 'একটা স্প্লিন্টও দরকার,' বলে একটা চার্ট রুলার ভেঙে অর্ধেক করল। পরবর্তী পাঁচটা মিনিট খুব ভুগতে হলো রানাকে। বুলেটটা হাড়গুলোকে নিজস্ব জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়ে গেছে, সেগুলো আবার জোড়াতালি দিয়ে জায়গামত বসাতে হচ্ছে আহুদকে। 'স্যার, আপনার ভাগ্য ভাল যে আপনি মাইনারদের সঙ্গে আছেন,' কব্জির ওপর রুলারটা বসিয়ে আরেকটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল সে। 'সবাই ভাঙা হাড় জায়গা মত বসাতে পারে না।'

কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানাল রানা। পা দুটো টলমল করছে দেখে চার্ট টেবিলে বসে পড়ল।

'এখন কি হবে, স্যার?' জানতে চাইল আহুদ।

'অপেক্ষা করব। অপেক্ষা করব আর প্রার্থনা করব—লাইমস্টোনে আগুনটা ভালভাবে ধরার আগে কেউ যাতে সাবমেরিনের ভেতর ঢুকতে না পারে।'

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। মাথার ওপর থেকে হাঁটাহাঁটির আওয়াজ ভেসে আসছে। ইসরায়েলিরা যে হতভম্ব হয়ে পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কি ভাবছে তারা? একবার দেখেছে ডক দখলে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে ওরা, তারপর দেখেছে হঠাৎ বড় একটা আগুন জ্বালিয়ে সাবমেরিনের ভেতর লুকিয়ে পড়েছে। কল্পনার চোখে রানা দেখতে পেল, পাঁচ নম্বর ডক আর সাবমেরিনের মাঝখান বারবার আসা-যাওয়া করছে ভেলাটা, প্রতিবার নতুন নতুন লোক বয়ে আনছে। আগুনটাকে নিয়ে কি করবে তারা? নেভাবার চেষ্টা করবে? ওদের ডকে যদি ফায়ার-ফাইটিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে আসতেও পারে, এখন আর ওই আগুন নিভিয়ে ফেলা সম্ভব বলে মনে হয় না।

সাবমেরিন অসম্ভব গরম হয়ে উঠছে। ওদের জ্বালানো আগুনই দায়ী। রানা কল্পনা করল, সাবমেরিনের বো প্লেট আগুনের তীব্র আঁচে লালচে হয়ে উঠছে। ওরা যদি সাবমেরিনের ভেতর বেশিক্ষণ থাকতে বাধ্য হয়, এটাই হয়ে উঠবে মৃত্যু-ফাঁদ— জ্বলন্ত একটা তন্দুর।

অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের কি ব্যবস্থা আছে সাবমেরিনে, দেখার জন্যে রানার পিছু নিয়ে কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। মাথার ওপর ইসরায়েলিরা ছুটোছুটি করছে। সাবমেরিনের ভেতর বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। ডেক থেকে আসা সমস্ত শব্দ ভোঁতা আর ফাঁপা শোনাচ্ছে ওদের কানে। গুমোট ভাবটা এত দ্রুত বাড়ছে কেন? ভেতরের সব অক্সিজেন এরই মধ্যে তো খরচ হয়ে যাবার কথা নয়। রানা ধরে নিল আগুন ধরা লাইমস্টোন কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ছে বাতাসে, সেই বাতাস ফাঁক-ফোকর দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। হ্যাচগুলো পুরোপুরি এয়ারটাইট হয়ে ওঠে শুধু যখন বাইরে থেকে পানির চাপ লাগে।

আহুদকে অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের সুইচ অন করতে বলে গ্যাংওয়ে ধরে ম্যাগাজিন রুমে চলে এল রানা। মোট পাঁচটা অক্সিজেন মাস্ক বাছাই করল ও, সিলিন্ডারগুলো পরীক্ষা করে দেখে নিল অক্সিজেন আছে কিনা। আহুদ আর সুলতানের কাছে ফিরে এল ও, এসেই শুনতে পেল কনিং টাওয়ারের দিকে হিসহিস একটা আওয়াজ হচ্ছে। কন্ট্রোল রুমে চলে এল ওরা। এখানে আওয়াজটা আরও জোরাল; আসছে হ্যাচ থেকে। 'আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে—,' চিন্তিত দেখাল আহুদকে, '—অক্সি-অ্যাসেটিলিন কাটার।'

'ঠিক ধরেছ,' বলল রানা। 'আগন্তুকদের কচুকাটা করার জন্যে তৈরি থাকো।'

কনিং টাওয়ারের হ্যাচের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, ধাতব ঢাকনি এক জায়গায় লালচে হয়ে উঠতে দেখল। আধো অন্ধকারে প্রথমে জ্বলন্ত

সিগারেটের মত লাগল দেখতে, তারপর ধীরে ধীরে চওড়া আর সাদাটে হয়ে উঠছে। কিছুক্ষণ পরই তরল লোহা ওদের পায়ের সামনে ঝরে পড়তে শুরু করল, তারপর দেখা গেল কাটারের শিখা।

কাটার আর কার্বনডাই অক্সাইডের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। রানার মাথায় নানা প্রশ্ন। আগুনটা কি নিভিয়ে ফেলা হয়েছে? না, নিভিয়ে ফেলা হলে সাবমেরিন এত গরম হয়ে উঠত না।

হ্যাচের বড় একটা অংশ লালচে হয়ে উঠেছে। সাদাটে রেখাটা একটা বৃত্ত তৈরি করছে। কাটারের শব্দ এখন খুব বেশি। কাটার থেকে বেরিয়ে আসা শিখাটা যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে রানাকে, চোখ ফেরাতে পারছে না।

'কি করব আমরা? লড়ব, নাকি সারেন্ডার করব?' জানতে চাইল সুলতান।

রানা মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করতে পারছে না। ওর কি কোথাও ভুল হয়েছে? লাইমস্টোন থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরুচ্ছে না? তারপর হঠাৎ দেখল কাটারের শিখা নড়ছে না। 'কাটার নড়ছে না!' ফিসফিস করল ও। মুখ তুলে তাকিয়ে থাকল সবাই। কাটার যেখানে হ্যাচ কাটছিল, ওখানের সাদাটে ভাবটুকু ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। হ্যাচের অনেকটা জায়গা লালচে হয়ে উঠেছিল, তা-ও আবার কালো হতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে অক্সি-অ্যাসেটিলিন ব্লোয়ার থেমে গেল।

'আল্লাকে ধন্যবাদ!' হাঁফ ছাড়ল রানা। 'শোনো!' কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। সাবমেরিনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে এল ও। ওপরের ডেক থেকে কোন আওয়াজ আসছে না। কন্ট্রোল রুমে ফিরে এসে আহুদকে বলল, 'তুমি আর আমি বাইরে বেরুব, শারমিন আর হাদীকে নিয়ে আসতে হবে।'

অক্সিজেন মাস্ক পরে নিল ওরা। হাতে দস্তানা পরে হ্যাচটা খুলল আহুদ। সঙ্গে এক জোড়া অতিরিক্ত অক্সিজেন মাস্ক নিয়েছে রানা। মই বেয়ে কনিং টাওয়ারের মাথায় উঠে এল ওরা। আগুনটা এখনও গর্জন করছে, ডেকের পাথুরে দেয়াল চাটছে টকটকে লাল শিখাগুলো। হ্যাচের ঢাকনি তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল ওরা, তা না হলে ভেতরের বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠবে। ঢাকনি বন্ধ করার সময় অ্যাসেটিলিন কাটারের শরীরটা চিৎ হয়ে গেল। দৃশ্যটা বীভৎস। ব্লোয়ার থেকে বেরিয়ে আসা শিখায় মুখ থুবড়ে পড়েছিল লোকটা, মুখটা এমন পুড়ে গেছে যে চেনার কোন উপায় নেই।

অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখা গেল সাবমেরিনের ডেকে। কম করেও বিশজন ইসরায়েলি অচেতন হয়ে পড়ে আছে। সবাই জ্ঞান হারিয়েছে, নাকি কেউ কেউ মারাও গেছে? পরীক্ষা করার সময় নেই, ছুটে সাবমেরিনের পিছন দিকে চলে এল ওরা। এদিকে দুটো কলাপসিবল রাবার বোট বাঁধা রয়েছে। তার একটায় একজন ইসরায়েলি বৈঠা হাতে বসে আছে। অসুস্থ সে, তবে পুরোপুরি অচেতন নয়। তবে দ্বিতীয় বোটটায় ওরা যখন উঠছে, লোকটা কাত হয়ে পড়ে গেল।

বোটের রশি খুলল রানা, আহুদের হাতে বৈঠা। পাঁচ নম্বর ডকে চলে এল ওরা। এদিকের দৃশ্য আরও বিস্ময়কর। গোটা ডকে ইসরায়েলি নাবিকরা ছড়িয়ে আছে। আহুদ বৈঠা চালাচ্ছে ঠিকই, তবে হতবিহ্বল ও আতঙ্কিত দেখাচ্ছে তাকে।

পাঁচ নম্বর ডকের ফ্লাড গেটে বোট ভিড়াল ওরা। ডকসাইটে নামল আহুদ। রানা বোটে বসে থাকল। কিছুক্ষণ পরই আহুদকে ফিরতে দেখা গেল, অচেতন হাদীকে টেনে নিয়ে আসছে। ভারী শরীরটা বোটে তুলতে তাকে সাহায্য করল রানা।

শারমিনকে আনা হলো কাঁধে তুলে। তিন মিনিটও পার হয়নি, চার নম্বর ডকে ফিরে আসছে ওরা। আহুদ বৈঠা চালাচ্ছে, রানা অক্সিজেন মাস্ক পরাল শারমিন আর হাদীকে। তারপর এক হাতে ওদের বাঁধনগুলো খুলে দিল। নাকের সামনে নির্ভেজাল অক্সিজেন পেয়েই জ্ঞান ফিরে পেতে শুরু করল হাদী। পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথমেই সে মুখ থেকে অক্সিজেন মাস্কটা খুলে ফেলতে চেষ্টা করল। বাধ্য হয়ে পা দিয়ে তার হাত চেপে ধরতে হলো রানাকে।

ওদের নিজেদের ডকে ভিড়ল বোট। ইতিমধ্যে বোটের মেঝেতে উঠে বসেছে হাদী, একার চেষ্টাতেই সাবমেরিনে উঠতে পারবে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে শারমিনও নড়াচড়া করছে। তাকে অবশ্য কাঁধে করেই সাবমেরিনের ডেকে তুলতে হলো।

সাবমেরিনের ভেতরে নেমে নিজের অক্সিজেন মাস্ক খুলে বাকি সবাইকেও খুলে ফেলতে বলল রানা। কনিং টাওয়ারের হ্যাচে যে বৃত্তাকার সরু ফাঁক তৈরি হয়েছে, সুলতান সেটা টেপ দিয়ে বন্ধ করে দিল। তবে সাবমেরিনের ভেতর এত গরম যে এখানে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। সুলতান কোত্থেকে একটা ব্র্যান্ডির বোতলও যোগাড় করে আনল।

এক ঢোক ব্র্যান্ডি খাওয়ার পর আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠল শারমিন, জানতে চাইল, 'আমি কোথায়?' রানা সব কথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাসল সে, তারপর বলল, 'এখান থেকে কোনদিন যদি বেরুতে পারি, সবাইকে তাহলে বলতে পারব মাসুদ রানা স্বয়ং আমাকে বাঁচিয়েছেন।'

'কিন্তু উল্টোটাই বরং বেশি সত্যি,' বলল রানা। 'তোমরা খনিতে না ঢুকলে আমরা জানতেই পারতাম না যে ঘাঁটি থেকে বেরুবার আরও একটা পথ আছে।'

হাদী হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'সাজিদ কোথায়?'

'সে মারা গেছে,' বলল রানা।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।

ইতিমধ্যে সবাই প্রায় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে, কাজেই রানা বলল, 'এবার ঘাঁটির পিছন দিক দিয়ে কেটে পড়ার আয়োজন করতে হয়।' সবাই আবার অক্সিজেন মাস্ক পরে নিল। প্রত্যেককে একটা করে স্পেয়ার নিতে

বলল রানা। সাবমেরিনের একটা অক্সিজেন সিলিন্ডারও সঙ্গে রাখা হলো, যদি কাজে লাগে। রানার নির্দেশে এঞ্জিন-রুমের দিকে চলে গেল সুলতান, হ্যাচের বোল্ট খুলে রেখে আসবে সে, ঢাকনির ওপর শুধু একটা প্যাকিং কেস চাপাবে। ওখানে যাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে, রানা চায় না গরমে মারা পড়ুক তারা।

পাঁচ নম্বর ডকে বোট ভিড়িয়ে ডকসাইটে নামল ওরা। ভৌতিক পরিবেশ, গা ছম ছম করে উঠল। চারদিকে মানুষ পড়ে আছে, একজনও নড়ছে না। কয়েকজনকে পরীক্ষা করল রানা, একজনও মারা যায়নি। ডকের শেষ প্রান্তে একটা মোবাইল ড্রিল পাওয়া গেল, গ্যালারির পাথর ধস সরিয়ে ওদের ডকে ঢোকার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। আরও এক জোড়া অক্সিজেন সিলিন্ডার, কয়েকটা শাবল আর কোদাল পাওয়া গেল। ড্রিলের ওপর তোলা হলো সব। ছয় আর সাত নম্বর ডককে পাশ কাটিয়ে আপার গ্যালারিতে চলে এল ওরা। র‍্যাম্প আর গ্যালারি দুটোয় অচেতন লোকের সংখ্যা এত বেশি, এগোবার পথ নেই। কোথাও কোথাও স্তূপ হয়ে আছে মানুষ, সরিয়ে পথ করে নিতে হলো।

অবশেষে গার্ড-রুম আর সেলগুলোর কাছে পৌঁছুল ওরা। হাদী আর সুলতান সামনে থাকল, রাইফেল বাগিয়ে ধরে দরজা খুলল তারা। কিন্তু ভেতরে কেউ নেই, গার্ড-রুম খালি। সুলতান সরাসরি এগোল, থামল রাইফেল র‍্যাকের সামনে। র‍্যাকটা ধরে ঠেলতেই সিমেন্ট করা পাঁচিলের পুরো একটা অংশ সরে গেল একপাশে, নিচে রোলার লাগানো আছে। দেয়াল না থাকায় সামনে দেখা যাচ্ছে কালো একটা গহ্বর।

ইতস্তত করছে ওরা, পরস্পরের দিকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে। ওরা কি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে খনির ভেতর ঢুকবে? এ-কথা জানা সত্ত্বেও যে শারমিন আর মাইনাররা ধরা পড়ার পর ইসরায়েলিরা খনির কয়েকটা টানেল বিস্ফোরণের সাহায্যে ধসিয়ে দিয়েছে? খনির ভেতর ঢুকলেই শুধু হবে না, ঢোকার পর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গার্ড-রুম ধসিয়ে দিতে হবে, তা না হলে জ্ঞান ফিরে পাবার পর পিছু নেবে ইসরায়েলিরা।

'আমি শুনেছি সাগরের দিকে এক ধরনের লুকআউট আছে…,' মাস্কের ভেতর থেকে ভোঁতা শোনাল শারমিনের গলা।

'তা আছে,' বলল রানা, 'কিন্তু সেটা পেরিস্কোপ টাইপের একটা ব্যাপার—পাথর থেকে বেরিয়ে আছে স্রেফ একটা পাইপ। ওদিক থেকে সাগরে বেরুবার কোন উপায় নেই।'

'ভেন্টিলেশন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'তুমি কি বলো, হাদী?'

'খনিই একমাত্র পথ,' জবাব দিল হাদী।

'আমিও তাই বলি,' সায় দিল রানা। 'প্রথমে খাবার আর পানি দরকার। আর দরজাটা সব সময় বন্ধ রাখো, খনির বাতাস দূষিত হতে দেয়া যাবে না।'

রোলার লাগানো দেয়াল ফিরিয়ে আনা হলো আগের জায়গায়। আহুদ আর সুলতান এখানে পাহারায় থাকল। শারমিন আর হাদীকে নিয়ে খাবার

আর পানি আনতে বেরুল রানা। কাছাকাছি কিচেনে দু'জন কুককে পড়ে থাকতে দেখা গেল। একজন টেবিল থেকে অর্ধেক ঝুলছে, আরেকজন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে স্টোভের ওপর। তেল শেষ হয়ে যাওয়ায় স্টোভটা নিভে গেছে, তবে লোকটার মুখ পোড়াবার পর। বড় একটা প্যাকিং কেসে পাঁচজনের এক হপ্তা চলার মত খাবার আর পানির বোতল ভরল ওরা, কেসটা টেনে এনে গার্ড-রুমের সামনে ড্রিল ট্রলিতে তুলল। সবাইকে টর্চ, গ্রেনেড, অটোমেটিক রাইফেল ও স্পেয়ার ম্যাগাজিন নিতে বলল রানা। প্রস্তুতি নেয়া শেষ হতে খনিতে ঢুকল সবাই।

ভেজা স্যাঁতসেঁতে টানেলটা অন্ধকার, ভেতরে পা রাখতেই গা ছম-ছম করে উঠল। রানার মনে হলো নিজেদের কবরে পা রাখল, কারণ জানে পাথর ধস পেরিয়ে খনি থেকে বেরুনো প্রায় অসম্ভবই। ওদের পিছনে গার্ড-রুমের রোলার লাগানো দেয়াল জায়গা মত বসিয়েই অক্সিজেন মাস্ক খুলে ফেলল ওরা। খনির ভেতরটা গরম ও গুমোট। টর্চের আলোয় পথ দেখে গ্যালারি ধরে এগোল ওরা, উঁচু-নিচু মেঝেতে ঝাঁকি খাচ্ছে ড্রিল ট্রলি। মাত্র দুশো গজ এগোবার পরই প্রথম পাথর ধসের সামনে পড়ল ওরা। এই ধসের পাথর সরিয়েই ভেতরে ঢুকেছিল শারমিন আর তার সঙ্গীরা। হাত তুলে কিছু একটা দেখাল সে। এক প্রস্থ তার, বড় আকৃতির পাথরের একটা স্তূপের দিকে চলে গেছে। বোঝাই যায়, এই তারে টান পড়াতেই ঘাঁটির ভেতর ইমার্জেন্সী অ্যালার্ম বেজে উঠেছিল। পাথর ধসের ভেতর যে ফাঁকটা ওরা তৈরি করেছিল সেটা এত ছোট যে ট্রলিটাকে ঢোকানো সম্ভব নয়। ফাঁকটাকে চওড়া করা হবে কিনা, এই নিয়ে তর্ক করল ওরা। রানা বলল, পাথর সরাতে হলে সময় নষ্ট হবে, তারচেয়ে ড্রিলটাকে ছেড়ে যাওয়াই ভাল। পরে দরকার হলে ফিরে এসে নিয়ে যাওয়া যাবে। ট্রলিতে যে-সব জিনিস-পত্র তোলা হয়েছিল, সব নামিয়ে সরু ফাঁক দিয়ে পার করা হলো। কাজটা শেষ হবার পর রানা দেখল ওর হাতের ক্ষতটা থেকে নতুন করে রক্ত বেরুচ্ছে।

পাথর ধসের ওপারে সবাই পৌঁছানোর পর আহ্‌দকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'গার্ড-রুমটা উড়িয়ে দিয়ে টানেলের মুখ বন্ধ করা দরকার। তুমি যাবে, নাকি আমি? কয়েকটা গ্রেনেড ছুঁড়লেই কাজ হবে।'

'আমিই যাব,' বলল সুলতান।

'কিন্তু সাবধান, গ্রেনেড ছুঁড়েই নিরাপদ দূরত্বে সরে আসতে হবে। আর রোলার লাগানো দেয়ালটা যতটা সম্ভব কম খুলবে। গার্ডরুমে যতক্ষণ থাকবে, দম আটকে রেখো।'

পাথর ধসের সরু ফাঁক গলে অদৃশ্য হয়ে গেল সুলতান। ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল তার পায়ের আওয়াজ। তারপর অস্পষ্টভাবে রোলার সচল হবার শব্দ ভেসে এল। খানিক পর সুলতানের ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ ঢুকল কানে। ফিরে আসছে সে। পেশী শক্ত করল ওরা, বিস্ফোরণ ঘটবে।

আওয়াজটা এল কয়েক সেকেন্ড পর। গোটা গ্যালারি, আশপাশে

সবগুলো দেয়াল থরথর করে কেঁপে উঠল। বিস্ফোরণ একটা নয়, প্রায় একই সঙ্গে কয়েকটা ঘটেছে। বিস্ফোরণের গর্জন আর বিরতিহীন পাথর খসে পড়ার বিকট আওয়াজ খনির ভেতর প্রতিধ্বনি তুলছে। গ্যালারির ছাদ থেকেও পাথর খসে পড়ছে ওদের চারপাশে। ওদের সামনে পাথরের স্তূপটা মোচড় খাচ্ছে।

ধীরে ধীরে নিস্তব্ধতা নেমে এল। কান পেতে আছে ওরা। কোন শব্দ নেই। ওরা ডাকল, কিন্তু সুলতান সাড়া দিচ্ছে না। 'আমি ওকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি,' বলল হাদী।

'না, আমি যাব,' বলল রানা। সুলতান যদি মারা গিয়ে থাকে, সেজন্যে ও-ই দায়ী হবে।

কিন্তু রানার আগে হাদী রওনা হয়ে গেল। সরু ফাঁকটা আরও সরু হয়ে গেছে, সেগুলো সরিয়ে পথ করে নিতে হচ্ছে তাকে। আবার ওরা অপেক্ষা করছে।

দুই কি তিন মিনিট পার হলো। হাদীর ফিরে আসার আওয়াজ পেল ওরা। 'সব ঠিক আছে,' পাথর ধসের ওপার থেকে বলল সে। 'সুলতানের মাথায় ছোট একটা পাথর লেগেছে।'

পরম স্বস্তিবোধ করল রানা। একটু পর সুলতানকেও দেখা গেল সরু ফাঁকের ভেতর। কপালের এক পাশে, ওপর দিকে, খুলি ফেটে গেছে, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে। 'বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পড়ি আমি,' বলল সে। 'কোত্থেকে ছুটে এসে একটা পাথর লাগল মাথায়।'

'আরও একটু এগিয়ে সুলতানের কাজটা দেখে এসেছি আমি,' বলল হাদী। 'গার্ড-রুম বলে কিছু নেই। টানেলটাও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে।'

রানার মনে হলো, নিজেদের নৌকা পুড়িয়ে দিয়েছে ওরা। সম্ভবত সবারই এই একই অনুভূতি হলো। এখন আর পিছু হটার কোন পথ নেই। সামনে যত বড় পাথর ধসই থাক, সেটাকে ওদের পেরুতে হবে।

ভাগাভাগি করে যে যতটা পারে বহন করছে বোঝাগুলো, গ্যালারি ধরে এগোচ্ছে ওরা। মেঝেটা ক্রমশ ওপর দিকে উঠছে, সেই সঙ্গে ঘুরে যাচ্ছে বাঁ দিকে। এদিক-সেদিক পুরানো ও ভাঙা রেললাইনের চিহ্ন দেখা গেল। গ্যালারি হঠাৎ চওড়া হতে শুরু করল। মেইন গ্যালারি তিনটে শাখার একটা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সামনে রয়েছে হাদী, ঘাড় ফিরিয়ে আহুদের দিকে তাকাল। 'মেইন গ্যালারি,' বলল সে। 'বাকি শাখাগুলো পাথর ধসিয়ে অনেক আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পাথর সরিয়ে পথ যদি করাও যায়, দেখা যাবে সাবমেরিনগুলোর কাছে ফিরে গেছি।'

মেইন গ্যালারি ধরে এগোচ্ছে ওরা। কিন্তু একশো গজও এগোয়নি, দেখা গেল পাথরের স্তূপ পথরোধ করে খাড়া হয়ে আছে। 'ডিনামাইট ফাটিয়ে কাল এই ধস নামানো হয়েছে,' বলল আহুদ।

'এখন কি হবে?' ফিসফিস করল শারমিন।

'আগে জানতে হবে স্তূপটা কতটুকু গভীর,' বলল সুলতান।

বোঝা নামিয়ে রেখে তখুনি কাজ শুরু করল ওরা। শারমিন জেদ ধরল

রানা আর সুলতানকে বিশ্রাম নিতে হবে। কিন্তু সময়ের মূল্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন রানা, এক হাতে যতটুকু পারা যায় সাহায্য করছে ওদেরকে। সুলতানও বসে থাকল না।

পাথরের তলায় শাবল ঢুকিয়ে চাড় দিল আহুদ, বাকি সবাই খালি হাতে আলগা পাথর সরাচ্ছে। কাজটা যখন ওরা শুরু করল তখন চারটে বাজে। কিন্তু তারপর ওদের কাছে সময়ের আর কোন তাৎপর্য থাকল না। ধুলো, পাথর তোলার কষ্ট, হাঁপানোর আওয়াজ, চুল থেকে পিঠ বেয়ে নেমে আসা ঘামের সুড়সুড়ি, ছোটখাট আঘাত পেয়ে ব্যথায় গুঙিয়ে ওঠা ইত্যাদির মধ্যে সময় সম্পর্কে কারুরই কোন খেয়াল থাকল না।

সময় অবশ্য বয়েই চলেছে। ঘড়ির কাঁটাতে এক সময় রাত হলো। যে যেখানে কাজ করছিল সেখানেই নেতিয়ে পড়ল, নড়াচড়ার শক্তিও যেন অবশিষ্ট নেই। আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়ার পর বিড়বিড় করল শারমিন, 'মাসুদ ভাই, আপনারা কিছু খাবেন না?'

সামান্য কিছু মুখে দিয়ে আবার শুরু হলো পাথর সরিয়ে পথ বের করার অমানুষিক পরিশ্রম। তবে সবাই একসঙ্গে নয়, পালা করে কাজ করার নির্দেশ দিল রানা।

তারপর রাত গভীর হলো। বেশ খানিকটা পথ তৈরি করেছে ওরা, কিন্তু এই ধস কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে সে-সম্পর্কে কারও কোন ধারণা নেই। রাত বারোটার পর দ্বিতীয় পালায় কাজ করতে এসে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো রানার। শুধু পরিশ্রমে নয়, রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছে ও। তবে কোন অভিযোগ করছে না বা কাউকে কিছু বুঝতে দিচ্ছে না।

রাত তখন কত কেউ বলতে পারবে না। কারও খেয়ালই নেই জিজ্ঞেস করে ক'টা বাজে। দশ-বারো সের ওজনের একটা পাথর তুলে সরাতে যাবে রানা, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। কেউ দেখে ফেলার আগেই সিধে হয়ে বসল ও, তারপর দাঁড়াবার চেষ্টা করল। মাথাটা ঘুরছে।

আহুদের গলা পেল ও, 'এভাবে সম্ভব নয়।'

কাজ না থামিয়ে জবাব দিল হাদী। 'এভাবেই সম্ভব। আর যদি সম্ভব নয় বলে মনে করো, চুপচাপ বসে থাকি এসো, মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করি।'

'কতটা এগোলাম?' ক্লান্ত, বিরস গলায় জানতে চাইল শারমিন। 'আর কত পাথর সরাতে হবে?'

'জানি না,' জবাব দিল সুলতান।

'চুপ! চুপ!' হঠাৎ সবাইকে চুপ করতে বলল হাদী। 'ওই শোনো!'

কান পাতল রানা। কিন্তু কানের ড্রামে রক্ত ছলকানোর আওয়াজ ছাড়া কিছুই শুনতে পেল না। তারপর মনে হলো, ও স্বপ্ন দেখছে। সেই স্বপ্নে নাচানাচি করছে ওরা—শারমিন, হাদী, আহুদ আর সুলতান। তারপর, রানাকে হতভম্ব করে দিয়ে, সবাই ওরা আবার পাথর সরাতে শুরু করল। দেখাদেখি রানাও হাত লাগাল কাজে। আরও কিছুক্ষণ কাটল। তারপর পাথর ধসের ওপার থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ ঢুকল ওর কানে।

'মাসুদ ভাই,' হঠাৎ রানাকে পিছন থেকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল শারমিন। 'আপনি তো নিজেকে মেরে ফেলছেন!' টেনে এক পাশে সরিয়ে আনল ওকে। 'যথেষ্ট হয়েছে, আর দরকার নেই। শুনতে পাচ্ছেন না, ওরা আমাদেরকে উদ্ধার করতে আসছে?'

'ওরা?' শারমিন শক্ত করে ধরে থাকা সত্ত্বেও মাতালের মত টলছে রানা।

'আমি সোহেল ভাইয়ের গলা পেয়েছি,' বলল শারমিন। 'উনি বললেন, ওনার সঙ্গে লেবানীজ আর্মি রয়েছে। ড্রিল আনতে পাঠানো হয়েছে, সমস্ত পাথর সরাতে আধ ঘণ্টার বেশি লাগবে না।'

হাসতে চেষ্টা করল রানা, কিন্তু হাসিটা ঠোঁটে ফোটার আগেই জ্ঞান হারিয়ে শারমিনের গায়ে ঢলে পড়ল।

লেবানীজ আর্মির দুটো কোম্পানীর সঙ্গে কাফায় পৌঁছায় সোহেল আহমেদ সন্ধের দিকে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হবার আশঙ্কায় রানার মত তাকেও পরিস্থিতি বোঝার জন্যে লেবাননে পাঠানো হয়েছিল। রানা ও শারমিন নিখোঁজ হবার পর বৈরুত থেকে সোজা তাকরির উপকূলের মুয়াক্কা খাঁড়িতে চলে আসে সে। কোস্টগার্ড শমসের লিবান তখনও হাসপাতালে, তবে সে তার ভাষা ফিরে পেয়েছে। স্থানীয় পুলিস স্টেশনের ইন্সপেক্টর কায়সুল কারাম আর সংবাদদাতা জাকির হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে সোহেল। সে-ই প্রথম তার সন্দেহের কথা জানায়, তাকে সমর্থন করে ইন্সপেক্টর ও সংবাদদাতা—জেরোম টিন মাইন আসলে পরিত্যক্ত নয়, ভেতরে লোকজন আছে। শুধু তাই নয়, তাদের সবারই সন্দেহ, এই টিন মাইনের সঙ্গে ইসরায়েলি সাবমেরিনের কোন না কোন সম্পর্ক আছে।

এ-সব জানার পর লেবানীজ আর্মির সাহায্য চেয়ে বৈরুতে মেসেজ পাঠায় সোহেল। বৈরুত থেকে খবর আসে, সন্ধ্যা-রাতে দুই কোম্পানী সৈন্য নিয়ে মেজর তাহির কাফায় আসছেন। মাঝপথে কনভয়ের সঙ্গে যোগ দেয় সোহেল।

মাইনে ঢোকার সম্ভাব্য পথ তিনটে। মেজর তাহির প্রতিটি প্রবেশমুখে সশস্ত্র গার্ড বসালেন। আরেকটা দলকে পাঠানো হলো মাইনের ওপর পাহাড়-প্রাচীরে। প্রতিটি দলে একজন করে স্থানীয় মাইনার থাকল।

'বি' কোম্পানীর সঙ্গে থাকল সোহেল, তাদের সঙ্গে একটা শ্যাফট হয়ে খনিতে ঢুকল। তার আগে ওই শ্যাফটের পাঁচিল ভাঙা হলো ত্রিশজন শ্রমিককে দিয়ে। ভেতরে ঢোকার পর কয়েকটা জলপ্রপাত পেরুতে হলো ওদেরকে। তারপর গ্যালারি হয়ে একাধিক টানেলে ঢুকল, কিন্তু দেখতে পেল পাথর ধসে সবগুলোই বন্ধ হয়ে আছে। অবশেষে এমন একটা টানেল পাওয়া গেল, যেটার শেষ মাথার পাথর ধস পরিষ্কার করা হয়েছে, ফলে তৈরি হয়েছে সরু একটা ফাঁক। সোহেল ধরে নিল, শারমিন মাইনার তিনজনকে নিয়ে এই পথেই এগিয়েছে। লেবানীজ মেজর সৈনিকদের নিয়ে ওই টানেল ধরে এগোলেন। টানেলের পর আরেকটা গ্যালারি পেল ওরা। এখানেও বড় একটা

পাথর ধস সামনে এগোবার পথ বন্ধ করে রেখেছে।

পাথর সরানোর জন্যে ড্রিল আনতে পাঠানো হলো, তবে ড্রিলের জন্যে অপেক্ষায় না থেকে হাত দিয়ে পাথর সরানোর কাজ শুরু করল সৈনিকরা। ড্রিল এসে পৌঁছুনোর পর কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল। পাথর ধসের ওপারে শারমিন আর মাইনারদের খুঁজে পেল ওরা। মাইনারদের একজন, সাজিদ, মারা গেছে। ওদের সঙ্গে রানা ও আল হাদী নামে একজন স্থানীয় জেলেও আছে।

রানাকে অজ্ঞান অবস্থায় পায় সোহেল। জ্ঞান ফেরার পর ওর কাছ থেকে রিপোর্ট পেল সে। খনির শেষ মাথায়, সাগরের নিচে, পুরোদস্তুর একটা ইসরায়েলি সাবমেরিন ঘাঁটি আছে, আছে ছয় থেকে সাতশো লোকের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত। লাইমস্টোনে আগুন ধরিয়ে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছড়াবার ব্যবস্থা করে ওরা, ফলে সাবমেরিন ঘাঁটির সব ক'জন ইসরায়েলি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, এবং সেই সুযোগে খনির ভেতর ঢুকে পড়ে ওরা। তার আগে ঘাঁটি থেকে সাগরে বেরুবার আন্ডার-সী প্রবেশপথটা কামানের গোলা ছুঁড়ে বন্ধ করে দিয়েছিল।

খনিতে বেরিয়ে আসার পর নিজেদের পিছনে গ্যালারি ব্লক করে দিয়েছে ওরা।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় পাথর ধস সরিয়ে ঘাঁটিতে ঢোকে লেবানীজ আর্মি। ইতিমধ্যে গ্যাস সরে গেছে, ইসরায়েলিদের অনেকেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। তবে তারা দুর্বল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সাড়ে ছ'টার মধ্যে গোটা ঘাঁটি লেবানীজ আর্মির দখলে চলে আসে। সৈনিকদের তিনজন মারা যায়, দু'জন আহত হয়। ইসরায়েলিদের ছ'জন মারা যায়, সাতজন আহত হয়। অক্সিজেনের অভাবে ও অন্য কোন কারণে আরও সাতচল্লিশ জন মারা গেছে। গ্যাসের প্রভাবে বহু ইসরায়েলি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

সব মিলিয়ে পাঁচটা সমুদ্রগামী সাবমেরিন আটক করা হয়েছে। একটা সাবমেরিন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করা হয়। সাবমেরিন ছাড়াও প্রচুর অস্ত্র আর গোলা-বারুদ দখল করে লেবানীজ আর্মি। বন্দী করা হয় সব মিলিয়ে পাঁচশো একষট্টি জনকে।

লেবানন কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বলে দেয়া হয়, লেবাননের উপকূলে ইসরায়েলিদের এই সাবমেরিন ঘাঁটি আবিষ্কারের কাহিনী কেউ যেন ভুলেও প্রচার না করে।

ঘাঁটি দখল করার পরপরই সাগরের দিকটায় প্রচুর মাইন বসানো হয়, আন্ডার-সী প্রবেশ পথের একেবারে সামনে। ওখানে একটা বয়াও রাখা হয়, আগে যেমন ছিল। এর মানে হলো, আরও চারটে ইসরায়েলি সাবমেরিন ধ্বংস করা হবে।

বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান দু'দিন পর লেবানীজ ইন্টেলিজেন্স ও লেবানীজ নৌ-বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। কয়েকবার ঘন-ঘন বার্তা বিনিময়ের পর সিদ্ধান্ত হলো, লেবানীজ নৌ-বাহিনী

আকারে এত ছোট যে তার পক্ষে এতগুলো সাবমেরিন রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব নয়, কাজেই তারা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীকে একজোড়া সাবমেরিন উপহার হিসেবে দান করতে প্রস্তুত। তাদের তরফ থেকে আরও একটা প্রস্তাব এল—লেবাননের মাটিতে ইসরায়েলিদের সাবমেরিন ঘাঁটি আবিষ্কার ও ধ্বংস করার কৃতিত্বের প্রতি সম্মান দেখিয়ে মাসুদ রানা ও শায়লা শারমিনকে তারা রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত করতে ইচ্ছুক।

ঢাকা থেকে রাহাত খান জানালেন, খেতাব ওরা নিতে পারে, তবে মিডিয়াতে তা প্রকাশ করা যাবে না। অনুষ্ঠানটাও হতে হবে গোপনে। সেদিনই রানাকে একটা মেসেজ পাঠালেন তিনি, তাতে বললেন, 'ওয়েলডান, মাই বয়! কফি আনান বাগদাদে এসে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে আলোচনায় বসে সঙ্কটের সমাধান করে ফেলেছেন। ইসরায়েলিরা জাহাজ তিনটেকে ডুবিয়ে দিতে পারলে কফি আনান ব্যর্থ হতেন, ফলে রক্তক্ষয়ী একটা যুদ্ধ ঠেকানো যেত না। সেজন্যে ব্যক্তিগতভাবে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

***